যুগে যুগে ঈমানের পরীক্ষা যালিমের পরিণতি ও আজকের প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয়

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

যুগে যুগে
ঈমানের পরীক্ষা
যালিমের পরিণতি
ও
আজকের প্রেক্ষাপটে
আমাদের করণীয়

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

যুগে যুগে ঈমানের পরীক্ষা
যালিমের পরিণতি ও
আজকের প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয়

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

যুগে যুগে ঈমানের পরীক্ষা যালিমের পরিণতি ও
আজকের প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয়
আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কামিয়াব প্রকাশন
৫১ পুরানা পল্টন ৮ম তলা, ঢাকা। ফোন ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬, ০১৭৫০
ই-মেইল kamiubbd@yahoo.com, info@kamiubprokashon.com লিমিটেড
০৩৬৭৮৫

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১১
দ্বিতীয় মুদ্রণ: জুলাই ২০১২

 প্রচ্ছদ: হামিদুল ইসলাম, মুদ্রণ: একুশে প্রিন্টার্স, সূত্র
বাঁধাই: রাসেল বুক বাইন্ডিং, নয়াপল্টন, ঢাকা
াপুর, ঢাকা

Juge Juge Imaner Porikkha Zalimer Porinoty o ajker prekkhapote ama
koroniyo (Believer's Acid test & Oppressors' Consequence for ages :
Published by Muhammad Helal Uddin, Managing Director, Kamiub Prder
Ltd, 51 Purana Paltan, Dhaka 1000. Our Role)
Phone 9560121, 01711529266. **Fixed Price: Tk 120.00 only.** okashon

নির্ধারিত মূল্য: **একশত বিশ টাকা মাত্র।**

বিক্রয়কেন্দ্র
৫১ পুরানা পল্টন, নিচ তলা, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০
৪২৩ ওয়ারলেস রেল গেইট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

যুগে যুগে সত্য-ন্যায় প্রতিষ্ঠায়
যারা চেষ্টা সাধনা করেছেন,
যুলুমের শিকার হয়েও যারা
সত্যের উপর অটল ও অবিচল ছিলেন–
তাঁদের প্রতি নিবেদিত।

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত
লেখকের অন্যান্য বই

১. ইসলামে হজ্জ ও ওমরা
(পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৪৪; নির্ধারিত মূল্য ২৪০.০০ টাকা)

২. সাইয়েদ কুতুব জীবন ও কর্ম
(পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩২; নির্ধারিত মূল্য ১২০.০০ টাকা)

৩. মুসলিম যুবসমাজের ক্যারিয়ার গঠন ও দক্ষতা উন্নয়ন
(পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৮; বিনিময় মূল্য ২২০.০০ টাকা)

৪. মানুষের শেষ ঠিকানা
(পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৮; নির্ধারিত মূল্য ১৬০.০০ টাকা)

৫. ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহর ফযীলত ও কৃপণতার পরিণাম
(পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৪; নির্ধারিত মূল্য ৪০.০০ টাকা)

৬. ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা, কোম্পানি ব্যবস্থাপনা ও মুসলিম ব্যবসায়ীদের ভিশন
(পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৮; নির্ধারিত মূল্য ৭০.০০ টাকা)

৭. ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ও সময়ব্যবস্থাপনা
(পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২; নির্ধারিত মূল্য ৩৬.০০ টাকা)

ভূমিকা

ঈমান হলো আল্লাহর যাত, সিফাত ও হযরত মুহাম্মদ (স) কর্তৃক উপস্থাপিত জীবনাদর্শের উপর গভীর বিশ্বাসের নাম। এটা শুধু মৌখিক স্বীকৃতির নাম নয়। হৃদয়ের গভীরে এ বিশ্বাস লালন ও কর্মের মাধ্যমে এ বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটানোর মাধ্যমে ঈমানের প্রকাশ ঘটে। কেউ হৃদয়ের গভীরে বিশ্বাস স্থাপন না করে মুখে মুখে যতই ঈমানদার বলে দাবি করুক না কেন তিনি সত্যিকার মুমিন নন। যারা মুখে ঈমানের দাবি করে আর হৃদয়ে ঈমান রাখে না তারা হলো মুনাফিক। আর আল্লাহর যাত, সিফাত ও হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপস্থাপিত আদর্শ পূর্ণাঙ্গ বা আংশিকভাবে যারা অস্বীকার করে তারা কাফির। আর যারা আল্লাহর যাত ও সিফাতের সাথে অন্য কাউকে শরীক করে তারা মুশরিক। আর যাদের হৃদয়ে গভীর ঈমান থাকার পরও আমলের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকে তারা হলো ফাসিক। যারা ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল করে তারাই হলো খাঁটি ঈমানদার।

প্রসঙ্গত, ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। ঈমান ও ইসলাম শব্দ দুটো কুরআন ও হাদীসে কি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে না ভিন্নার্থে প্রয়োগ হয়েছে, এ সম্পর্কে উলামাদের মতভেদ রয়েছে। আল্লামা আইনীর মতে, অভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমান হচ্ছে কোন বিষয়ের প্রতি আস্থা স্থাপনের নাম আর ইসলাম হচ্ছে আনুগত্য মেনে নেয়া ও আত্মসমর্পণের নাম। অন্যকথায় ঈমান হলো আন্তরিক আনুগত্যের নাম। আর ইসলাম হলো বাহ্যিক আনুগত্যের নাম। এ সংজ্ঞা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঈমানের সম্পর্ক ক্বালবের সাথে আর ইসলামের সম্পর্ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে। আনোয়ার শাহ কাশ্মিরীর মতে, ঈমান ও ইসলাম একই অর্থবোধক নয়। তাঁর মতে ইসলাম হলো ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ আর ঈমান নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত। কিন্তু ইমাম বুখারী (র)-এর মতে, ঈমান ও ইসলাম শব্দ দুটো সমার্থক। তাই প্রত্যেক মুমিন হলো মুসলিম এবং প্রত্যেক মুসলিমও মুমিন। মাওলানা মওদূদী (র)-এর মতে, আল্লাহ তাআলা মানবজাতির জন্য যে জীবনবিধান নাযিল করেছেন কুরআনের পরিভাষায় তার নাম ইসলাম। ঈমান ও আনুগত্য উভয়টি এর অন্তর্ভুক্ত। আর মুসলিম সে ব্যক্তি, যে সরল মনে মেনে নেয় এবং কার্যত আনুগত্য করে।

একজন মুমিন শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্যেই নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দান সদকা, খিদমাতে খালক, মানবকল্যাণে ভূমিকা রাখা, পরিবারের হক, পিতা-মাতার হক, আত্মীয় স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও সমাজের হক এবং আমল বিল মারূফ ও নেহী আনিল মুনকারসহ সকল কাজ করেন। তাঁর তাযকিয়ায়ে নফস তথা আত্মসংশোধন ও ইসলাহে মু'আশারাত তথা সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার মাঝেও জাগতিক কোন স্বার্থ থাকে না। বরং এ কারণে জাগতিক অনেক স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। তাঁদের সকল ত্যাগ (Sacrifice) ও কুরবানীর মূল লক্ষ্য থাকে আল্লাহর রেজামন্দি অর্জন করে আখিরাতে তাঁর দীদার লাভ। যারা আল্লাহর সৃষ্টির জন্য কাজ করেন আল্লাহ

তাআলা তাঁদেরকে জান্নাত দেবেন– এটাই তাঁর ওয়াদা। আর জান্নাতে যাওয়ার পর আল্লাহর দীদার লাভই হচ্ছে জান্নাতীদের পরম পাওয়া। এছাড়াও আল্লাহ তাআলা জান্নাতে আমাদেরকে এমন নিয়ামত দান করবেন, যা পৃথিবীতে আমরা কখনও দেখিনি; কানেও শুনিনি। আর দুনিয়ার চেনা ও জানা যেসব ফল-ফলাদি আমরা জান্নাতে পাব তা দেখতে দুনিয়ার ফলের মতো মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে স্বাদ থাকবে অতুলনীয়। দুনিয়ার চেনা ফলের স্বাদ কত অতুলনীয় হবে তা কল্পনা করাও কঠিন।

জান্নাত লাভের আশায় ইসলামী আন্দোলনের সাথে যারা সম্পৃক্ত তারা দুনিয়াতে অনেক দুঃখ-কষ্ট, বাধা বিপত্তি, যুলুম-নির্যাতন হাঁসি মুখে বরণ করে নেয়। কারণ দুনিয়ার সুখ দুঃখ সাময়িক; কিন্তু আখিরাতের সুখ-দুঃখ চিরস্থায়ী। তাই স্থায়ী সুখের আবাস জান্নাত প্রাপ্তির আশায় সাময়িক দুঃখ বরণ করতে আল্লাহপ্রেমিক মুমিন বান্দাহরা কোন দ্বিধা করে না।

কিন্তু দুনিয়াতে যেমনিভাবে পরীক্ষা ছাড়া এক ক্লাশ থেকে আরেক ক্লাসে যাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় মুমিন বান্দাদের নানাভাবে পরীক্ষা করে উত্তীর্ণদেরকেই জান্নাতে উত্তম পুরস্কার দেবেন। আর এ পরীক্ষা নানাভাবে করেন। যেমন আইয়ূব (আ)-কে শারীরিক অসুস্থতা দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। আর ইবরাহীম (আ)-কে নমরুদের আগুনে ফেলে পরীক্ষা করেই পরীক্ষা শেষ করা হয়নি; এক পর্যায়ে তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাইল (আ)-কে কুরবানীর নির্দেশ দিয়ে আল্লাহর প্রতি ভালবাসার পরীক্ষা করা হয়। উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই তিনি খলীলুল্লাহ তথা আল্লাহর বন্ধু উপাধিতে ভূষিত হন।

অতীতে বিভিন্ন নবী-রাসূলকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। জাকারিয়া (আ)-কে করাত দ্বারা মাথা দ্বিখন্ডিত করে হত্যা করা হয়। ইয়াহইয়ার (আ) শিরশ্ছেদ করে ইহুদি শাসক হিরোডিয়াস তার প্রেমিকাকে উপহার দিয়েছিল। ইলিয়াস (আ)-কে হত্যার চেষ্টা করা হলে তিনি সিনাঈ দ্বীপে আশ্রয় নেন। ইয়ারমিয়াহকে ক্ষুধা ও পিপাসায় মেরে ফেলার জন্য রশি দিয়ে বেঁধে কুয়ার মাঝে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এভাবে ঈসা (আ)-কে শূলে চড়ানোর চেষ্টা করা হয় এবং মূসা (আ)-কে দেশত্যাগে বাধ্য করাসহ অসংখ্য নবী-রাসূলকে হত্যা-নির্যাতন করা হয়। আল্লাহর রাসূল, তাঁর আসহাবকে সেসব নির্যাতনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'তোমাদের আগে অতীতকালে এমন লোকও ছিল লোহার চিরুনি দিয়ে যাদের গোশত চেঁছে ফেলা হয়েছিল। হাড্ডি ছাড়া তাদের শরীরে আর কিছুই ছিল না। এ কঠোর অবস্থায়ও তাঁরা নিজের দীনের উপর থেকে আস্থা হারাননি। তাঁদের মাথার উপর করাত চালানো হয়েছে, করাত দিয়ে চিরে তাদেরকে দুভাগ করা হয়েছে। এ সত্ত্বেও তাঁরা দীন ত্যাগ করেননি।' আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাহাবাদেরকে সেসব ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে উগ্র করে তোলেননি বরং আরও ধৈর্যশীল বানানোর চেষ্টা করেছেন। মন্দের জবাব উত্তম পন্থায় দেওয়ার নির্দেশ দান করেছেন।

আল্লাহর প্রিয় বন্ধু মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা নানাধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। বেলাল (রা)-এর উপর কী অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছিল। প্রচণ্ড গরম

বালুর উপর শুইয়ে দিয়ে বুকে পাথর চাপা দেয়া হয়েছিল। তবুও তিনি 'আহাদ' 'আহাদ' বলা বন্ধ করেননি। হযরত আবূ যরকে ঈমান আনার কারণেই রক্তাক্ত হতে হয়েছে। সুদর্শন যুবক মাসয়াব বিন উমাইরকে দীনের দাওয়াত কবুল করার পর ত্যাগ করতে হয়েছে সকল সহায় সম্পদ। বিলাসবহুল জীবনযাপনের পরিবর্তে কষ্টকর জীবনযাপন করতে হয়েছে। আমের বিন ফাহিরার শরীর কাঁটা দিয়ে বিদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের নির্যাতনে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। অবশ্য আল্লাহর কুদরাতে পরে আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। খাববাব (রা)-কে জ্বলন্ত অঙ্গারে শুইয়ে রাখা হতো তাঁর চর্বিতে আগুন নিভে যেত। আমেরকে পানিতে ডুবিয়ে নির্যাতন করা হয়। তাঁর মা সুমাইয়া (রা)-এর লজ্জাস্থানে বর্শা নিক্ষেপ করে শহীদ করে দেয়া হয়। তাঁর পিতা ইয়াসীর ও ভাই আব্দুল্লাহ নির্যাতনের শিকার হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। যায়েদ বিন দাসানাকে বলা হয় 'তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদকে শূলে চড়ালে তুমি কি সহ্য করবে'? তিনি জবাব দেন 'তাঁকে শূলে চড়ানোতো দূরের কথা তাঁর পায়ে কাটার ফোঁটাও সহ্য করবনা'। এ কথা শোনার পর তাঁর উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালানো হয় ফলে তিনি শহীদ হয়ে যান। হামজা (রা)-এর কলিজা চিবিয়ে খাওয়া হয়েছে। এভাবে অসংখ্য সাহাবীকে অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করে দীনের পথে চলতে হয়েছে।

যুগে যুগে মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদ, ইমাম ও ইসলামপ্রিয় মানুষের উপর অনেক নির্যাতন করা হয়। ইমাম আবূ হানিফা, মালেক, আহমদ ইবন হাম্বল ও ইব্‌ন তাইমিয়া (র), মুজাদ্দিদে আলফে সানী, জামাল উদ্দিন আফগানী, সাইয়েদ আহমদ বেরলভী, হাজী শরীয়তুল্লাহ, নিসার আলী তিতুমীরসহ আরও অনেকেই নানা ধরনের যুলুম-নির্যাতন ভোগ করেছেন।

আজকের যুগেও যারা সত্য ও ন্যায়ের পথে চলছেন তারা যালিমদের যুলুমের শিকার হচ্ছে। মিসরে শহীদ হাসানুল বান্না ও সাইয়েদ কুতুব শহীদ শাহাদাত লাভ করেন। উস্তাদ ওমর তিলমিশানী, আব্দুল কাদের আওদাহ ও যায়নাব আল গাজালীসহ ইসলামপন্থী অসংখ্য মানুষ চরম নির্যাতনের শিকার হন। তুরস্কে বদিউজ্জমান নুরসীসহ অনেকেই যুলুম-নির্যাতনের শিকার হন; ইস্তাম্বুলের প্রতিটি লাইটপোস্টের সাথে ইসলাম প্রিয় মানুষদের লাশ ঝুলে ছিল অনেক দিন। ফিলিস্তিনে শাইখ ইয়াসীন ফজর নামায শেষে হুইল চেয়ারে বসা অবস্থায় শহীদ হন। আলজেরিয়াতে আব্বাস মাদানী দীর্ঘকাল কারাবরণ করেন। শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী অনেক বার কারাবরণ করেন এবং ফাঁসির আদেশ হয়। অবশ্য পরে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ফলে তাঁর ফাঁসি কার্যকর করতে পারেনি তৎকালীন পাকিস্তান সরকার।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলমানেরা এ ধরনের যুলুমের শিকার নামধারী অমুসলিমদের দ্বারাই হচ্ছে না; বরং পৃথিবীর অনেক মুসলিম দেশে কিছু মুসলিম নামধারী শাসকের হাতেও চরম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে অনেক সত্যপন্থি মানুষ। ফিলিস্তিন, কাশ্মির, ইরাক, বসনিয়াসহ পৃথিবীর নানাদেশে যখন অমুসলিমরা সরাসরি আক্রমণ করে তখন আমরা তা সহজেই দেখি এবং প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠি। কিন্তু মিসর, বাংলাদেশ, আলজেরিয়া, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে মুসলিম শাসকদের হাতে যখন মুসলমানেরা নির্যাতিত হয় তখন সে খবর খুব কম লোকই রাখে। পৃথিবীর মানুষগুলো

না জানলেও আল্লাহ্ তাআলা জানেন, কারা কিভাবে কাদের উপর নির্যাতন করছে। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই যালিমদের যুলুমের বিচার করবেন।

অতীতে অনেক যালিমকে আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়াতেও কঠোর শাস্তি দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, তিনি যুলুমের শাস্তি শুধু-আখিরাতের জন্য রেখে দেন না মাঝেমধ্যে দুনিয়াতেও কিছু শাস্তি প্রদান করেন। ফেরাউন, নমরূদ, 'আদ, ছামূদজাতিসহ অতীতে শাস্তিপ্রাপ্ত মানুষ ও জনপদের ইতিহাস তারই সাক্ষী। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যালিমের বিচার করবেন– এটা সত্য; তাই বলে মাযলুমের পাশে যদি আমরা না দাঁড়াই তাহলে আমরাও হয়তবা বিচারের সম্মুখীন হব। কেননা আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে শিখিয়েছেন, 'যালিম ও মাযলুম উভয়কে সাহায্য করতে'। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যালিমকে আমরা কিভাবে সাহায্য করব? তার জবাবও আল্লাহর রাসূল (স) দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে, যালিমকে যুলুম করা থেকে বিরত রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা অতীতে ফেরেশতা পাঠিয়ে তাঁর প্রিয় বান্দাহদের সাহায্য করেছেন। বর্তমানেও ফেরেশতা পাঠিয়ে তিনি সাহায্য করতে পারেন। অতীতে আবাবিল পাখি দ্বারা অনেক যালিমকে ধ্বংস করেছেন। আজকের যুগেও অনেক ছোট ছোট পাখি আকাশে উড়ে। আল্লাহর নির্দেশ পেলে আজও ছোট ছোট পাখি মুখে পাথর নিয়ে যেকোন শক্তিধর যালিমকে ধ্বংস করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে কোন কিছু করেন না। তাই আমাদেরকে স্বাভাবিক নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই যুলুম-শোষণের বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করতে হবে।

আমি এ বইতে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরতে চাই। তা হচ্ছে; ঈমানের পরীক্ষা বলতে কী বুঝায়, ঈমানদারদের পরীক্ষার কারণ ও ধরন, অতীতে নবী-রাসূল ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পরীক্ষার কতিপয় উদাহরণ, আসহাবে রাসূলদের উপর নির্যাতনের কতিপয় ঘটনা, অতীতে ইসলামী চিন্তাবিদদের উপর কী ধরনের নির্যাতন করা হয়েছে তার কিছু চিত্র। সর্বশেষ যুগে যুগে যালিমের পরিণতি ও আজকের প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয় সম্পর্কেও আলোচনা করতে চাই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ বইয়ে আলোচিত ভাল দিকগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দিন এবং সর্বাবস্থায় হেদায়াতের উপর অটল ও অবিচল রাখুন। বইয়ে কোন ধরনের ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা জানালে বাধিত হব। কামিয়াম প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর হেলাল উদ্দিন বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নেয়ায় তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বইটি লেখার ক্ষেত্রে জীবনসঙ্গিনী রোজী সাজেদা ও স্নেহ প্রতীম ইবরাহীম, আহমদ, মূসা, ইয়াহইয়া ও হান্না'র প্রাপ্য সময় থেকে কিছু সময় লেখার ক্ষেত্রে ব্যয় করতে হয়েছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের এ ত্যাগকে কবুল করুন। বইটির প্রুফ দেখার ক্ষেত্রে স্নেহাস্পদ ইসমাঈল, সা'দ ইমানি ও আবু ইউসুফ যে পরিশ্রম করেছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকেসহ বইটির লেখক, পাঠক ও প্রকাশক সকলকে আখিরাতে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমীন ॥

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ
২২ জানুয়ারি, ২০১১

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

যুগে যুগে ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুলুম, যালিমের পরিণতি ও মাযলুমের ফরিয়াদ

তৃতীয় অধ্যায়

আজকের প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয়

উপসংহার

প্রথম অধ্যায়

যুগে যুগে ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা

ঈমানের পরীক্ষা বলতে কী বুঝায়

বান্দাদেরকে কখনো কখনো ভাল ও মন্দ অবস্থায় ফেলে পরীক্ষা করা আল্লাহ তাআলার চিরাচরিত নিয়ম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ○

'প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আর আমি ভালো ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদেরকে পরীক্ষা করছি। অবশেষে তোমরা আমারই কাছে ফিরে আসবে।' (সূরা আম্বিয়া : ৩৫)

ভাল ও মন্দ অবস্থায় ফেলে আল্লাহ তাআলা কেন তাঁর বান্দাহদের পরীক্ষা করেন তা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আছে। এ সংক্রান্ত আলোচনায় আল-কুরআনে তিনটি শব্দের প্রয়োগ বেশি দেখা যায়। আল কুরআনের সূরা মুমতাহিনার ১২ নং আয়াতে 'ফিতনা' ও একই সূরার ১০ নং আয়াতে 'ইমতিহান' শব্দ এবং আনফালের ১৭ নং আয়াতে بَـلاء শব্দ পরীক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এসব শব্দ যেসব আয়াতে উল্লেখ আছে উক্ত আয়াতসমূহ ভালভাবে অধ্যয়ন করলে আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে– ঈমানের পরীক্ষা বলতে কী বুঝায় এবং অতীতে নবী-রাসূলগণ কিভাবে উক্ত পরীক্ষা মোকাবেলা করেছেন।

আল-কুরআনে পরীক্ষা বুঝানোর জন্য ফিতনা শব্দের প্রয়োগ

কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ তাআলা ফিতনা শব্দ (testing and trial) অর্থে উল্লেখ করেছেন। এই শব্দটি শিরক-কুফর, মতপার্থক্য, আগুনে নিক্ষেপ করে হত্যা, নির্যাতন ও নিপীড়ন, কারাগারে প্রেরণ প্রভৃতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে কুরআনের কোন্ আয়াতে কোন্ অর্থে ফিতনা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার কতিপয় উদাহরণ পেশ করছি। সূরা 'আনকাবূত এ testing and trial অর্থে ফিতনা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

الٓمّٓ ۚ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝

'আলিফ লাম মীম। লোকেরা কি মনে করে রেখেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি কেবল এ কথাটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তী সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি। আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন, কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী।' (সূরা 'আনকাবূত : ১-৩)

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

'হে আমাদের রব! আমাদেরকে কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র বানিয়ে দিও না। হে আমাদের রব! আমাদের গুনাহ মাফ করো। নিশ্চয়ই তুমি মহাশক্তিশালী ও সুকৌশলী' (সূরা মুমতাহিনা : ৫)। উপরিউক্ত উভয় আয়াতেই ফিতনা শব্দটি testing and trial অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কুরআনের কোথাও কোথাও পথ বন্ধ করা এবং মানুষদেরকে দূরে ঠেলে দেয়া (Blocking the way and turning people away) অর্থেও ফিতনা শব্দটি প্রয়োগ হতে দেখা যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ۚ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ۝

'হে রাসূল! আল্লাহর নাযিল করা বিধান মোতাবেক আপনি জনগণের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করুন। তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। আপনি সাবধান থাকুন, যাতে তারা আপনাকে ফিতনায় ফেলে ঐ হেদায়াতের কোন অংশ থেকে ফিরিয়ে রাখতে না পারে, যা আল্লাহ আপনার উপর নাযিল করেছেন। আর যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রাখুন, আল্লাহ তাদের কতক গুনাহের জন্য তাদের শাস্তি দেবার ফায়সালা করেই ফেলেছেন। আসলে মানুষের মধ্যে অনেকেই ফাসিক' (সূরা মায়িদা : ৪৯)। এ আয়াতে ফিতনা শব্দটি সত্যের পথ রুদ্ধ করা এবং মানুষদেরকে দূরে ঠেলে দেয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা দেখি পৃথিবীতে মানুষের একটি অংশ সত্যের পথ থেকে মানুষকে দূরে রাখার চেষ্টা করছে। এমতাবস্থায় সত্যপন্থিরা সত্যপথ ছেড়ে দেয়, না সত্যের উপর অটল

থাকে আল্লাহ তাআলা তা পরীক্ষা করেন। হয়রানি করা, নির্যাতন করা, হত্যা করা (Persecution) অর্থে নিম্নের আয়াতে ফিতনা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

অপরদিকে যাদের অবস্থা এই যে, যখন (ঈমান আনার কারণে) তাদেরকে যাতনা দেবার ফলে তারা বাড়িঘর ছেড়ে হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে ও সবর করেছে, এরপর তাদের জন্য আপনার রব অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়াময় (সূরা নহল : ১১০)। অতীতে যারাই হকের দাওয়াত দিয়েছেন তারা নানা ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছেন। তাদের উপর পরিচালিত হয়েছে অত্যাচারের স্টীমরোলার। তাদের অনেককে হত্যা করা হয়েছে। উপরিউক্ত আয়াতে ফিতনা শব্দ দ্বারা সেই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কোন কোন আয়াতে শিরক ও কুফর (Shirk and Kufr) অর্থে ফিতনা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

وَقٰتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَّيَكُونَ الدِّينُ لِلّٰهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظّٰلِمِينَ ۝

'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক, যে পর্যন্ত ফিতনা (শিরক ও কুফর) খতম হয়ে যায় এবং দীন শুধু আল্লাহরই জন্য হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে জেনে রাখ, যালিমদের ছাড়া আর কারো উপর হামলা করা উচিত নয়।' (সূরা বাকারা : ১৯৩)

গুনাহ ও কপটতা (Falling into sin and hypocrisy) অর্থেও কুরআনের কিছু জায়গায় ফিতনা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتّٰى جَاءَ أَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ ۝

'তারা মুমিনদেরকে ডেকে ডেকে বলবে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? 'মুমিনরা জওয়াবে বলবে, হ্যাঁ, ছিলে তো, কিন্তু তোমরা যে নিজেরাই নিজেদেরকে ফিতনায় ঠেলে দিয়েছিলে, সুযোগের অপেক্ষায় ছিলে, সন্দেহে ডুবেছিলে এবং মিথ্যা আশা-ভরসা তোমাদেরকে আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত ধোঁকায় ফেলে রেখেছিলে। আর শেষ পর্যন্ত ঐ বড় ধোঁকাবাজ (শয়তান) আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদেরকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছিল।' (সূরা হাদীদ : ১৪)

কোথাও কোথাও দাঙ্গা হাঙ্গামা ও সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রণ (Confusing truth with falsehood) অর্থেও ফিতনা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ইরশাদ হচ্ছে:

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ۝

'আর যারা কাফির তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর তবে দাঙ্গা হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণকর হবে।' (সূরা আনফাল : ৭৩)।

আল-কুরআনের কিছু জায়গায় ভুলভাবে পরিচালিত করা (Misguidance) অর্থেও ফিতনা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন,

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ، لَمْ يَاْتُوْكَ، يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ، يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا، وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا، اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

হে রাসূল! যারা কুফরীর পথে খুব এগিয়ে চলেছে তাদের মধ্যে যারা মুখে বলে ঈমান এনেছি; কিন্তু তাদের দিল ঈমান আনেনি এবং যারা ইহুদী, তারা যেন আপনার জন্য বেদনাবোধ করার কারণ না হয়। ইহুদীদের অবস্থা এই যে, তারা মিথ্যার জন্য কান পেতে থাকে এবং অন্য যেসব লোক আপনার কাছে আসেনি তাদের (কাছে আপনার বিরুদ্ধে কথা লাগাবার) জন্য কিছু শুনে বেড়ায়। (আল্লাহর কিতাবের) শব্দগুলোকে সঠিক হালে থাকা সত্ত্বেও আসল অর্থ থেকে সরিয়ে দেয়। আর জনগণকে বলে যে, যদি তোমাদেরকে অমুক হুকুম দেয় তাহলে মেনে নাও, তা না হলে মানবে না। যাকে আল্লাহই ফিতনার মধ্যে ফেলার ইচ্ছা করেছেন, তাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাবার জন্য আপনি কিছুই করতে পারেন না। এরাই ঐসব লোক, যাদের দিলকে আল্লাহ পবিত্র করতে চাননি। তাদের জন্য দুনিয়াতে অপমান আর আখিরাতের কঠিন আযাব রয়েছে (সূরা মায়িদাহ : ৪১)। এ আয়াতে ফিতনা শব্দটি 'ভুলভাবে পরিচালিত করা'র অর্থে প্রয়োগ হয়েছে।

হত্যা ও কারাগারে নেয়া (Killing and taking prisoners) অর্থেও কোথাও কোথাও ফিতনা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكٰفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ○

'যখন তোমরা সফরে বের হও, তখন কসর নামায পড়ায় কোন ক্ষতি নেই। (বিশেষ করে) যখন তোমরা ভয় কর যে, কাফিররা তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে। কারণ কাফিররা তো অবশ্যই তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।' (সূরা নিসা : ১০১)

মতপার্থক্য ও ঐকমত্যের অভাব (Difference among people and lack of agreement) বুঝানোর জন্য কুরআনের কিছু জায়গায় ফিতনা শব্দ প্রয়োগ হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন,

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيكُمْ سَمّٰعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظّٰلِمِينَ ○

'যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো, তাহলে তারা শুধু তোমাদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দিত এবং তোমাদের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করত। আর তোমাদের (লোকদের অবস্থা এই যে, তাদের) মধ্যে এমন অনেক লোক আছে, যারা তাদের কথা কান লাগিয়ে শুনে। আল্লাহ ঐ যালিমদেরকে ভালোভাবেই জানেন (সূরা তাওবাহ : ৪৭)। অনেক সময় বিভিন্ন সংকটজনক সময়ে মুনাফিকরা পারস্পরিক মতপার্থক্য সৃষ্টি করে ঈমানদারদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টির প্রয়াস চালায়। এ আয়াতে ফিতান শব্দটি এ ধরনের ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

চেতনাহীন, কাণ্ডজ্ঞানহীন, পাগল (Insanity) অর্থেও ফিতনা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন, بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ 'তোমাদের মধ্যে কে পাগলামিতে পড়ে আছে।' (সূরা কালাম : ৬)

যুলুম করা ও জ্বলন্ত আগুনে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া (Burning with fire) অর্থেও অনেক জায়গায় ফিতনা শব্দটি প্রয়োগ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন,

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ○

'যারা ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের উপর যুলুম করেছে, এরপর এ জন্যে তাওবা করেনি, তাদের জন্য দোযখের আযাব রয়েছে, আর রয়েছে আগুনে জ্বলবার শাস্তি।'

(সূরা আল বুরুজ : ১০)। এ আয়াতে ফিতান শব্দটি জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়ে হত্যা করার কথা বুঝানো হয়েছে। যা কুরআনে আসহাবে উখদূদ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। উক্ত ঘটনা পরে বিধৃত আছে।

কুরআনে بَلَاء শব্দের প্রয়োগ

ফিতনা শব্দের মতো কুরআনে 'বালা' শব্দটিও পরীক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মুফতী শফী (র) তাঁর তাফসীরে বলেন, بَلَاء শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পরীক্ষা। বস্তুত আল্লাহ তাআলার পরীক্ষা কখনও হয় বিপদাপদের সম্মুখীন করে। আবার কখনও হয় ধন-দৌলত, সাহায্য ও বিজয় দান করার মাধ্যমে। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

'সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি মাটির মূর্তি নিক্ষেপ করনি যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে। আল্লাহ স্বয়ং যেন ঈমানদারদের প্রতি ইহসান করতে পারেন যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ শ্রবণকারী পরিজ্ঞাত।' (সূরা আনফাল : ১৭)

উল্লেখিত আয়াতে بَلَاءً حَسَنًا বলা হয় এমন পরীক্ষাকে যা আরাম-আয়েশ, ধন সম্পদ ও সাহায্য দানের মাধ্যমে নেয়া হয়। একে এরা আমার অনুগ্রহের দান মনে করে শুকরিয়া আদায় করে, নাকি নিজেদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার ফল ধারণা করে গর্ব ও অহংকারে লিপ্ত হয়। অহংকার কৃত আমলকে বরবাদ করে দেয়। কারণ আল্লাহ তাআলার দরবারে কারও গর্ব-অহংকারের স্থান নেই।

সূরা মুহাম্মদের দুটি আয়াতে 'বালা' শব্দটি পরীক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন,

وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ○ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ○

'আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজেই তাদেরকে দমন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের একের দ্বারা অপরকে পরীক্ষা করতে চান। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হবে আল্লাহ তাদের আমলকে কখনো ফলহীন করবেন না। তিনি তাদেরকে সঠিক পথে চালাবেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেবেন।' (সূরা মুহাম্মদ : ৪-৫)

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ

'যিনি হায়াত ও মওত সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যাচাই করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে কে বেশি ভালো। তিনি মহা শক্তিশালী ও ক্ষমাশীল।' (সূরা মুলক : ২)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে বালা শব্দটি পরীক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য কুরআনের কোথাও কোথাও এটি আযাব বা শাস্তিদান অর্থেও প্রয়োগ হয়েছে।

কুরআনে ইমতিহান শব্দের প্রয়োগ

ফিতনা ও বালা এ শব্দদ্বয় পরীক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হলেও সাধারণত ইমতিহান শব্দটি পরীক্ষা অর্থে প্রয়োগ হয়। সূরা মুমতাহিনায় ইমতিহান শব্দটি ঈমানের পরীক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ۖ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۖ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ۖ وَاٰتُوْهُمْ مَّا اَنْفَقُوْا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَا اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَا اَنْفَقُوْا ۚ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যখন মুমিন মেয়েলোকেরা হিজরত করে তোমাদের কাছে আসে তখন (তাদের মুমিন হওয়ার ব্যাপারে) তোমরা পরীক্ষা কর। তাদের ঈমানের আসল খবর তো আল্লাহই ভালো জানেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিন, তাহলে তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত দিও না। তারা কাফিরদের জন্য হালাল নয় কাফিরও তাদের জন্য হালাল নয়। তাদের কাফির স্বামীরা তাদেরকে যে মোহর দিয়েছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তোমরা যদি তাদের মোহর আদায় করে তাদেরকে বিয়ে কর তাহলে কোন দোষ নেই। তোমরাও কাফির নারীদেরকে বিয়ের বাঁধনে আটকিয়ে রেখ না। তোমরা তোমাদের কাফির নারীদেরকে যে মোহর দিয়েছিলে তা ফেরত চেয়ে নাও। আর কাফিররা তাদের মুমিন নারীদেরকে যে মোহর দিয়েছিল তা তারা ফেরত চেয়ে নিক। এটাই আল্লাহর হুকুম। তিনিই তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেন। আর তিনি মহাজ্ঞানী ও সুকৌশলী।' (সূরা মুমতাহিনা : ১০)

এ আয়াতের শানে নযূল প্রসঙ্গে তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ আছে যে, বদর যুদ্ধের পর মক্কা বিজয়ের পূর্বে সারা নামক মক্কার একজন গায়িকা মদীনায় আগমন করেন। রাসূলে কারীম (স) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি হিজরত করে মদীনায় এসেছ? সে বলল না। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, তবে কি তুমি মুসলমান হয়ে এসেছ? সে নেতিবাচক উত্তর দিল। রাসূলুল্লাহ তখন জিজ্ঞাসা করলেন তাহলে কী উদ্দেশ্যে আগমন করেছ? সে জবাব দিল 'আপনারা মক্কার সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। আপনাদের মধ্য থেকে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন মক্কার বড় বড় সরদাররা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে। আপনারা এখানে চলে এসেছেন। ফলে আমার জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়েছে। আমি অত্যন্ত বিপদে পড়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে আপনাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি মক্কার পেশাদার গায়িকা, মক্কার সেই যুবকরা কোথায় যারা তোমার গানে মুগ্ধ হয়ে টাকা পয়সার বৃষ্টি বর্ষণ করত। সে বলল, বদর যুদ্ধের পর তাদের গান-বাজনার জৌলস শেষ হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তারা কেউ আমাকে আমন্ত্রণ করেনি। অতঃপর রাসূলে কারীম (স) আব্দুল মুত্তালিব বংশের লোকজনককে তাকে সাহায্য করার জন্য উৎসাহিত করেন। তারা তাকে নগদ টাকা পয়সা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দিয়ে বিদায় দেয়।

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, ঈমানদার কেউ হিজরত করে কোথাও আসলে সেই মুহাজির হয়ে যায় না। মুহাজির হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে ঈমান। ঈমানের দাবি পূরণের জন্যই হিজরত হতে হবে। আল্লাহ তাআলা ঈমানদার নর-নারীকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে স্পষ্ট করেন যে, কারা ঈমানের দাবিতে হিজরত করে আর কারা জাগতিক স্বার্থ পূরণের জন্য হিজরত করে।

ঈমানদারদের পরীক্ষার কারণ

আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন কারণে ঈমানদারদের পরীক্ষা করেন। মূলত ঈমানের ঘোষণা দেয়ার পর একজন বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। কেননা ঈমানদারের জ্ঞানের উৎস আর অবিশ্বাসীর জ্ঞানের উৎস এক নয়। তাই বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর কর্মজীবনে পার্থক্য দেখা দেয়; অনুসরণ ও অনুকরণের মানদণ্ডে এবং কৃষ্টি ও কালচারে পার্থক্য হয়। এর ফলে প্রচলিত সমাজ ও সভ্যতা এবং মিথ্যা রুসম রেওয়াজের ধারক ও বাহকগণের সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। কেননা তারা মানুষকে মানুষের গোলামে পরিণত করতে চায়। কিন্তু একজন ব্যক্তি এক আল্লাহতে ঈমান আনার পর নিজে শুধু মানুষের গোলামি ত্যাগ করে আল্লাহর গোলাম হয়ে যায় না বরং অন্যান্য মানুষকেও আল্লাহর গোলামে পরিণত করার জন্য কথা ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ করে। যারা মানুষকে মানুষের গোলামের পরিবর্তে আল্লাহর গোলামি করার দাওয়াত দেয়। প্রত্যেক যুগে কায়েমি স্বার্থবাদীদের পক্ষ থেকে তারা বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। গালমন্দ, মিথ্যা অপবাদ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছে তাদের উপর। অর্থনৈতিক অবরোধ ও সামাজিক বয়কটের সম্মুখীন হয়েছিলেন তারা। এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন করে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহদেরকে পরীক্ষা করেন, কারা ঈমানের দাবিতে কতটুকু সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী; এবং কারা কতটুকু ধৈর্যশীল।

ঈমানের দাবিতে কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী

আল্লাহ তাআলা পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করেন, কে ঈমানের দাবিতে কতটুকু খাঁটি আর কে কপট। যেমন ওহুদ যুদ্ধে কপট বিশ্বাসীরা ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। বদরের বিজয়ের পর কারা সুবিধাভোগী মুনাফিক তা ওহুদের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। জয়ের পর পরাজয় এবং সুখের পর দুঃখে পতিত করেই সুবিধাবাদী আর সত্যনিষ্ঠ মানুষদের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। কেননা সুবিধাবাদীরা সব সময় জয়জয়কার অবস্থায় সামনের কাতারে থাকতে চায়। কিন্তু দুঃখ বা বিপদ আসলে তারা সটকে পড়ে কিংবা ভেতরে থেকে শুধু অপরের দোষ চর্চায় লিপ্ত হয় কিংবা বিরোধী শক্তির সাথে সরাসরি হাত মেলায়। সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তিগণ সব সময় সত্য পথে অটল ও অবিচল থাকেন। কোন অবস্থাতেই জাগতিক সুবিধার জন্য আখিরাতের পুরস্কার নষ্ট হতে দেয় না। তাঁদের কাছে আদর্শ হচ্ছে সবচেয়ে বড়। তাই তারা জাগতিক বিপদাপদকে হাসিমুখে বরণ করেন। অতীতেও যারা ঈমানের দাবি করেছেন আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে পরীক্ষা করেছেন। কেন তিনি পরীক্ষা করেছেন তা তাঁর ভাষায়:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَا۟ اَخْبَارَكُمْ ○

'আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যাতে তোমাদের অবস্থা যাছাই করে নিতে পারি এবং দেখে নিতে পারি যে, তোমাদের মধ্যে কারা মুজাহিদ ও ধৈর্যশীল।' (সূরা মুহাম্মদ : ৩১)

আল্লাহ তাআলা কুরআনে এ কথা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেন যে, ঈমানের ঘোষণা দিলে পরীক্ষা আসবেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

الٓمٓ ۚ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُّتْرَكُوْٓا أَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ○ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ○ أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ أَنْ يَّسْبِقُوْنَا ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○ مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

আলিফ লাম মীম। লোকেরা কি মনে করে রেখেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি কেবল এ কথাটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে আর পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তী সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি। আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন, কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী। আর যারা খারাপ কাজ করছে তারা কি মনে করে বসে আছে, তারা আমার থেকে এগিয়ে চলে যাবে? বড়ই ভুল সিদ্ধান্ত তারা করেছে। যে কেউ আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার আশা করে (তাদের জানা উচিত) আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসবেই। আর আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন। যে ব্যক্তি প্রচেষ্টা সংগ্রাম করবে, সে নিজের ভালর জন্যই করবে। আল্লাহ অবশ্যই বিশ্ববাসীর প্রতি মুখাপেক্ষীতাহীন। আর যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তাদের দুস্কৃতিগুলো আমি তাদের থেকে দূর করে দেব এবং তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কাজগুলোর প্রতিদান দেব।' (সূরা আনকাবুত : ১-৭)

মুফতী শফী (র)-এর মতে, এ আয়াতে উল্লেখিত ফেতনা শব্দের অর্থ পরীক্ষা। ঈমানদারগণ বিশেষত পয়গাম্বরদেরকে এ জগতে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। পরিশেষে বিজয় ও সাফল্য তাঁদের হাতে এসেছে। এসব পরীক্ষা কোন সময় কাফের ও পাপাচারীদের শত্রুতা এবং তাদের নির্যাতনের মাধ্যমে হয়েছে। যেমন অধিকাংশ পয়গাম্বর এবং শেষ নবী মুহাম্মদ (স) ও তাঁর সাহাবীরা এ ধরনের নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন। সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলি এই

ধরনের ঘটনাবলি দ্বারা পরিপূর্ণ। কোন সময় এ পরীক্ষা রোগ ব্যাধি ও অন্যান্য মাধ্যমে হয়েছে। এসব পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা খাঁটি-অখাঁটি এবং সৎ ও অসাধুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবেন। কেননা খাঁটিদের সাথে কপট বিশ্বাসীদের মিশ্রণের ফলে মাঝে মধ্যে বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়।

ইমাম কুরতুবী (র)-এর মতে, উপরিউক্ত আয়াতে নাস বলতে মক্কায় ঈমান গ্রহণকারী সেই সকল ব্যক্তির কথা বুঝানো হয়েছে যারা নির্যাতন ও নিপীড়নের সম্মুখীন হয়েছিলেন। যেমন আম্মার ইবন ইয়াসির, ইয়াসির, সুমাইয়া। তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াতের মাধ্যমে প্রত্যেক যুগের ঈমানদারদেরকে এই মেসেজ দেওয়া হচ্ছে যে, ঈমানের পথ ফুলবিছানো নয়। অতীতেও যারা ঈমানের দাবি করেছে তাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে, বর্তমানেও করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও করা হবে। কিয়ামত পর্যন্ত এ পরীক্ষা অব্যাহত থাকবে। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, মক্কায় কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার উপর যুলুম-নির্যাতনের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ত। ভীষণভাবে মারপিট আর কঠোর নির্যাতন করা হতো। বেলাল (রা)-এর বুকে পাথরচাপা দিয়ে রাখা হতো। এভাবে আরও অনেক সাহাবাকে নির্যাতন করা হয়েছে। দোকানদার-কারিগর হলে রুটি-রুজির পথ বন্ধ করে দেওয়া হতো। এমনকি অনাহারে মৃত্যুর প্রহর গুনতে হতো। ঈমানদার প্রভাবশালী হলে তাকে পরিবার-পরিজনের সদস্যরা হেয় প্রতিপন্ন করত। এ কারণে অনেক মানুষ রাসূলে কারীম (স)-এর রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করলেও ঈমান আনতে ভয় পেত। আর নিষ্ঠাবান ঈমানদারদের মনেও সব সময় একটা চাঞ্চল্য বিরাজ করত।

সাইয়েদ কুতুবের মতে, ইসলামের পথে বাধা আসে। এ বাধা আনে দুঃখ-যন্ত্রণা। আর সে দুঃখ যন্ত্রণা ব্যক্তির জীবনকে পরিশুদ্ধ করার অমোঘ হাতিয়ার। বাধা বিপত্তি, অলস, দুর্বলচেতা প্রতারক ও মুনাফিকদেরকে ভয় লাগিয়ে দেয়। তারা দূরে সরে পড়ে। তাদের কবলমুক্ত হয় সমাজ। সমাজ-পরিবেশ পরিশুদ্ধির এটা একটা বাস্তব পদ্ধতি। আল্লাহ মুসলিম জাতিকে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। বিপদের হাতুড়িপেটা, কঠিন অবস্থার মোকাবেলা এবং দুঃখ-বেদনার তিক্ততা দিয়ে এ পরীক্ষা হয়। এ পরীক্ষা পদ্ধতির ফলে মিল্লাত পরিশুদ্ধ হয়।

পরীক্ষা হয় ঈমানদারদের মর্যাদা নির্ধারণের জন্য

দুনিয়াতে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় কোন ছাত্র/ছাত্রী ভাল পড়াশুনা করেছে আর কে ভালভাবে পড়াশুনা করেনি। একজন ছাত্রের সফলতা-ব্যর্থতা যেমনি

পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে একজন মু'মিনের মর্যাদা পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। পরীক্ষা ছাড়া যেমনিভাবে একজন ছাত্র/ছাত্রী এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে যেতে পারে না অনুরূপভাবে ঈমানের পরীক্ষা ছাড়া আমরা জান্নাতে যেতে পারব না। এ প্রসঙ্গে তিনি ইরশাদ করেন,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۚ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ۚ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ○

'তোমরা কি মনে করছ, এমনিতেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে? অথচ তোমাদের আগে যারা ঈমান এনেছিল তাদের উপর যা কিছু নেমে এসেছিল এখনও তোমাদের উপর সেসব নেমে আসেনি। তাদের উপর নেমে এসেছিল কষ্ট ক্লেশ ও বিপদ মুসিবত, তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল। এমনকি সমকালীন রাসূল এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? তখন তাদেরকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছিল, অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য নিকটে।' (সূরা বাকারা : ২১৪)

মুফতী শফী (র) বলেন, এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত পরিশ্রম ও মেহনত ব্যতীত এবং বিপদাপদে পতিত হওয়া ছাড়া কেউ বেহেশত লাভ করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে রাসূলে কারীম (স) বলেন, সব চাইতে অধিক বালা-মুসীবতে পতিত হয়েছেন নবী-রাসূলগণ। তারপর তাঁদের নিকটতবর্তী ব্যক্তিগণ। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে নবীগণ ও তাঁদের সাথীদের প্রার্থনা যে, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে, তা কোন সন্দেহের কারণে নয় যা তাঁদের শানের বিরুদ্ধ। এ ধরনের অশান্ত অবস্থায় প্রার্থনার অর্থ এই ছিল যে, সাহায্য তাড়াতাড়ি অবতীর্ণ হোক।

কুরআন ও হাদীস থেকে স্পষ্ট জানায় যায় যে, নেক কাজে কে কার চেয়ে অগ্রগামী তা যাচাই করার জন্য আল্লাহ তাআলা মাঝেমধ্যে ঈমানদারদেরকে পরীক্ষা করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ইরশাদ করেন যে,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۚ إِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

'(হে রাসূল!) আমি আপনার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি, যা সত্য নিয়ে এসেছে। আর আল কিতাব থেকে যা কিছু এর সামনে মজুদ রয়েছে তার সত্যতা প্রমাণ করে এবং এর হেফাযত করে। সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে (আইন) অনুযায়ী (জনগণের) মধ্যে বিচার-ফায়সালা করুন। আর যে সত্য আপনার নিকট এসেছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীআত ও কাজের তরীকা ঠিক করে দিয়েছি। যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তোমাদের সবাইকে একই উম্মত বানিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু (তিনি তা করেননি) যাতে তিনি তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন সে ব্যাপারে তোমাদের পরীক্ষা নিতে পারেন। কাজেই তোমরা নেক কাজে একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করো। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে (ঐসব বিষয়ে আসল সত্য) জানিয়ে দেবেন, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করেছিলে।' (সূরা মায়েদা : ৪৮)

পবিত্র মানুষদেরকে অপবিত্রদের কাছ থেকে পৃথক করা

আল্লাহ তাআলা পবিত্র মানুষদেরকে অপবিত্র মানুষ থেকে পৃথক করেন পরীক্ষার মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ؕ وَ
مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۪ فَاٰمِنُوْا
بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

'আল্লাহ মুমিনদেরকে কিছুতেই এমন অবস্থায় থাকতে দেবেন না, যে অবস্থায় তোমরা এখন আছ। তিনি পবিত্র লোকদেরকে নাপাক লোকদের থেকে আলাদা করবেনই। কিন্তু আল্লাহর এটা নিয়ম নয় যে, তোমাদেরকে গায়েবী কথা জানিয়ে দেবেন। গায়েবের কথা জানবার জন্য তো তিনি তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাঁকে বাছাই করে নেন। তাই (গায়েবী বিষয়ে) আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান রাখ। যদি তোমরা ঈমান ও তাকওয়ার পথে চল তাহলে তোমাদের জন্য বিরাট পুরস্কার রয়েছে।' (সূরা আলে ইমরান : ১৭৯)

আল্লাহ তাআলা ওহুদের যুদ্ধে নিষ্ঠাবান ঈমানদারদের কাছ থেকে কপট বিশ্বাসীদেরকে পৃথক করেন। মুনাফিকরা বিপদ আঁচ করতে পেরে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গ ছেড়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছু হটে। শুধুমাত্র নিষ্ঠাবান সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সাথে ছিলেন।

মুফতী শফী (র) বলেন, এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে নিঃস্বার্থ মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য বিধানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা এমন জটিলতা ও দুর্ঘটনার অবতারণা করেন, যাতে কার্যকরভাবে মুনাফিকের প্রতারণা স্পষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে ওহীর মাধ্যমে নাম উল্লেখ করে মুনাফিকদের কথা পরিষ্কার করতে পারতেন; কিন্তু তা করলে কোন প্রমাণ থাকত না। আর তখন মুনাফিকরা বলত আমরা প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার। আমাদের সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারণা চালানো হচ্ছে। বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষার কারণে মুনাফিকরা সরে পড়তে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে তাদের সাথে মুসলমানদের বাহ্যিক মেলামেশাও বন্ধ হয়ে যায়।

পরীক্ষার মাধ্যমে পবিত্র মানুষদেরকে আরও বেশি পূত-পবিত্র করা হয় এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। মূলত যিনি যতবেশি মর্যাদার অধিকারী তাঁকে আল্লাহ তাআলা ততবেশি পরীক্ষা করেন। কারো কারো পরীক্ষা আমরা চোখে দেখি আর কারও পরীক্ষা গোপনে হয়, তা চোখে দেখা যায় না। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর কোন বান্দাহ যদি দুনিয়াতে জাগতিক দৃষ্টিতে সুখে থাকেন তারা অনেক বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন। কেননা যাদেরকে আল্লাহ কষ্ট কম দেন অনেক সময় তারা আল্লাহকে স্মরণ করার কথা ভুলে যান এবং গর্ব ও অহংকারে নিমজ্জিত হন। তাদের ক্ষমতা, ধন, সম্পদ প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে মানুষের উপর যুলুম-নির্যাতন করা শুরু করেন। এর মাধ্যমে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি তাদের জন্য পরকালে আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সত্যিকার ঈমানদাররা সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলেন এবং আল্লাহর শোকর গুজার, বিনয়ী বান্দাহ হিসেবে নিজেদের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আল্লাহকে খুশি করা ও খুশি রাখার চেষ্টা করেন।

বান্দাহ কতটুকু আল্লাহপ্রেমিক তা পরীক্ষা করা

আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদেরকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই প্রমাণ করতে হয় যে, তারা কতটুকু আল্লাহপ্রেমিক। ইবরাহীম (আ)-কে নমরূদের আগুনে ফেলে পরীক্ষা করেই পরীক্ষা শেষ করা হয়নি; এক পর্যায়ে তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানীর নির্দেশ দিয়ে আল্লাহর প্রতি ভালবাসার পরীক্ষা করা হয়। শয়তান বিভিন্নভাবে তাঁকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু উক্ত পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়ে খলীলুল্লাহ তথা আল্লাহর বন্ধু উপাধিতে ভূষিত হন। এভাবে অতীতে বিভিন্ন নবী-রাসূলকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। এভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই তাঁরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন।

পরীক্ষা গুনাহ মাফ ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়

আল্লাহর বান্দাহরা যে সকল বিপদ-মুসীবতের সম্মুখীন হন, সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাহদেরকে দুনিয়াতে যে কোন ধরনের কষ্ট দিলে আখিরাতে তার পুরস্কার দান করবেন। হাদীসে আছে, একদা রাসূলে কারীম (স) বললেন, মুমিন যদি কোন কষ্ট পায় এবং তাতে সবর করে এতে আল্লাহ তাআলা তাকে সওয়াব দান করেন এবং গুনাহ মাফ করেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমরা যে প্রদীপ ব্যবহার করি তা নিভে যাওয়ার কারণে আমাদের যে কষ্ট হয় তাতেও কি সওয়াব আছে? রাসূলে কারীম (স) জওয়াব দিলেন, হ্যাঁ, তাতেও সওয়াব আছে। মুমিন দুনিয়াতে যে সকল বিপদ মুসীবতের সম্মুখীন হয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আল্লাহর বান্দাহরা আল্লাহর যে কোন ফায়সালা যদি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে আল্লাহ তাতে খুশি হন।

আত্মসংশোধন ও আত্মপর্যালোচনার জন্য পরীক্ষা

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহদের মাঝে মধ্যে পরীক্ষায় ফেলে পর্যালোচনা ও আত্মসংশোধনের সুযোগ করে দেন। যারা প্রচলিত সমাজ ও সভ্যতার সংস্কার সাধন করতে চান তাদের মাঝে দোষ-ত্রুটি থাকুক আল্লাহ তাআলা তা পছন্দ করেন না। তাই মাঝে-মধ্যে তাদেরকে বিপদাপদের সম্মুখীন করেন। ফলে তারা উক্ত বিপদাপদের কারণ উদঘাটনের চেষ্টা করেন এবং এতে নিজেদের কোন ত্রুটি আছে কিনা তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ، وَطَآئِفَةٌ قَدْ
اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ، يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ
مِنْ شَيْءٍ ، قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ، يُخْفُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ، يَقُوْلُوْنَ لَوْ
كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ، قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ
كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ، وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا
فِيْ قُلُوْبِكُمْ ، وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

‘এ দুঃখ-বেদনার পর আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কিছু লোকের উপর এমন সান্ত্বনার অবস্থা কায়েম করলেন যে, তাদের ঘুম পেতে লাগল। কিন্তু অন্য আর একটি দল ছিল, যাদের নিকট শুধু তাদের স্বার্থেরই গুরুত্ব ছিল। তারা আল্লাহ সম্পর্কে

নানারকম জাহেলী ধারণা করতে লাগল, যা সরাসরি সত্যের বিরোধী ছিল। তারা এখন বলছে, এ কাজের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে আমাদের কোন অংশ আছে কি? তাদেরকে বলুন, (কারো কোন অংশ নেই) এ কাজের সব ক্ষমতাই আল্লাহর হাতে। আসলে এরা তাদের দিলে যে কথা গোপন করে রেখেছে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে না। তারা বলতে চায়, যদি (নেতৃত্বের) ক্ষমতায় আমাদের কোন অংশ থাকত তাহলে এখানে আমরা নিহত হতাম না। তাদেরকে বলে দিন, যদি তোমরা নিজেদের ঘরেও থাকতে তাহলে যাদের মওত লেখা ছিল তারা নিজেই তাদের নিহত হবার জায়গার দিকে বের হয়ে আসত। আর এই যে ব্যাপার ঘটে গেল তার কারণ হলো, যা কিছু তোমাদের মনে গোপন রয়েছে আল্লাহ তা পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। আর তোমাদের যে ক্রটি আছে তা দূর করতে চেয়েছেন। আল্লাহ মনের অবস্থা খুব জানেন।' (সূরা আলে ইমরান : ১৫৪)

আল্লাহর নিয়ামত উপলব্ধির জন্য

আল্লাহ তাআলা যাদেরকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখেন তাঁরা কঠিন অবস্থায় না পড়লে খুব কমই অনুধাবন করেন যে, স্বাভাবিক অবস্থা আল্লাহর বিরাট নিয়ামত। যেমন– যখন কারো দুটো চোখ দুটো পা দুটো হাত ঠিক থাকে তখন এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে আল্লাহর বিরাট নিয়ামত এবং তার শোকরিয়া আদায় করা উচিত এ কথা স্মরণে আসে না। কিন্তু যখন কোন অঙ্গে অসুখ দেখা যায় তখন এসব অঙ্গের গুরুত্ব ভালভাবে উপলব্ধি হয়।

নিজে বিপদাপদের সম্মুখীন হলে যারা অতীতে বিপদে পতিত হয়েছিল বা বর্তমানে বিভিন্ন দেশে বিপদে পতিত আছে তাদের দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল বান্দাহকে সব সময় একই অবস্থায় রাখেন না। অনেক সময় পৃথিবীর কোথাও কোথাও হাজারো মানুষ জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিংবা অত্যাচারী শাসকের কবলে পড়ে যুলুম-নির্যাতনের শিকার। এভাবে যারা জলোচ্ছ্বাস বা ভূমিকম্পসহ প্রাকৃতিক বিপদাপদে পতিত তাদের জন্য যখন সাহায্য চাওয়া হয় তখন অনেকের হৃদয়ে সামান্যতম করুনাও হয় না। কিন্তু তাঁরা যখন নিজেরা কখনও একই ধরনের বিপদে পতিত হন তখন সামান্য সাহায্য যে কত বড় উপকারে আসে তা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেন। অনুরূপভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যারা অত্যাচারী শাসকের কবলে পতিত হয়ে যুলুম-নির্যাতনের শিকার। এ ধরনের মাযলুম মানবতার পক্ষে ভূমিকা রাখার জন্য যখন আহ্বান করা হয় তখন অনেকেই এটাকে নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব মনে করেন না। কিন্তু যখন নিজেরা একই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হন তখন হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেন, হায়রে, 'যালিমের বিরুদ্ধে কথা বলার মতো কি একজন মানুষও নেই?'

বিপদাপদে ফেলে পরীক্ষা

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহদের অনেক সময় এভাবে পরীক্ষা করেন, যার ফলে জাগতিক দৃষ্টিতে উক্ত পরীক্ষার উপকারিতা কী তা বুঝা কঠিন। এ ধরনের অবস্থাতেও বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহদের কল্যাণের জন্যই পরীক্ষায় ফেলেছেন। তা জাগতিক দৃষ্টিতে অকল্যাণকর মনে হলেও মূলত তার মাঝে কল্যাণই নিহিত রয়েছে। হয়তবা আমাদের সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধির কারণে আমরা উক্ত কল্যাণ বুঝতে পারি না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ۝

'তোমরা এমন জিনিসকে অপছন্দ করছ, আল্লাহ যাতে অনেক মঙ্গল রেখে দিয়েছেন।' (সূরা নিসা: ১৯)। আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন,

وَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ وَ

اللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

'কোন বিষয় তোমাদের কাছে অপছন্দ অথচ সেটাই তোমাদের জন্য ভালো। আর এ-ও হতে পারে যে, কোন জিনিস তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ সেটা তোমাদের জন্য মন্দ। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।' (সূরা বাকারা : ২১৬)

পরীক্ষার মাঝে গোপন অনেক শিক্ষা রয়েছে

আল্লাহ তাআলা কুরআনে আল্লাহর বান্দাহদের পরীক্ষায় ফেলার অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনার মাঝে শিক্ষণীয় অনেক দিক রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

لَقَدْ كَانَ فِیْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِیْثًا یُّفْتَرٰی وَلٰكِنْ تَصْدِیْقَ

الَّذِیْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَتَفْصِیْلَ كُلِّ شَیْءٍ وَّهُدًی وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ۝

'অতীতের এসব কাহিনী থেকে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য উপদেশ রয়েছে। যা কিছু কুরআনে বর্ণনা করা হচ্ছে তা মনগড়া কথা নয়; বরং যেসব কিতাব এর আগে এসেছে, তারই সত্যতা প্রমাণ করছে এবং প্রতিটি কিতাবের ব্যাখ্যা দিয়েছে। আর (এ কুরআন) মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।' (সূরা ইউসুফ : ১১১)

পরীক্ষার মাধ্যমে সঠিক নেতৃত্ব বাছাই

আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আ)-কে নমরূদের আগুনে ফেলে এবং তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে কুরবানী করার নির্দেশ দিয়ে পরীক্ষা করেন। উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তাঁকে শুধু খলীলুল্লাহ উপাধি দেয়া হয়নি বরং তাঁকে সমগ্র মানবজাতির নেতৃত্বের আসনে আসীন করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ۚ قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۚ قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ ۚ قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِی الظّٰلِمِیْنَ ۝

'মনে করে দেখ, যখন ইবরাহীমকে তাঁর রব কিছু বিষয়ে যাচাই করলেন এবং সব বিষয়েই তিনি সফলকাম হলেন, তখন তিনি বলেন, 'আমি তোমাকে সব মানুষের নেতা বানাতে চাই।' ইবরাহীম বললেন, 'আমার সন্তানদের বেলায়ও কি এ ওয়াদা রয়েছে? তিনি জওয়াব দিলেন, 'আমার ওয়াদা যালিমদের ব্যাপারে নয়।' (সূরা বাকারা : ১২৪)

কাসাসুল আম্বিয়া অধ্যয়নের পর জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আ)-কে অগ্নিকুণ্ড থেকে রক্ষা করার পর তিনি আগুন থেকে বেরিয়ে এসে কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর আবার তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। এতে তিনি দেশত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এক সময়, রিক্তহস্তে জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অতঃপর পুত্র ইসমাইলকে নিয়ে মক্কায় আসেন এবং জনমানবহীন মক্কায় শিশু ইসমাইলকে তাঁর মা হাজেরাসহ রেখে যান। শিশু ইসমাইল যখন বড় হয়, আল্লাহ তাআলা আবার তাঁকে পরীক্ষা করেন প্রাণপ্রিয় পুত্রকে কুরবানী করার নির্দেশ দিয়ে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, আল্লাহর উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়নে পিতা-পুত্র উভয়েই ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ইতিহাস সাক্ষী, ইবরাহীম (আ) হাজার বছর ধরে সকল ধর্মাবলম্বী বিশ্ববাসীর কাছে সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন রয়েছেন। আর নমরূদ মশার কামড়ে অতিষ্ট হয়ে মাথা ঠুকরে অপমানজনক মৃত্যুবরণ করে বাড়াবাড়ির শাস্তি পেয়ে হাজার বছর ধরে মানবইতিহাসে 'কলংকজনক নাম'-এর দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় কারা আল্লাহর অনুগত

আল্লাহ তাআলা মাঝে-মধ্যে বান্দাহদের আনুগত্যের পরীক্ষা করেন; কঠিন পরিস্থিতিতে কে কতটুকু অনুগত থাকেন? এ ক্ষেত্রে তালূতের সেনাবাহিনীর

উদাহরণটি খুবই শিক্ষণীয়। তালূতের সেনাবাহিনী যখন খুব বেশি পিপাসাকাতর ছিল, সে সময় তারা সামান্য একটি নদী দেখতে পায়। পিপাসাকাতর সৈনিকদের সামনে পানি ছিল জীবন-মরণ ইস্যু। নদী সামনে পেয়ে পানি পান করার জন্য সবাই যখন খুব উদগ্রীব ছিল সে সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে পানি পান না করার জন্য। উক্ত নির্দেশ পালন করা সত্যিই বড় কঠিন ছিল। ঈমানের এ পরীক্ষায় কিছু লোক সফল হয় কিন্তু অধিকাংশ লোক উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি।

এ সম্পর্কে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

'তারপর যখন তালূত সেনাবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলো, তখন সে বলল, আল্লাহ এক নদীতে তোমাদেরকে যাচাই করবেন। যে এর পানি পান করবে সে আমার সাথী নয়। আমার সাথী শুধু সে-ই, যে তা থেকে পিপাসা মেটাবে না। কিন্তু অল্প কিছু লোক ছাড়া সবাই এ নদী থেকে পুরোপুরি পান করল। যখন তালূত ও তার সাথী মুসলমানরা নদী পার হয়ে এগিয়ে গেল, তখন তারা তালূতকে বলল, আজ জালুত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে লড়াই করার কোন শক্তিই আমাদের নেই। কিন্তু যারা মনে করত যে, একদিন তাদেরকে আল্লাহর সাথে দেখা করতেই হবে, তারা বলল, অনেকবারই এমন হয়েছে যে, আল্লাহর অনুমতিতে এক ছোট দল এক বড় দলের উপর জয়ী হয়েছে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। আর যখন তারা জালুত ও তার সেনাবাহিনীর মোকাবেলায় বের হলো তখন তারা দোয়া করল, হে আমাদের রব! আমাদেরকে সবর দান করো। আমাদের কদম মযবুত রাখ এবং কাফির কাওমের উপর আমাদের বিজয় দান করো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমে তারা কাফিরদেরকে মেরে তাড়িয়ে দিল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও হিকমত দান করেন এবং তিনি যে যে বিষয়ে চাইলেন, সেসব বিষয়ে তাকে জ্ঞান দান করলেন। এভাবে আল্লাহ যদি মানুষের একটা দলকে আর একটা দল দিয়ে দমন করতে না থাকতেন তাহলে দুনিয়ার শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু দুনিয়ার মানুষের উপর আল্লাহর বড়ই দয়া (যে তিনি এভাবে ফিতনা-ফাসাদ দমন করার ব্যবস্থা করতে থাকেন)।' (সূরা বাকারা : ২৪৯-২৫১)

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা তালুতের পিপাসাকাতর সেনাবাহিনীকে পরীক্ষা করলেন কত কঠিনভাবে। পিপাসার্ত মানুষের কাছে এক ফোটা পানি কত বেশি প্রিয় তা সকলেরই জানা। আল্লাহ তাআলা পিপাসার্ত মানুষের সামনে নদী দিয়ে পরীক্ষা করলেন, কারা আল্লাহর নির্দেশ পালনে আন্তরিক।

দাউদ (আ)-এর সময়ে বনী ইসরাঈলকে শনিবারে মাছ ধরতে নিষেধ করার ঘটনাটিও শিক্ষাপ্রদ। দাউদ (আ)-এর সময়ে ইহুদীদেরকে আল্লাহ তাআলা

শনিবার মাছ ধরতে নিষেধ করে পরীক্ষা করেন। কিন্তু তারা ছল-চাতুরী করে উক্ত নির্দেশ পুরোপুরি পালন করেননি। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○

'আর তাদের কাছে সে জনপদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন, যা সমুদ্রের কিনারায় ছিল। (তাদের ঐ ঘটনা মনে করিয়ে দিন যে) সেখানকার লোকেরা শনিবার দিন আল্লাহর হুকুম অমান্য করত। আর মাছ শনিবারেই পানির উপর ভেসে উঠে তাদের সামনে আসত। কিন্তু শনিবার ছাড়া অন্যদিন আসত না। এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, কারণ তারা ছিল নাফরমান।' (সূরা আ'রাফ : ১৬৩)। তাদের উপরিউক্ত নাফরমানীর কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কিভাবে শাস্তি দিলেন তা সূরা বাকারায় ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ○ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

'তারপর তোমাদের কাওমের ঐসব লোকের কথা তো তোমাদের জানাই আছে, যারা শনিবারের আইন অমান্য করেছিল। আমি তাদেরকে বলে দিয়েছিলাম যে, তোমরা বানর হয়ে যাও এবং এমন অবস্থায় থাক, যেন তোমাদের উপর ধিক্কার পড়ে। এভাবেই আমি তাদের পরিণামকে ঐ সময়কার মানুষ ও পরবর্তী লোকদের জন্য উদাহরণ এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ বানিয়ে রেখেছি।' (সূরা বাকারা : ৬৫-৬৬)

মুফতী শফী (র) তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেন যে, সূরা বাকারার ৬৫ নং আয়াতে উল্লেখিত এ ঘটনাটি দাউদ (আ)-এর আমলেই সংঘটিত হয়। বনী ইসরাইলের জন্য শনিবার ছিল পবিত্র এবং সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য নির্ধারিত। এদিন মাছ শিকার নিষেধ ছিল। তারা সমুদ্র উপকূলের অধিবাসী ছিল বলে মাছ শিকার ছিল তাদের প্রিয় কাজ। ফলে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা মাছ শিকার করে। এতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মসখ তথা বিকৃতি বা রূপান্তরের শাস্তি নেমে আসে। তিনদিন পর এদের সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ ঘটনার দর্শক ও শ্রোতারা দুই

শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। অবাধ্য শ্রেণী ও অনুগত শ্রেণী। অবাধ্যদের জন্য এ ঘটনা ছিল অবাধ্যতা থেকে তাওবা করার উপকরণ। এ কারণে একে نَكَال শিক্ষাপদ দৃষ্টান্ত বলা হয়েছে। অপরদিকে অনুগতদের জন্য এটা ছিল আনুগত্যে অটল থাকার কারণ। এ কারণে একে مَوْعِظَة উপদেশপ্রদ বলা হয়েছে।

তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা প্রথমে কলা-কৌশলের অন্তরালে এবং পরে সাধারণ পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে মাছ শিকার করতে থাকে। এতে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল ছিল সৎ ও বিজ্ঞ লোকদের। তারা এই অপকর্মে বাধা দিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ বিরত হলো না। অবশেষে তারা এদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। এমনকি বাসস্থানও দু'ভাগে ভাগ করে নিলেন। একভাগে অবাধ্যরা বাস করত। আর আরেক ভাগে অনুগতরা বাস করত। একদিন অনুগতরা অবাধ্যদের বসতিতে অস্বাভাবিক নীরবতা লক্ষ্য করলেন। অতঃপর সেখানে পৌছে দেখলেন যে, সবাই বিকৃত হয়ে বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কাতাদাহ (রা) বলেন, তাদের যুবকরা বানরে আর বৃদ্ধরা শুকরে পরিণত হয়। রূপান্তরিত বানররা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে চিনত এবং তাদের কাছে এসে অঝোরে অশ্রুবিসর্জন দিত।

আল্লাহ তাআলা একটি উটনি দিয়ে ছামূদ জাতিকে পরীক্ষা করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ ٱللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

'আমি ছামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম। তিনি বললেন, হে আমার কাওম! আল্লাহর দাসত্ব করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট দলীল এসে গেছে। আল্লাহর এ উটনিটি তোমাদের জন্য নিশানা হিসেবে দেওয়া হলো। একে আল্লাহর জমিনে চরে বেড়াতে দাও। কোন বদ নিয়তে একে ধরবে না। তাহলে এক বেদনাদায়ক আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করবে।' (সূরা আ'রাফ : ৭৩)

মূলত উক্ত উটনি ছিল তাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু। অর্থাৎ একটি উটনি তাদের সামনে এনে হাজির করা হলো এবং বলা হলো, এ উটনি একলা একদিন পানি

পান করবে এবং তোমরা ও তোমাদের পশু অন্যদিন পানি পান করবে। তার পালার দিন তোমরা কেউ কূপে পানি নিতে আসবে না এবং তোমাদের পশুকেও পানি পান করাতে আসবে না। এ নির্দেশ তাঁর পক্ষ থেকে দেয়া হলো যাঁর সম্পর্কে তাঁরা বলত তার কোন সৈন্যসামন্ত নেই এবং তাঁর পক্ষে কোন দলবল নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۝ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ۝

'আমরা উটনিকে তাদের জন্য পরীক্ষা হিসেবে পাঠাচ্ছি। তখন তুমি ধৈর্যসহকারে দেখ যে তাদের কী পরিণাম হচ্ছে। তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, পানি তাদের এবং উটনির মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে। প্রত্যেক পক্ষ তার পালার দিন পানি নিতে আসবে।' (সূরা কামার : ২৭-২৮)

আল্লাহ তাআলা এভাবে তাঁর বান্দাহদেরকে নানাভাবে আনুগত্যের পরীক্ষা করেন। হাজীগণ যখন ইহরাম অবস্থায় থাকেন তখন অন্য সময় যেসব প্রাণীকে শিকার করা বৈধ, তা শিকার করা নিষিদ্ধ থাকে। এই সময় শিকার নাগালের মধ্যে পেয়েও কারা শিকার করা থেকে বিরত থাকে আল্লাহ তাআলা তা পরীক্ষা করেন। এ বিষয়টি কুরআনে এভাবে বর্ণিত আছে:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

'হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ তোমাদেরকে ঐসব শিকারের ব্যাপারে কঠিন পরীক্ষায় ফেলবেন, যা একেবারে তোমাদের হাত ও বর্শার নাগালের মধ্যে আসবে, যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে তাকে না দেখেও ভয় করে। এরপরও যে সীমালংঘন করে সেই ঐ লোক, যার জন্যে কঠিন আযাব রয়েছে।' (সূরা মায়িদা: ৯৪)

রমযানে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনাচার নিষিদ্ধ। অথচ তা রমযান ছাড়া অন্য সময়ে শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় করা বৈধ। এভাবে প্রতিনিয়ত নানাধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে আমাদেরকে প্রমাণ করতে হয় যে আমরা আল্লাহর ১০০% অনুগত বান্দাহ। জীবনের কোন ক্ষেত্রে আমরা তাগূতের আনুগত্য করি না। অবশ্য শয়তান আমাদেরকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ধোঁকায় ফেলে আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে তার অনুগত করার চেষ্টা করে।

ধৈর্যের পরীক্ষা

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাহদের মাঝে-মধ্যে ধৈর্যের পরীক্ষা করেন। নূহ (আ) সাড়ে নয় শত বছর দাওয়াতী কাজ করার পরও মাত্র ৪০ জন কিংবা মতান্তরে ৮০ জন তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেয়। অধিকাংশই তাঁর বিরোধিতা করে। ইউনুছ (আ) যদিও ইসরাঈলী ছিলেন, তাঁকে আশিরিয়াদের হেদায়াতের জন্য ইরাকে পাঠানো হয়। তাঁর জাতিকে তিনি আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা তাঁর দাওয়াত শোনার পরিবর্তে বিরোধিতা করত। ফলে তিনি তাঁর জাতির প্রতি বিরাগভাজন হয়ে হিজরত করেন। তবে আল্লাহর নির্দেশ আসার আগে হিজরত করার কারণে তাঁকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি যখন নৌপথে কর্মস্থল ত্যাগ করছিলেন সে সময় নৌকা সঠিকভাবে গন্তব্য অভিমুখে যাচ্ছিল না। ফলে লটারির মাধ্যমে যাকে নদীতে ফেলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তিনি ছিলেন ইউনুছ (আ)। তাঁকে নদীতে ফেলে দেয়ার পর একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলে। মাছের পেটে আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিরাপদ রাখেন। তিনি তাঁর উক্ত ত্রুটির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ক্ষমা করেন। অবশেষে উক্ত মাছ সমুদ্র উপকূলে তাঁকে বমি করে ফেলে দেয়। আল্লাহর কুদরতে তিনি মাছের পেটে জীবিত ছিলেন। আর তাঁর কাওম আযাব দেখার পর তাওবা ইস্তেগফার করে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও মাফ করে দেন।

কুরআন মাজীদে ইউনুছ (আ)-এর উক্ত ঘটনা বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত আছে:

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۗ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

'আমি মাছওয়ালাকেও ঐ নিয়ামত দিয়েছি। যখন তিনি রাগ করে চলে গেলেন এবং মনে করেছিলেন যে, আমি এর কারণে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করব না, তখন শেষ পর্যন্ত (মাছের পেটে থাকা অবস্থায়) অন্ধকার থেকে আমাকে ডাকলেন, 'তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তোমার সত্তা পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি যালিমদের মধ্যে শামিল ছিলাম। তখন আমি তাঁর দোয়া কবুল করলাম এবং দুশ্চিন্তা থেকে তাঁকে নাজাত দিলাম। আর এ রকমভাবেই আমি মুমিনদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি।' (সূরা আম্বিয়া : ৮৭-৮৮)

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ۚ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۝

'ইউনুছের কাওম ছাড়া (এর কি কোন নজির আছে যে,) এক বস্তি আযাব দেখে ঈমান আনল এবং তাদের ঈমান তাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হলো? ঐ কাওম যখন ঈমান আনল তখন অবশ্য আমি তাদের উপর থেকে দুনিয়ার জীবনের অপমানজনক আযাব দূর করে দিলাম এবং একটি মেয়াদ পর্যন্ত জীবন ভোগ করার সুযোগ করে দিলাম।' (সূরা ইউনুছ : ৯৮)

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ۝ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ۝ فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ۝ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝ فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ۝ وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ۝ وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ۝ فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۝

'নিশ্চয়ই ইউনুছও রাসূলগণের একজন ছিলেন। (স্মরণ কর) যখন তিনি একটি বোঝাই নৌকার দিকে পালিয়ে গেলেন। তারপর তিনি এক লটারিতে শরীক হলেন এবং তাতে হেরে গেলেন। শেষ পর্যন্ত মাছ তাঁকে গিলে ফেলল। তখন তিনি (আল্লাহর নিকট) নিন্দার উপযুক্ত ছিলেন। এ অবস্থায় যদি তিনি তাসবীহকারীদের মধ্যে গণ্য না হতেন তাহলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতেন। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় মরু এলাকায় নিয়ে ফেলে দিলাম এবং তাঁর উপর একটি লতানো গাছ উৎপন্ন করলাম। এরপর আমি তাঁকে এক লাখ বা এর চেয়ে বেশি লোকদের কাছে পাঠালাম। অতঃপর তারা ঈমান আনল। কাজেই আমি তাদেরকে এক বিশেষ সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করতে দিলাম।' (সূরা সাফফাত : ১৩৯-১৪৮)

ঈমানদারদের কিভাবে পরীক্ষা করা হয়

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের নানাভাবে পরীক্ষা করেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ، وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ، قَالُوْا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝ أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ۝

'আমি অবশ্যই ভয়-বিপদ, ক্ষুধা, জান ও মালের ক্ষতি এবং আয় কমিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলব। এসব অবস্থায় যারা সবর করে, তাদেরকে সুখবর দাও, যারা বিপদে পড়লে বলে যে, 'আমরা আল্লাহর-ই এবং আল্লাহর কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।' তাদের উপর তাদের রবের পক্ষ থেকে বড়ই মেহেরবানী হবে এবং তাঁর রহমত তাদের উপর ছায়া দেবে। আর এ রকম লোকেরাই সঠিক পথে চলছে।' (সূরা বাকারা : ১৫৫-১৫৭)

কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে জানা যায় যে, ঈমানদারগণ বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন।

ভয়-ভীতিকর অবস্থা

ঈমানদার বান্দাগণ কখনও কখনও ভীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। কিংবা পরিকল্পিত উপায়ে তাদের সামনে ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করা হয়; নানা উপায়ে ভয়-ভীতি ছড়ানো হয়। ফলে দুর্বলচেতা ঈমানদারগণ নিজেদেরকে ঈমানদার হিসেবে পরিচয় দেয়ার হিম্মত পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। পাশ্চাত্যে কোথাও কোথাও ইসলামভীতি (Islamphobia) ছড়ানোর ফলে দুর্বল-চিত্তের কেউ কেউ মুসলিম নাম রাখতেও ভয় পান এবং মুসলিম নাম বদলের মাধ্যমে নিজেকে নন মুসলিম হিসেবে পরিচিত করারও চেষ্টা করেন। কিছু মুসলিম মহিলা হিজাব পরিধান করতে এবং পুরুষেরা দাঁড়ি রাখতেও আতংকগ্রস্ত হন। তবে নিষ্ঠাবান ঈমানদারগণ কোন ধরনের ভয়-ভীতির পরোয়া না করে আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য আল্লাহর পথে অটল থাকেন। দুনিয়ার কোন শক্তিকে ভয় করে আদর্শ ত্যাগ করে না। চতুর্মুখী বাধা আসলেও কখনও সাহস হারায় না বরং সর্বাবস্থায় দীনের উপর অবিচল থাকেন।

নিষ্ঠাবান মুমিনরা বিপদ-মুসীবতকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, অতীতে যারাই ঈমানের ঘোষণা দিয়েছিলেন তাঁরাও নানা ধরনের বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ۝

'এ সময় যদি তোমাদের উপর আঘাত লেগে থাকে, তাহলে এর আগে তোমাদের বিরোধী দলের উপরও এ ধরনের আঘাতই লেগেছে। এটা তো সময়ের উত্থান ও পতন মাত্র, যা আমি মানুষের মধ্যে একের পর এক দিয়ে থাকি। তোমাদের উপর এ সময়টা এ জন্য আনা হয়েছে যে, আল্লাহ দেখে নিতে চেয়েছিলেন, তোমাদের মধ্যে সাচ্চা মুমিন কারা এবং তিনি তোমাদের মধ্য থেকে ঐ লোকদেরকে বাছাই করে নিতে চেয়েছিলেন, যারা আসলেই (সত্যের) সাক্ষী। কেননা যালিমদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। আর তিনি এ পরীক্ষার মাধ্যমে মুমিনদের আলাদা করে নিয়ে কাফিরদেরকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন।' (সূরা আলে ইমরান : ১৪০-১৪১)

আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি ও জাগতিক যশ-খ্যাতির মোহ

ঈমানদারগণ কখনও কখনও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন কিংবা আর্থিক লোভের কারণেই ঈমানের দাবি পূরণ করতে পারেন না। আবার কখনও কখনও জাগতিক যশ-খ্যাতির মোহ কিংবা পদ-পদবি ধরে রাখার স্বার্থে তাঁরা ঈমানের দাবি পূরণ করতে পারেন না। আল্লাহ তাআলা মাঝে মধ্যে কাউকে কাউকে যশ-খ্যাতি দান করে পরীক্ষা করেন যে, যশ-খ্যাতি ধরে রাখার স্বার্থে তারা আদর্শ ত্যাগ করেন কি না?

তাবুক যুদ্ধে কিছু সাহাবা অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তাঁরা আল্লাহর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল আর্থিক ক্ষতির আশংকা। কেননা, তখন ফসল কাটার সময় ছিল। আজকের যুগেও কেউ কেউ চাকরি বা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতির আশংকায় দীনের পথে চলতে পারেন না; আর্থিক ক্ষতির আশংকায় ইসলামের জন্য যথাযথ ভূমিকা পালন করতে আগ্রহী হন না।

অতীতে ঈমান আনার কারণেই অনেকে আর্থিক সংকটে পতিত হয়েছে। বর্তমানেও অনেকের চাকরি-ব্যবসা আদর্শিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নজীর রয়েছে। আদর্শিক বিরোধের কারণে কারো কারো দোকান-অফিস ভাংচুর বা লুট হয়। আবার কেউ কেউ হালাল পন্থায় উপার্জন করার উদ্দেশে অবৈধ পন্থায় বেশি উপার্জন করা থেকে বিরত থাকেন। এর ফলে জাগতিক দৃষ্টিকোন থেকে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। অবশ্য আল্লাহ তাআলা তাঁর ঈমানদার বান্দাহদের দুনিয়াতেও আর্থিক সচ্ছলতা দান করেন। যেমন ওসমান (রা) এত বেশি ধনী ছিলেন যে, তিনি 'ওসমান গনী' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, একদিকে ঈমানের দাবির ফলে কিছু ঈমানদার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন অপরদিকে কিছু মানুষ অর্থনৈতিক লোভের কারণেই ঈমানের দাবি পূরণ করতে পারেন না। এমতাবস্থায় নিষ্ঠাবান ঈমানদাররা ঈমানের দাবি পূরণে অটল ও অবিচল থাকেন। আর দুর্বলচেতা ঈমানদার বা কপট বিশ্বাসীরা আপসকামিতার পথ বেছে নেন। কেননা যশ-খ্যাতি ও ধন-সম্পদ মানুষের জন্য মোহনীয়। মানুষ অঢেল সম্পদের মালিক হতে চায়; দুনিয়াতে নানা ধরনের পদ-পদবির অধিকারী হতে ইচ্ছুক থাকে। এ মোহই মানুষকে আখিরাতের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আল্লাহ তাআলা এসব মোহনীয় জিনিসের মাধ্যমে ঈমানদারদের পরীক্ষা করেন যে, কারা উক্ত জিনিসসমূহকে অধিক ভালবাসে আর কারা আল্লাহকে খুশি করার জন্য এ সব কিছুর মোহ ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ○ قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِيْنَ
اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ
وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ○

'মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্তুতি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং খেত-খামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এ সবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তুসামগ্রী। বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলব? যারা পরহেযগার, আল্লাহর নিকট তাদের জন্য রয়েছে বেহেশত, যার তলদেশে ঝরনা প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে

চিরকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখবেন।' (সূরা আলে ইমরান : ১৪-১৫)

দুনিয়ার কয়েকটি বস্তু আছে, যার প্রতি আকর্ষণ মানুষের জন্য স্বাভাবিক করে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রমণী, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ অন্যতম। মানুষ অনেক সময় এসবের মোহে আখিরাতের কথা ভুলে যায়; অঢেল সম্পদের মালিক হয়েও তা আল্লাহর পথে ব্যয় করতে পারে না। এমনকি সম্পদের মোহে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ পর্যন্ত হয়ে যায়। আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوْدٌ ۝ وَإِنَّهُ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۝ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ ۝ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ ۝ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۝

'নিশ্চয়ই মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ। এবং সে অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত- এবং সে নিশ্চিতই ধন-সম্পদের ভালবাসায় মত্ত। সে কি জানে না যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে এবং অন্তরে যা আছে তা অর্জন করা হবে। সেদিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ জ্ঞাত।' (সূরা 'আদিয়াত : ৬-১১)

উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল যে, মানুষ ধন সম্পদের মোহে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে এবং অধিক সম্পদের লালসায় সব সময় মত্ত থাকে। সম্পদের মোহ তাদেরকে এমন করে ফেলে যে, তারা এক কড়িও খরচ করতে চায় না। সম্পদের লোভ তাদেরকে কৃপণ করে ফেলে।

জীবনের হুমকি

অতীতে অনেকের জীবন শুধুমাত্র ইসলামী আদর্শ অনুসরণের কারণে হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল। তাদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নির্যাতন চলে, যার ফলে তাঁরা শহীদ হন। এ কথাগুলো কুরআনে এভাবে বিধৃত হয়েছে:

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْٓا أَذًى كَثِيْرًا ۚ وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ۝

'হে মুসলমানগণ! তোমাদের উপর মাল ও জানের দিক দিয়ে পরীক্ষা আসবেই এবং তোমরা অবশ্যই আহলে কিতাব ও মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে। যদি এসব অবস্থায় তোমরা সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলতে থাক তাহলে তা বড়ই হিম্মতের কাজ।' (সূরা আলে ইমরান : ১৮৬)

বর্তমান যুগেও শারীরিক হামলা বা নির্যাতন পরিচালিত হচ্ছে কিংবা কষ্টদায়ক কথাবার্তা ছড়ানো হচ্ছে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, জীবনমৃত্যু আল্লাহর হাতে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের জীবন দিয়েছেন এবং তাঁর দেওয়া জীবন প্রয়োজনে তাঁর পথে কুরবানী করার কথা বলেছেন। তিনি আমাদের জীবনের বিনিময়ে জান্নাত দানের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

'(আসল ব্যাপার এই যে,) আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল বেহেশতের বদলে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, (দুশমনকে) মারে এবং (নিজেরাও) নিহত হয়। তাদেরকে (বেহেশত দেওয়ার ওয়াদা) আল্লাহর দায়িত্বে একটি মযবুত ওয়াদা, যা তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে (করা হয়েছে)। ওয়াদা পালনে আল্লাহর চেয়ে বেশি যোগ্য আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে যে বেচা-কেনার কারবার করেছ, সে বিষয়ে খুশি হয়ে যাও। এটাই সবচেয়ে বড় সফলতা।' (সূরা তাওবাহ : ১১১)

মিথ্যা অপবাদ ও অপপ্রচার

অতীতে যারাই দীনের ধারক ও বাহক ছিলেন তাঁদের সম্পর্কে নানা ধরনের অপবাদ দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে মূসা (আ)-এর প্রতি কারূনের মিথ্যাপবাদের ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

মূসা (আ) একবার কারূনের কাছে তার অঢেল সম্পদের যাকাত চান। কারূন যাকাত দেয়ার পরিবর্তে মূসার বিরুদ্ধে মারাত্মক চক্রান্ত করে। সে এক রাতে এক মহিলাকে বলে, 'তুমি অভিযোগ পেশ করবে যে, মূসা তোমার সাথে যেনা করেছে।' তার পরিকল্পনা ছিল– এ অভিযোগের ভিত্তিতে তারা মূসাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করবে। সকাল হলে কারূন মূসার কাছে যায় এবং বলে, এটা কি শরীয়ত নয় যে, কেউ যেনা করলে তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে? মূসা (আ) জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তারপর কারূন বলল, তুমি অমুক মহিলার সাথে যেনা করেছ, তাই রজম তথা পাথর নিক্ষেপে তোমাকে হত্যা করার জন্য নিজেকে সোপর্দ কর। এরপর ঐ মহিলাকে ডাকা হয়। কিন্তু মহিলা ঘটনা সম্পর্কে সত্য

কথা বলে দেয়। মহিলা জবানবন্দীতে উল্লেখ করে যে, 'কারূন তাকে এমন কথা বলার জন্য শিখিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মূসা নিস্পাপ। মূসা তার সাথে যেনা করেনি।' এ কথাই আল্লাহ কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেন, হে মুমিনগণ মূসাকে যারা কষ্ট দিয়েছে তোমরা তাদের মতো হয়ো না। তারা যা বলেছিল, আল্লাহ তা থেকে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে ছিলেন মর্যাদাবান।

আয়েশা (রা) সম্পর্কে মুনাফিকদের মিথ্যা অপবাদের বিষয়টিও কুরআনে আছে। যা 'ইফকে আয়েশা' অর্থাৎ আয়েশার প্রতি মিথ্যা অপবাদ শিরোনামে হাদীস গ্রন্থাবলিতেও উল্লেখ আছে। হিজরী ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ সনের শা'বান মাসে রাসূলে কারীম (স) জানতে পারলেন যে, 'মুরাইসী' নামক স্থানের পাশে বসবাসকারী লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ কথা জানার পরপরই রাসূল (স) একদল সৈন্যবাহিনী নিয়ে এ লোকদের দিকে যাত্রা করলেন। শ্রেষ্ঠ মুনাফিক আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই বিপুলসংখ্যক মুনাফিক সঙ্গে নিয়ে এ যাত্রায় নবী করীম (স)-এর সঙ্গে শরীক হলো। ইব্ন সা'দ বলেন, ইতঃপূর্বে কোন যুদ্ধেই এত সংখ্যক মুনাফিক যোগদান করেনি। অভিযান শেষে এই মুনাফিকরা নানাভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে। আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমত ও রাসূলুল্লাহর (স) দূরদৃষ্টি ও সুযোগ্য নেতৃত্বে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইয়ের সকল চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ সফরেই তারা উম্মুল মুমিনীন 'আয়েশাকে (রা) কেন্দ্র করে এক ষড়যন্ত্র পাকায়। তারা 'আয়েশার (রা) পবিত্র চরিত্রের উপর এক চরম অপমানকর মিথ্যা দোষারোপ করে বসে।

মূল কাহিনীটি বিভিন্ন হাদীস ও সীরাত গ্রন্থ অবলম্বনে আয়েশার (রা) বিবরণের আলোকে সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে প্রদত্ত হলো:

তিনি বলেন, 'রাসূল (স)-এর অভ্যাস ছিল দূরে কোথাও সফরে গেলে কুর'আ বা লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত তার কোন এক পত্নীকে সফরসঙ্গী করতেন। বনূ মুসতালিক যুদ্ধে আমি সফরসঙ্গী নির্বাচিত হই। এটা পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরবর্তী ঘটনা। পর্দা রক্ষার জন্য আমাকে হাওদাসহ (পর্দাবিশিষ্ট আসন) উটের পিঠে উঠানো-নামানো হতো। ফিরে আসার সময় যখন আমরা মদীনার কাছা-কাছি পৌঁছি, রাতের বেলা রাসূল (স) এক মনযিলে তাঁবু গেড়ে অবস্থান করেন। রাতের শেষ ভাগে যাত্রা শুরু করার নির্দেশ আসে। আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য বাইরে যাই। প্রয়োজন সেরে সাওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখি, আমার গলার হারটি কোথাও পড়ে গেছে। আবার ফিরে গিয়ে তা খুঁজতে শুরু করি। এতে বেশ কিছু সময় কেটে যায়। স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলাম যে, কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে। নিয়ম ছিল যে, রওয়ানা হওয়ার সময় আমি আমার 'হাওদায়'

(উটের পিঠের পালকি) বসে যেতাম, তারপর চারজন লোক তা তুলে উটের পিঠের উপর বেঁধে দিত। এ সময় অভাব-অনটনের জন্য আমরা ছিলাম বড়ই হালকা-পাতলা। আমার 'হাওদা' উঠানোর সময় লোকেরা টেরই পেল না যে, আমি ওর মধ্যে নেই। অজ্ঞাতসারে তারা 'হাওদা' উটের পিঠে বসিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল। সৈন্যবাহিনী রওয়ানা হওয়ার পর আমি হার খুঁজে পেলাম এবং ফিরে এসে দেখি সেখানে কেউ নেই। মনে করলাম, তারা আমাকে দেখতে না পেলে আমার স্থানে অবশ্যই ফিরে আসবে। কাজেই যে স্থানে আমি ছিলাম সেখানে গিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে পড়লাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। অপরদিকে সাফওয়ান ইব্‌ন মু'য়াত্তাল আস সালামীকে রাসূলুল্লাহ (স) এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন যে, তিনি কাফিলার পিছনে থাকবেন এবং কাফিলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কোন কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নেবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে পৌঁছলেন। তখন পর্যন্ত প্রভাত-রশ্মি ততটুকু উজ্জ্বল ছিল না। তিনি শুধু একজন মানুষকে নিদ্রামগ্ন দেখতে পেলেন। কাছে এসে তিনি আমাকে দেখে চিনে ফেলেন। কারণ পর্দার নির্দেশ নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে কয়েকবার দেখেছিলেন। আমাকে দেখে তিনি উট থেকে নামলেন এবং বিস্ময়ের সাথে তাঁর মুখে উচ্চারিত হলো- 'ইন্নালিলাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!' রাসূলুল্লাহ (স)-এর বেগম সাহেবা এখানে রয়ে গেছেন! তাঁর কণ্ঠস্বর কানে যেতেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম এবং চাদর দ্বারা মুখ ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর শপথ! তিনি আমার সাথে কোন কথা বলেননি। নিজের উটটি এনে আমার সামনে বসিয়ে দিয়ে তিনি দূরে সরে দাঁড়ালেন। আমি উটের পিঠে উঠে বসলাম। আর তিনি লাগাম ধরে হেটে চললেন। প্রায় দুপুরের সময় আমরা কাফেলাকে ধরলাম, যখন তারা একস্থানে সবেমাত্র থেমেছে। আমি যে পিছনে রয়ে গেছি– এ কথা তাঁদের কারো জানা ছিল না। এ ঘটনার উপর মিথ্যা দোষারোপের এক পাহাড় রচনা করা হলো। যারা এই ব্যাপের অগ্রণী ছিল, তাদের মধ্যে মুনাফিক দলপতি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ছিল সবার চেয়ে অগ্রসর। এ ছাড়াও মুসলমানদের মধ্যে হাসসান ইব্‌ন সাবিত, মিসতাহ ইব্‌ন উসামাহ এবং হামনা বিন্‌ত জাহাশও এতে জড়িয়ে পড়েন।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সাফওয়ানের উটের পিঠে আরোহণ করে 'আয়েশা (রা) যে সময় সৈনিকদের তাঁবুতে উপস্থিত হলেন এবং তিনি পেছনে পড়ে ছিলেন বলে জানা গেল। তখন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই চিৎকার করে বলে উঠল, 'আল্লাহর কসম! এ মহিলাটি নিজেকে বাঁচিয়ে আসতে পারেনি। দেখ, দেখ, তোমাদের নবীর নারী অপরের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে, আর এখন সে প্রকাশ্যভাবে তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে এসেছে।

'আয়েশা (রা) বলেন, মদীনায় ফিরে আসার পর আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। প্রায় একমাস কাল আমি শয্যাশায়ী হয়ে থাকলাম। শহরের সর্বত্র এ মিথ্যা দোষারোপের খবর উড়ে বেড়াতে লাগল। নবী কারীম (স)-এর কান পর্যন্ত পৌছতে দেরি হলো না। কিন্তু আমি কিছুই জানতে পারলাম না। একটি খটকা অবশ্য আমার মনে দানা বাঁধতে লাগল। তা হলো, অসুস্থ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) সাধারত যে রূপ নজর দিতেন এবং দেখাশুনা করতেন, এবার তিনি তেমন দিচ্ছেন না। বরং ঘরে ঢুকে সালাম দিয়ে 'আমি কেমন আছি' জিজ্ঞাসা করেই চলে যেতেন। এতে আমার মনে বড় সংশয় সৃষ্টি হলো। ভাবতাম হয়তো কিছু একটা ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স) থেকে অনুমতি সাপেক্ষে মায়ের নিকট চলে গেলাম। যাতে তিনি আমার সেবা শুশ্রূষা ভালভাবে করতে পারেন।

একদা রাতের বেলা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হলাম। তখনও পর্যন্ত আমাদের সব বাড়িতে টয়লেট নির্মিত হয়নি। তখন আমরা রাতের বেলায় টয়লেটের প্রয়োজন সারতাম। আমরা সাধারণ আরবদের প্রথানুসারে ঘর থেকে দূরে মাঠে বা ঝোপ-ঝাড়ে চলে যেতাম। উম্মু মিসতাহ ঐ রাতে আমার সাথে ছিলেন। তিনি ছিলেন আমার পিতার খালাত বোন। তিনি পথ চলতে গিয়ে হোঁচট খান। তখন অকস্মাৎ তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে, 'মিসতাহ ধ্বংস হোক'। আমি বললাম, আপনি কেমন মা? নিজের ছেলের ধ্বংস কামনা করছেন। আর ছেলেও এমন যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বললেন, মেয়ে! তুমি কি কোন খবরই রাখ না? সে তোমার সম্পর্কে কী বলে বেড়াচ্ছে, তা তুমি শুননি? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে আমার সম্পর্কে কী বলে বেড়াচ্ছে? তখন তিনি অপবাদ রচনাকারীদের কার্যকলাপ ও প্রচারণা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেন। এতে আমার শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি বেড়ে গেল। বাসায় ফিরে আসলাম। অতঃপর রাসূল আমার কক্ষে এসে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করতেই তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে বাপ-মায়ের কাছে চলে গেলাম, উদ্দেশ্য এ বিষয়ে সঠিক সংবাদ জানব। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার সম্পর্কে মানুষ কীসব বলাবলি করছে? তখন তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে ধৈর্য ধারণ করার কথা বললেন। এ ঘটনা শুনে আমার রক্ত যেন শুকিয়ে গেল। সারারাত কেঁদে কেঁদে কাটালাম। ওহী আসতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর পত্নী- বিচ্ছেদের ব্যাপারে পরামর্শ চেয়ে 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব এবং উসামা ইব্‌ন যায়েদকে ডেকে পাঠালেন।

উসামা (রা) 'আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতার বিষয়ে দৃঢ় মনোবল ব্যক্ত করে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আপনার স্ত্রী ('আয়েশা) সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না। আপনি তাঁকে নিজের কাছেই রাখুন। যা কিছু বলে বেড়ানো

হচ্ছে, তা সবই মিথ্যা, রচিত অভিযোগ মাত্র। আর 'আলী (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তো আপনার জন্য এ পৃথিবী সংকীর্ণ করে দেননি। আপনি তার পরিবর্তে অন্য মেয়ে গ্রহণ করতে পারেন। আর আসল ব্যাপার যদি জানতে চান, তাহলে দাসীকে ডেকে অবস্থা জেনে নিতে পারেন। নবী করীম (স) বারীরাকে ডেকে বললেন, তুমি কি 'আয়েশার মাঝে সন্দেহজনক কিছু দেখেছ? বারীরা প্রত্যুত্তরে বলল, 'সে সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তাঁর মাঝে খারাপ বা আপত্তিকর কিছু লক্ষ্য করিনি। তবে তিনি অল্প বয়স্ক কিশোরী হওয়ার কারণে শুধু এতটুকু দোষ দেখেছি যে, রুটি তৈরি করার জন্য আটা খামীর করে রেখে তিনি মাঝে মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তেন, আর বকরি এসে তা খেয়ে ফেলত।' সেদিন নবী কারীম (স) তাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে বললেন, হে মুসলমানরা, তোমাদের এমন কে আছে, আমার স্ত্রীর উপর মিথ্যা অভিযোগ তুলে আমাকে যে কষ্ট দিয়েছে তার আক্রমণ হতে আমাকে বাঁচাতে পারে? আল্লাহর শপথ! আমি আয়েশার মধ্যে কোন দোষ দেখতে পাইনি, না সেই লোকটির মধ্যে, যার সম্পর্কে এ অভিযোগ তোলা হয়েছে। আমার অনুপস্থিতির সময়ে সে তো কখনই আমার ঘরে আসেনি। একথা শুনে উসায়দ ইব্‌ন হুদায়র মতান্তরে সা'দ ইবন মু'য়ায (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! অভিযোগকারী যদি আমাদের বংশের লোক হয়ে থাকে, তবে আমরা তাকে হত্যা করব। আর আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রের লোক হলে আপনি যা বলবেন তাই করব। এ কথা শুনেই খাযরাজ গোত্র-প্রধান সা'দ ইব্‌ন উবাদা দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি কিছুতেই তাকে মারতে পারবে না। তুমি তাকে হত্যা করার কথা শুধু এজন্য বলছ যে, সে খাযরাজ গোত্রের লোক। সে তোমাদের লোক হলে তুমি কখনই তাকে হত্যার কথা বলতে পারতে না। জবাবে তাকে বলা হয়েছিল, তুমি তো মুনাফিক, এই জন্য মুনাফিকদের সমর্থন দিচ্ছ। এরূপ বাকবিতণ্ডায় মসজিদে নববীতে হট্টগোল ও গোলযোগের সৃষ্টি হলো। আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা মসজিদের মধ্যে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু নবী করীম (স) তাদেরকে বুঝিয়ে শান্ত করেন এবং পরে মিম্বরের উপর হতে নেমে আসেন। অন্তত একমাস কাল এ মিথ্যা দোষারোপের বানোয়াট কথা সমাজে উড়ে বেড়াতে লাগল। নবী করীম (স) কঠিন মানসিক যাতনা ভোগ করতে থাকলেন। আমি অবিরাম কান্নাকটি করতে লাগলাম। আমার পিতামাতাও সীমাহীন উৎকণ্ঠা। দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে কালাতিপাত করছিলেন। তারা মনে করছিলেন, অবিরাম ক্রন্দন আমার কলিজাকে বিদীর্ণ করে ফেলবে। ইত্যবসরে আনসার গোত্রের এক মহিলা অনুমতিক্রমে ঘরে প্রবেশ করে আমার সাথে কান্নায়

অংশগ্রহণ করেন। এমন সময় রাসূল (স) সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে আমার কাছে বসলেন। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি একবারও আমার কাছে বসেননি, আবূ বকর ও উম্মু রুম্মান ('আয়েশার পিতামাতা) মনে করলেন, আজ হয়তা কোন সিদ্ধান্তমূলক কথা হয়ে যাবে। এ কারণে তাঁরাও নিকটে এসে বসলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, হে 'আয়েশা! তোমার সম্পর্কে উত্থাপিত অপবাদ অভিযোগ আমার কানে পৌছেছে। তুমি যদি নির্দোষ হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমার পবিত্রতা প্রকাশ ও প্রমাণ করে দেবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাক, তবে আল্লাহর নিকট তাওবা করে ক্ষমা চাও। কারণ বান্দাহ যখন অপরাধ স্বীকার করে তাওবা করে, আল্লাহ তখন ক্ষমা করে দেন।

এ কথা শুনে আমার চোখের পানি শুকিয়ে গেল। আমি হত-বিহ্বল ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। আমি পিতাকে বললাম, আপনি রাসূল কারীম (সা)-এর কথার জবাব দিন। তিনি বললেন, 'মেয়ে! আমি কী বলব তা বুঝতে পারছি না।' আমি আমার মাকে বললাম, আপনিই কিছু বলুন। তিনি বললেন, আমি কী বলব তা আমার বুঝে আসে না। তখন আমি বললাম, আপনাদের কানে একটি কথা এসে তা বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এখন যদি বলি, আমি নির্দোষ, আল্লাহ সাক্ষী, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ, তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি শুধু শুধুই এমন একটি অপকর্মকে স্বীকার করে নিই, যা আমি আদৌ করিনি আল্লাহ জানেন যে, আমি নির্দোষ তবে আপনারাও তা সত্য বলে মেনে নেবেন। আমি তখন ইয়াকূব (আ)-এর নামটি স্মরণ করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা স্মরণে এল না। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, এ পর্যায়ে আমি ঐ কথা বলা ছাড়া উপায় দেখছি না, যা ইউসুফ (আ)-এর পিতা ইয়াকূব (আ) বলেছেন। তা হলো, 'এখন ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম পন্থা, আর তোমরা যা কিছু বলেছ, সে ব্যাপারে আল্লাহই একমাত্র সহায়।'

এ কথা বলে আমি অপরদিকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহ আমার নিষ্কলুষতা সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। তিনি নিশ্চয়ই প্রকৃত ব্যাপার লোকদের সামনে উন্মোচিত করে দেবেন। তবে আমার সপক্ষে 'ওহী' নাযিল হবে, আর তা কিয়ামত পর্যন্ত পড়া হবে, এমন ধারণা আমার মনে কখনো আসেনি। আমি মনে করেছিলাম, রাসূল (স) কোন স্বপ্ন দেখবেন, আর তাতে আল্লাহ আমার নির্দোষিতা প্রকাশ করে দেবেন।

আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (স) তখনও তাঁর জায়গা ছেড়ে উঠেননি এবং বাড়ির কোন লোকও তখন বাইরে যায়নি, এমন সময় নবী করীম (স)-এর উপর ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হলো। তীব্র শীতের মধ্যেও তাঁর চেহারা থেকে টপ

টপ করে ঘামের ফোটা পড়তে লাগল। আমরা সবাই চুপ হয়ে গেলাম। আমি মনে মনে পূর্ণমাত্রায় নির্ভয় ছিলাম। কিন্তু আমার পিতামাতার অবস্থা ছিল বড়ই মারাত্মক। আল্লাহ্ কোন্ মহাসত্য উদঘাটন করেন, সেই চিন্তায় তাঁরা ছিলেন অস্থির ও উদ্বিগ্ন। ওহী অবতরণকালীন অবস্থা শেষ হয়ে গেলে রাসূল (স)-কে অত্যন্ত প্রফুল্ল মনে হলো। তিনি হাস্যোজ্জ্বল বদনে প্রথমেই বললেন, 'সুসংবাদ' আল্লাহ্ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করে ওহী নাযিল করেছেন।' অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন,

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۖ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ○ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا ۖ سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ○ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ○ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ○ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

'নিশ্চয়ই যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্যে এতটুকু আছে, যতটুকু সে গুনাহ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। তোমরা যখন এ কথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করনি এবং বলনি যে, এটা স্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ? তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? অতঃপর যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী। যদি ইহকালে ও পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যা চর্চা করছিলে তজ্জন্যে তোমাদেরকে গুরুতর আযাব স্পর্শ করত– যখন তোমরা একে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন

জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর ব্যাপার ছিল। তোমরা যখন এ কথা শুনলে, তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ তো পবিত্র, মহান। এটা তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনও পুনরায় এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। আল্লাহ তোমাদের করণীয় সম্পর্কে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত এবং আল্লাহ দয়ালু, মেহেরবান না হতেন, তবে কত কিছুই হয়ে যেত। হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন।' (সূরা নূর : ১৫-২১)

মা তখন আয়েশা (রা)-কে বললেন, ওঠো, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শুকরিয়া আদায় কর। আমি বললাম, আমি না উনার শুকরিয়া আদায় করব, না আপনাদের দু'জনের। আমি তো সেই মহান প্রভুর শুকরিয়া আদায় করছি। যিনি আমার নির্দোষ প্রমাণে কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। আপনারা তো এ বানোয়াট অপবাদ ও অভিযোগকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করেন নি।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ 'আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর পবিত্রতা বর্ণনায় নাযিল হওয়ায় আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ঘোষণা দিলেন, যেহেতু মিসতাহ ইবন উসামা 'আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়েছে বা অপবাদ দানকারীদের সমর্থন করছে, সেহেতু এখন থেকে আমি মিসতাহ-এর জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন সাহায্য সহযোগিতা করব না। উল্লেখ্য, তিনি ইতঃপূর্বে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং দারিদ্রের দরুন মিসতাহকে সাহায্য করে আসছিলেন। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হলো:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَ
الْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَ
اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

'তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতাকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।' (সূরা নূর : ২২)

অত্র আয়াত নাযিল হওয়ায় আবূ বকর (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ্ আমার গুনাহ্ মাফ করে দিক, এটা আমি অবশ্যই চাই। তারপর তিনি পুনরায় মিসতাহকে আর্থিক সহযোগিতা করা শুরু করলেন এবং বললেন, আমি এ সাহায্য করা কখনো বন্ধ করব না।

'আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল, আল কুরআনের ভাষায় তাকে 'আল-ইফ্ক' বলা হয়েছে। এ শব্দ দ্বারা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার তরফ হতে এ অভিযোগের পরিপূর্ণ প্রতিবাদ করা হয়েছে। 'ইফ্ক' শব্দের অর্থ মূল কথাকে উল্টিয়ে দেওয়া, প্রকৃত সত্যের বিপরীত যা ইচ্ছা বলে দেয়া। এ অর্থের দৃষ্টিতে এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও মনগড়া কথা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন অভিযোগ সম্পর্কে শব্দটি প্রয়োগ হলে তার অর্থ হয়, সুস্পষ্ট মিথ্যা অভিযোগ, মিথ্যা দোষারোপ।

বর্তমান যুগেও যারা সত্য ও ন্যায়ের পথে আছে তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও অপপ্রচার চালানো হয়। এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় কারা মিথ্যা অপবাদ বিশ্বাস করে আর কারা সত্যানুসন্ধানী থাকে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের ধৈর্যেরও পরীক্ষা করেন।

অসুস্থতা

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাহদের কখনও কখনও শারীরিক অসুস্থতা বা মানসিক কষ্টের মধ্যে রেখেও পরীক্ষা করেন। আইউব (আ)-কে শারীরিক অসুস্থতা দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার এক পর্যায়ে সারা শরীরে পচন দেখা দেয়। শারীরিক দুর্গন্ধের কারণে তাঁর প্রিয় স্ত্রী রহিমা ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী তাঁকে ফেলে দূরে চলে যায়। কিন্তু জীবনে একটিবারের জন্যও তিনি ধৈর্য হারাননি। সব সময় আল্লাহর ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দাহরা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন। আল কুরআনে আইউব (আ)-এর অসুস্থতার বিষয়টি এভাবে বিধৃত আছে:

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ۝

'(এই একই হুকুম ও ইলমের নিয়ামত) আমি আইউবকে দিয়েছিলাম। যখন তিনি তাঁর রবকে ডেকে বললেন, 'আমাকে তো রোগে আক্রমণ করেছে, আর তুমি তো সবচেয়ে বড় মেহেরবান। আমি তাঁর দোয়া কবুল করলাম। রোগের কারণে যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিলাম এবং তাঁকে তাঁর পরিবার-পরিজন তো দিলামই, আমার খাস রহমত থেকে তার পরিবারের সমান সংখ্যায় আরও দিলাম, যাতে ইবাদতকারীদের জন্য এটা একটা শিক্ষা হয়ে থাকে।' (সূরা আম্বিয়া : ৮৩-৮৪)

وَاذْكُرْ عَبْدَنَاۤ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ۝ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ۝ وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ۝ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ۗ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ۗ نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ۝

'(হে নবী!) আমার বান্দাহ আইউবের কথা স্মরণ করুন। যখন তিনি তাঁর রবকে ডেকে বললেন, শয়তান আমাকে খুব কষ্ট ও আযাবের মধ্যে ফেলেছে। (আমি তাকে হুকুম দিলাম) আপনার পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করুন। এ হলো ঠাণ্ডা পানি, গোসল করার জন্য ও খাবার জন্য। আমি তাঁকে তাঁর পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম এবং সেই সাথে আমার পক্ষ থেকে রহমত হিসেবে এবং বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ হিসেবে ঐ পরিমাণ আরও দিলাম। আমি তাকে বললাম, শুকনো ঘাসের একটা আঁটি হাতে নিন এবং তা দিয়েই মারুন। আপনার কসম ভাঙবেন না। আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি। অত্যন্ত ভালো বান্দাহ। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর রবের দিকে রুজু আছেন।' (সূরা ছোয়াদ : ৪১-৪৪)

জাগতিক বিজয় ও দুনিয়ার প্রতি লোভ

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহদেরকে সব সময় কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন করে পরীক্ষা করেন না। তিনি মাঝে-মধ্যে জাগতিক বিজয় দান করে পরীক্ষা করেন, কারা দুনিয়ালোভী হয়ে পড়ে আর কারা সর্বাবস্থায় আখিরাতের পুরস্কারকেই প্রাধান্য দেয়।

আল্লাহ তাআলা ওহুদ যুদ্ধে প্রাথমিক বিজয় ও গনীমত লাভের জন্য নেতৃত্বের নির্দেশ লংঘনের বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেন:

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ۗ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ○

'আল্লাহ (সমর্থন ও সাহায্যের) যে ওয়াদা করেছিলেন তা তো তিনি পুরা করে দিয়েছেন। প্রথমদিকে তোমরা তাঁরই হুকুমে তাদেরকে হত্যা করেছিলে। কিন্তু যখন তোমরা দুর্বলতা দেখালে, নিজেদের কাজে একে অপরের সাথে মতবিরোধ করলে এবং যখনই আল্লাহ তোমাদেরকে ঐ জিনিস দেখালেন, যার মহব্বতে তোমরা পাগল ছিলে (অর্থাৎ গনীমতের মাল) তোমরা নিজেদের নেতার বিরোধিতা করে বসলে। কারণ তোমাদের কতক লোক দুনিয়ার লোভী ছিল, আর কতক লোক আখিরাতের আকাঙ্ক্ষী ছিল। তখন আল্লাহ কাফিরদের মুকাবেলায় তোমাদেরকে পেছনে হটিয়ে দিলেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন। আর সত্য এটাই যে, এরপরও আল্লাহ তোমাদেরকে মাফই করে দিলেন। কেননা মুমিনদের উপর আল্লাহ বড়ই দয়ার খেয়াল রাখেন।' (সূরা আলে ইমরান : ১৫২)

হিজরত তথা দেশত্যাগ

অতীতে অনেককেই নিজের জন্মভূমি ঘরবাড়ি সহায় সম্পদ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে হয়েছে। অনেক সাহাবা মক্কা থেকে হাবশায় হিজরত করেছেন। আর কিছু সাহাবা আল্লাহর রাসূল মদীনায় হিজরত করার পর মদীনায় হিজরত করেছেন। এভাবে মুহাজিরগণ আল্লাহর দীনের জন্য নিজেদের ঘরবাড়ি, ধন সম্পদ সব কিছু আল্লাহর পথে বিসর্জন দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ○

'আল্লাহর কাছে তো তারাই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁর পথে ঘরবাড়ি ছেড়েছে ও ধনপ্রাণ সমর্পণ করে জিহাদ করেছে। তারাই সফলকাম। তাদের রব তাদেরকে নিজের রহমত, সন্তোষ ও এমন জান্নাতের সুখবর দেন

যেখানে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। অবশ্যই আল্লাহর কাছে কাজের প্রতিদান দেওয়ার জন্য অনেক কিছুই রয়েছে।' (তাওবাহ : ২০-২১)

এই আয়াতদ্বয় থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর দীনের প্রয়োজনে যখন ঘর বাড়ি, সহায় সম্পদ ত্যাগ করে হিজরত করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন হিজরত না করা ঈমানের পরিপন্থী। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করা বিরাট সওয়াবের কাজ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহযোগিতা দিয়েছে তারা একে অপরের সহায়ক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু দেশত্যাগ করেনি তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই যতক্ষন না তারা দেশ ত্যাগ করে। অবশ্য তারা যদি ধর্মীয় ব্যপারে তোমাদের সহযোগিতা কামনা করে তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে তাদের মোকাবেলায় নয়। বস্তুত তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সব দেখেন।' (সূরা আনফাল : ৭২)

আল্লাহ তাআলা মুহাজির ও আনসারদের মাল কুরবানীর প্রসঙ্গ চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

'এই ধন সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্য, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের ঘর ভিটা ও ধন সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যিবাদী। যারা মুহাজিরদের আহ্বানের পূর্বে মদীনায় বসবাস করছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে এ জন্যে তারা ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম।' (সূরা হাশর : ৮-৯)

এই দু'টি আয়াতে মুহাজির ও আনসারদের প্রশংসা করে মুহাজিরদের কয়েকটি গুণ তুলে ধরা হয়েছে। আর তা হচ্ছে:

১. আল্লাহর রাসূলের সমর্থক হওয়ার কারণেই স্বদেশ ও সম্পদ ছেড়ে হিজরত করতে হয়েছে। এর ফলে তাঁদের কেউ কেউ ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ট হয়ে পেটে পাথর বেঁধে নিতেন এবং কেউ কেউ শীত বস্ত্রের অভাবে গর্ত খনন করে তাতে ঢুকে শীত থেকে আত্মরক্ষা করতেন। (মাযহারী, কুরতুবী)
২. তাঁরা জাগতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং হিজরত করেননি; কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই তাঁদের কাম্য ছিল।
৩. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করার জন্য তাঁরা বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আল্লাহ তাআলাকে সাহায্য করার অর্থ তাঁর দীনকে সাহায্য করা। এক্ষেত্রে তাঁদের ত্যাগ ও তিতীক্ষা বিস্ময়কর।
৪. তাঁরা কথা ও কাজে সত্যবাদী। ইসলামের কালেমা পাঠ করে তাঁরা আল্লাহ তাআলা ও রাসূলের সাথে যে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।

অতীতে শুধু পুরুষেরা নয় অনেক মহিলারাও হিজরত করেছেন। কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াতসমূহে তার চমৎকার বিবরণ আছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ
بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا
هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ؕ وَاٰتُوْهُمْ مَّاۤ اَنْفَقُوْا ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ
اُجُوْرَهُنَّ ؕ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوْا مَاۤ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوْا مَاۤ اَنْفَقُوْا ؕ ذٰلِكُمْ
حُكْمُ اللّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○ وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى

الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَاۤ اَنْفَقُوْا ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۝ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰۤى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّ لَا يَسْرِقْنَ وَ لَا يَزْنِيْنَ وَ لَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَ لَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ وَ لَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ۝

'হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যখন মুমিন মেয়েলোকেরা হিজরত করে তোমাদের কাছে আসে তখন (তাদের মুমিন হওয়ার ব্যাপারে) তোমরা যাচাই করে নাও। তাদের ঈমানের আসল খবর তো আল্লাহই ভালো জানেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিন, তাহলে তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত দিও না। তারা কাফিরদের জন্য হালাল নয় কাফিরও তাদের জন্য হালাল নয়। তাদের কাফির স্বামীরা তাদেরকে যে মোহর দিয়েছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তোমরা যদি তাদের মোহর আদায় করে তাদেরকে বিয়ে কর তাহলে কোন দোষ নেই। তোমরাও কাফির নারীদেরকে বিয়ের বাঁধনে আটকিয়ে রেখ না। তোমরা তোমাদের কাফির নারীদেরকে যে মোহর দিয়েছিলে তা ফেরত চেয়ে নাও। আর কাফিররা তাদের মুমিন নারীদেরকে যে মোহর দিয়েছিল তা তারা ফেরত চেয়ে নিক। এটাই আল্লাহর হুকুম। তিনিই তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেন। আর তিনি মহাজ্ঞানী ও সুকৌশলী। যদি তোমাদের কাফির নারীদের মোহরের কিছুই (কাফিরদের কাছ থেকে) ফেরত পাওয়া না যায় তবুও কাফিরদের যে নারীরা এদিকে চলে এসেছে তাদেরকে এমন পরিমাণ মোহর দান করো, যা কাফিরদের দেওয়া মোহরানার সমান। আর যে আল্লাহর উপর তোমরা ঈমান এনেছ তাঁকে ভয় করে চল। হে নবী! যখন আপনার কাছে মুমিন মেয়েরা বায়'আত করতে আসে এবং এ ওয়াদা করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনকিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না, নিজ সন্তানকে হত্যা করবে না, জেনেশুনে কোন অপবাদ রচনা করবে না, কোন ভালো কাজে আপনার নাফরমানী করবে না, তাহলে তাদের বায়'আত কবুল করুন, এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাতের জন্য দোয়া করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যাদের উপর আল্লাহ গযব নাযিল করেছেন তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা আখিরাতের ব্যাপারে তেমনি নিরাশ, যেমন কবরের কাফিররা নিরাশ।' (সূরা মুমতাহিনা : ১০-১৩)

আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদেরকে পরীক্ষার কতিপয় দৃষ্টান্ত

আল্লাহ তাআলা অতীতে যেসব নবী ও রাসূল দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তাঁদেরকে নানা উপায়ে পরীক্ষা করেই কাউকে 'খলীলুল্লাহ', কাউকে 'কালীমুল্লাহ', কাউকে 'যাবীহুল্লাহ' আর কাউকে 'হাবীবুল্লাহ'সহ নানা উপাধি দিয়েছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় অতীতে আম্বিয়ায়ে কেরাম কী ধরনের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন তার বিবরণ রয়েছে। উক্ত আয়াতসমূহ অধ্যয়নের সময় হাদীস, সীরাত ও কাসাসুল আম্বিয়া সংক্রান্ত গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন করলে এ সম্পর্কে একটি চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠবে। উক্ত চিত্র চোখের সামনে থাকলে বর্তমান যামানার দুঃখ-কষ্ট বা বিপদাপদ স্বাভাবিকই মনে হবে। মনে হবে, এটাতো চেনা জানা হেরার পথ। এই পথে চলতে গেলে এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়াটাই স্বাভাবিক। বরং এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন না হলেই আতঙ্কিত হওয়ার কথা যে, 'আমরা কি সত্যিই নবী-রাসূলদের পথে আছি?'

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশে ইসলামপ্রিয় মানুষদের উপর যে কঠিন যুলুম-নির্যাতন চলছে তার সাথে অতীতে নবী-রাসূলগণের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অপবাদ-লাঞ্ছনা ও যুলুম-নির্যাতনের বিবরণ মিলিয়ে দেখলে হতাশা ও ঘাবড়ানোর বিপরীতে আমরা ঈমানের নবচেতনা লাভ করতে পারি। অতীতের নবী-রাসূলদের দাওয়াত ও তাঁদের প্রতি তদানীন্তন মানুষেরা কী ধরনের ব্যবহার করেছে আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। কুরআনুল কারীমের এসব বিবরণ থেকে ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা লাভ করা সম্ভব।

বিদ্রূপ করা

আল্লাহ তাআলার প্রিয় নবী-রাসূলগণ আল্লাহর একত্ববাদের কথাই মানুষদের সামনে পেশ করতেন। কিন্তু তাঁদের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার পরিবর্তে অধিকাংশ মানুষ প্রায় সকল নবী-রাসূলকেই বিদ্রূপ করত, হেয়প্রতিপন্ন করা হতো। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ○ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

'হে নবী! আপনার আগে গত হওয়া অনেক কাওমের নিকট আমি রাসূল পাঠিয়েছি। এমন কখনো হয়নি যে, তাদের কাছে রাসূল আসলেন, আর তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি।' (সূরা হিজর : ১০-১১)

হযরত নূহের দাওয়াত ও তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার

নূহ (আ) যে এলাকায় বাস করত তা আজ ইরাক নামে পরিচিত। তাঁর জাতি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করত না এবং আল্লাহর ইবাদত করতেও তাদের আপত্তি ছিল না। কিন্তু তারা শিরকের গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল। তারা আল্লাহর সাথে অন্যান্য সত্তাকে খোদার সাথে অংশীদার মনে করত। যেসব স্বনির্মিত দেবদেবীকে তারা খোদার অংশীদার মনে করত তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য জাতির মধ্য থেকে এক বিশেষ শ্রেণী সৃষ্টি হলো। তারা যাবতীয় ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার মালিক হয়ে গেল। নূহ (আ) যখন মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন, তখন তারা জনসাধারণকে হযরত নূহ (আ)-এর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে এবং তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করে। কুরআনের নিম্নের কয়েকটি আয়াতে তা চমৎকারভাবে বর্ণিত আছে।

- 'তারা বলত নূহ তোমাদের মতোই একজন মানুষ। একথা কী করে মেনে নেওয়া যায় যে, খোদার পক্ষ থেকে তার উপর ওহী এসেছে।' (সূরা আ'রাফ : ৬৩)
- 'তারা আরও প্রচারণা চালাত যে, নূহের আনুগত্য আমাদের মধ্যে নীচ শ্রেণীর লোকেরা না বুঝেই মেনে নিয়েছে। তার কথায় সত্যিই যদি কোন গুরুত্ব থাকত তাহলে আমাদের মুরব্বীগণ তা অবশ্যই মেনে নিত।' (সূরা হুদ : ২৭)
- 'কোন নবী-রাসূল পাঠানোর দরকার হলে আল্লাহ কোন ফেরেশতাকেই পাঠাতেন।' (সূরা মুমিনুন : ২৪)
- 'সে যদি খোদার প্রেরিত হতো তাহলে তার সাথে অর্থভাণ্ডার থাকত। গায়েবের ইলম থাকত। আর ফেরেশতাদের মতো সে যাবতীয় মানবীয় অভাব থেকে বেপরোয়া হতো।' (সূরা হুদ : ৩১)
- 'এ লোক আসলে তোমাদের উপর তার সর্দারি মাতাব্বরি চালাতে চায়।' (সূরা মুমিনুন : ২৪)
- 'তার প্রতি কোন জ্বিনের ছায়া লেগেছে, যে তাকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে।' (সূরা মুমিনুন : ২৫)

নূহ (আ)-এর কাওম ছিল পথভ্রষ্ট। অথচ তারা নূহ (আ)-কে পথভ্রষ্ট মানুষ হিসেবে মনে করত। এই বিষয়টি কুরআনে এভাবে বিধৃত আছে:

'আমি নূহকে তার কাওমের নিকট পাঠালাম। তিনি বলেন, হে আমার দেশবাসী! আল্লাহর দাসত্ব করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য এক ভীষণ দিনের আযাবের ভয় করি। কাওমের সরদাররা জওয়াব দিল, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি স্পষ্ট গোমাহীর মধ্যে পড়ে আছ। নূহ (আ) বললেন, হে আমার কাওম! আমি কোন গোমরাহীতে পড়িনি;

বরং আমি রাব্বুল আলামীনের রাসূল। আমি তোমাদেরকে আমার রবের বাণী পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের হিতকামী। আমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জান না। তোমরা কি এ কারণে অবাক হয়েছ যে, তোমাদের কাওমেরই এক লোকের মারফতে তোমাদের কাছে তোমাদের রবের উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদের সতর্ক করে এবং তোমরা ভুল পথ থেকে বেঁচে যাও। হয়তো তোমাদের উপর রহমত (নাযিল) করা হবে। কিন্তু তারা মানতে অস্বীকার করল। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার সাথীদেরকে একটি নৌকায় রক্ষা করলাম এবং যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করল তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। অবশ্যই তারা অন্ধ লোক ছিল।' (সূরা আ'রাফ : ৫৯-৬৪)

নূহ (আ)-কে তার কাওম উন্মাদ বলে মনে করত। এ বিষয়ে কুরআনে এভাবে বর্ণিত আছে:

'আমি নূহকে তাঁর কাওমের নিকট পাঠালাম। তিনি বললেন, 'হে আমার কাওম! আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা কি ভয় করো না?' তাঁর কাওমের সরদারদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা বলল, 'এ লোকটি তোমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে তোমাদের উপর নেতা হতে চায়। আল্লাহ যদি কাউকে পাঠাতে চাইতেন তাহলে ফেরেশতা নাযিল করতেন। এমন কথা তো আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের সময় শুনিনি (যে মানুষ রাসূল হয়ে আসে)। আসলে কিছুই নয়, লোকটিকে একটু পাগলামিতে পেয়েছে। কিছু সময় অপেক্ষা কর (হয়তো ভালো হয়ে যাবে)। নূহ বললেন, 'হে আমার রব! এরা যে আমাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল, এখন তুমিই আমাকে সাহায্য করো।' (সূরা মুমিনুন : ২৩-২৬)

নূহ (আ)-কে পাথর মেরে হত্যার হুমকি

নূহ (আ) তাঁর মিশনে অবিচল থাকায় তাঁকে পাথর মেরে হত্যার হুমকি প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

'তারা বলল, হে নূহ! তুমি যদি বিরত না হও তাহলে তোমাকে পাথর মেরে শেষ করে দেওয়া হবে। নূহ দোয়া করলেন, 'হে আমার রব! আমার কাওম আমাকে মিথ্যা মনে করছে। কাজেই এখন আমার ও তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সাথে যেসব মুমিন আছে তাদেরকে নাজাত দাও। অবশেষে আমি তাঁকে ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে একটি জাহাজে তুলে বাঁচিয়ে দিলাম। এরপর বাকি লোকদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয়ই এর মধ্যে এক নিদর্শন রয়েছে। আর তাদের বেশির ভাগ লোকই মুমিন ছিল না। নিশ্চয়ই আপনার রব মহাশক্তিশালী ও দয়াবান।' (সূরা শু'আরা : ১১৬-১২২)

কানে কাপড় ঢুকিয়ে রাখা ও কথা না শোনা

নূহ (আ) পেরেশানীর সাথে রাতদিন দাওয়াতী কাজ করতেন। কিন্তু তার কাওম তা শোনার পরিবর্তে কানে কাপড় ঢুকিয়ে রাখত যা কুরআনে এভাবে বিধৃত হয়েছে,

'নূহ (আ) বললেন, 'হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমি আমার দেশবাসীকে রাতদিন দাওয়াত দিয়েছি।' কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের মধ্যে শুধু পালাবার মনোভাব বাড়িয়ে দিয়েছে। আর যখনই আমি তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে মাফ করে দেন, তারা তাদের কানে আঙুল ঠেসে দিয়েছে, তাদের কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিয়েছে, তাদের আচরণে তারা জিদ ধরে রয়েছে এবং খুব বেশি অহংকার করেছে। এরপর আমি তাদেরকে উঁচু আওয়াজে দাওয়াত দিয়েছি। তারপর আমি তাদের কাছে প্রকাশ্যেও তাবলীগ করেছি এবং চুপে চুপেও বুঝিয়েছি। আমি বলেছি, 'তোমাদের রবের কাছে মাফ চাও, নিশ্চয়ই তিনি বড়ই ক্ষমাশীল। 'তিনি তোমাদের জন্য আসমান থেকে খুব বৃষ্টি দেবেন।' তোমাদের মাল ও সন্তান দান করবেন, তোমাদের জন্য বাগান পয়দা করবেন এবং তোমাদের জন্য নদী-নালা বহায়ে দেবেন।' তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর জন্য কোন মান-মর্যাদার আশা কর না? অথচ তিনি তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে পয়দা করেছেন। তোমরা কি দেখতে পাও না, আল্লাহ কিভাবে স্তরে স্তরে সাত আসমান পয়দা করেছেন? এবং তাতে চাঁদকে আলো ও সূর্যকে বাতি বানিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে স্বতন্ত্রভাবে জন্মিয়েছেন। এরপর তোমাদের এ মাটিতেই ফিরিয়ে নেবেন এবং (তা থেকেই) তোমাদেরকে হঠাৎ বের করে আনবেন। আল্লাহ জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানার মতো বিছিয়ে দিয়েছেন। যাতে তোমরা এর মধ্যে খোলা রাস্তায় চলাফেরা করতে পার। নূহ (আ) বললেন, 'হে আমার রব! এরা আমার কথা অমান্য করেছে এবং (ঐ নেতাদের) কথামতো চলেছে, যারা মাল ও স্থান পেয়ে আরও বেশি ব্যর্থ হয়েছে। এরা বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল ছড়িয়ে রেখেছে। এরা বলেছে, 'তোমাদের মাবুদদেরকে কখনো ত্যাগ করো না। আর আদ্দ, সুয়া', ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসরকে তোমরা ত্যাগ করো না। এরা বহু লোককে গোমরাহ করেছে এবং (হে আল্লাহ) আপনিও গোমরাহী ছাড়া এ যালিমদের আর কোন বিষয়ে উন্নতি দেবেন না। তাদের নিজেদের দোষের কারণেই তাদেরকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর তাদেরকে আগুনে দাখিল করা হয়েছে। অতঃপর তারা নিজেদেরকে আল্লাহ থেকে বাঁচাবার জন্য কোন সাহায্যকারী পায়নি। নূহ (আ) বললেন, 'হে আমার রব! এ কাফিরদের একজনকেও দুনিয়ায় থাকার জন্য ছেড়ে দেবেন না। 'যদি আপনি তাদেরকে ছেড়ে দেন তাহলে তারা আপনার বান্দাদেরকে গোমরাহ করবে। আর এদের বংশে

যারাই পয়দা হবে তারা পাপী ও শক্ত কাফিরই হবে।' হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতামাতাকে, যারা মুমিন হিসেবে আমার ঘরে দাখিল হয়েছে তাদেরকে এবং সকল মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে মাফ করুন। আর যালিমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া অন্য কোন বিষয়েই তাদেরকে বাড়তে দেবেন না।' (সূরা নূহ : ৫-২৮)

সুলাইমান (আ)-কে জাদুকর হিসেবে আখ্যায়িত করা

সুলাইমান (আ) আল্লাহর অন্যতম রাসূল ছিলেন। ইহুদীরা তাঁকে রাসূল হিসেবে স্বীকার করার পরিবর্তে জাদুকর বলে আখ্যায়িত করত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে উল্লেখ করেন,

'তারা ঐসব কথা মেনে চলতে লাগল, যা শয়তানেরা সুলাইমানের রাজ্যের নাম নিয়ে পেশ করছিল। অথচ সুলাইমান কখনো কুফরী করেনি। ঐ শয়তানরাই কুফরী করেছিল, যারা জনগণকে জাদু শিক্ষা দিচ্ছিল। তারা ঐসব বিষয়ের প্রতি ঝুঁকে পড়ল, যা ব্যাবিলনে হারূত ও মারূত নামক দু'জন ফেরেশতার উপর নাযিল করা হয়েছিল। অথচ ঐ (ফেরেশতারা) যখনি কাউকে ঐ বিষয়ের শিক্ষা দিত তখন প্রথমে স্পষ্টভাবে সাবধান করে দিত যে, 'দেখ আমরা এক পরীক্ষা মাত্র, তুমি কুফরী করো না।' তবু তারা ফেরেশতাদের কাছ থেকে ঐ বিদ্যা শিক্ষা করত, যা দিয়ে স্বামী ও নারীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা যায়। অবশ্য আল্লাহর অনুমতি ছাড়া এ উপায়ে তারা কারো ক্ষতি করতে পারত না। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা এমন কথা শিখত, যা তাদের জন্য উপকারী ছিল না; বরং ক্ষতিকর ছিল। তারা ভালো করেই জানতো যে, যে ব্যক্তি এ জিনিসের খরিদ্দার হয় তার জন্য আখিরাতে কোন হিস্যা নেই। তারা যে জিনিসের বদলে নিজেদের জান বেচে দিয়েছে তা কতই না খারাপ! হায়, তারা যদি সে কথা জানত।' (সূরা বাকারা : ১০২)

এ আয়াত থেকে জানা যায়, যে ইহুদিরা সুলাইমান (আ)-কে জাদুকর বলে আখ্যায়িত করত। সুলাইমান (আ)-এর সময়ে বাবেলে জাদুবিদ্যার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলদেরকে মু'জিযা দান করেছেন। কিন্তু তা জাদু ছিল না। অথচ ইহুদিরা সবকিছু জানা সত্ত্বেও তারা তাদের জ্ঞানের বিপরীত মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে সুলাইমান (আ)-এর রিসালাতের অস্বীকার করত।

ইবরাহীম (আ)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের ঘটনা

ইবরাহীম (আ) বিশ্ববাসীর নিকট আবির্ভূত নবী। আনুমানিক ২১০০ খ্রিষ্টপূর্বকালে ইবরাহীম (আ)-এর অবির্ভাব হয়। উর শহরে তাঁর জন্ম হয় বলে অনেক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন। তিনি স্বয়ং ইরাক থেকে মিসর এবং শাম ও ফিলিস্তিন থেকে আরব মরুর বিভিন্ন অঞ্চলে আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেন।

হযরত ইবরাহীমের সময়ে দেবদবীর পূজা হতো। সব শহরে একজন রক্ষক থাকত তাকে, 'রাব্বুল বালাদ' বা 'শহরের খোদা' কিংবা রাসূল আলেহা তা মহাদেব মনে করা হতো। উর শহরের রাব্বুল বালাদ ছিল নান্নার। নান্নার শুধু দেবতাই ছিল না বরং দেশের সবচেয়ে বড় জমিদার, বিরাট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ছিল। প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করত উক্ত নান্নার এবং দেশের শাসক তার পক্ষ থেকেই দেশ শাসন করত। উরের যে শাহী খান্দান হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময়ে শাসক ছিল তার প্রতিষ্ঠতার নাম ছিল উরনামু। তার থেকে এ পরিবার নামু নাম গ্রহণ করে যা আরবি ভাষায় নমরূদ হয়ে পড়ে।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জাতি শিরকে লিপ্ত ছিল। তাঁর জাতির গোটা অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থা শিরকের জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত ছিল। তাই হযরত ইবরাহীম (আ) তাওহীদের যে দাওয়াত প্রদান করেন তা শুধু প্রতিমা পূজার উপরই পড়েনি বরং খোদায়ী দাবিদার শাহী খান্দানের উপরও এর বিরাট প্রভাব পড়ে।

নমরূদ আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব অস্বীকার করত না। তার দাবি এই ছিল না যে, যমীন ও আসমানের স্রষ্টা সে; বরং মনে করত সে ইরাকের নিরংকুশ শাসনকর্তা ও আইনকর্তা। সে নিজেকে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী মনে করত। তার কথাই আইন। তার উপরে এমন কেউ নেই, যার কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। তাই যখন ইবরাহীম (আ) নমরূদকে বললেন, নূহ (আ)-এর প্রতি তাঁর কাওমের দুর্বব্যবহারের কথা। যে সত্তার হাতে জীবন-মরণ তিনিই তার প্রভু। তখন নমরূদ বলল, জীবন ও মৃত্যু আমার হাতে। তখন ইবরাহীম বললেন, বেশ! আল্লাহতো পূর্ব দিক থেকে সূর্য উদিত করেন, তুমি একবার পশ্চিম দিক থেকে উদিত করে দেখাও। এ কথা শোনার পর নমরূদ হতবাক হয়ে রইল।

নমরূদ ইবরাহীম (আ)-এর সাথে যুক্তিতর্কে হেরে গিয়ে তাঁকে বন্দী করার নির্দেশ দেয়। ইবরাহীম (আ) দশ দিন বন্দী থাকেন। অতঃপর তাঁকে জীবন্ত জ্বালিয়ে মারার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করে। তারা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে তার মধ্যে ইবরাহীমকে নিক্ষেপ করে। তখন আল্লাহ তাআলা আগুনকে আদেশ করে ইবরাহীমের জন্য শীতল ও অক্ষতিকর হয়ে যাও। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে যে,

'ইবরাহীম বললেন, 'তাহলে তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে (এমন সব মাবুদের) ইবাদত কর, যারা তোমাদের কোন উপকারও করে না, ক্ষতিও করে না। তোমাদেরকে ধিক! আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদত করছ তাদের

প্রতিও ধিক। তোমাদের কি কোন আকল নেই?' তারা বলল, 'তাকে পুড়িয়ে দাও। তোমাদের মাবুদদেরকে সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতেই চাও।' আমি বললাম, 'হে আগুন, তুমি ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং ইবরাহীমের জন্য শান্তিময় হয়ে যাও।' তারা ইবরাহীমের সাথে অন্যায় ব্যবহার করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তাদেরকে চরমভাবে ব্যর্থ করে দিলাম।' (সূরা আম্বিয়া : ৬৬-৭০)

ফেরাউন কর্তৃক মূসাকে দেশত্যাগে বাধ্য করা এবং হত্যার পরিকল্পনা

মূসা (আ) আল্লাহর প্রিয় নবী ছিলেন। তিনি দরদভরা মনে বনী ইসরাঈলকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিলেন। ফেরাউনের দরবারে গিয়েও আল্লাহর দাসত্ব কবুলের আহ্বান জানান। ফলে ফেরাউন তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করে। মূসা (আ) সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউন ও তার সভাসদকে তাওহীদের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা তাঁকে জাদুকর ও মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ইরশাদ করেন,

'আমি মূসাকে ফেরাউন, হামান ও কারূনের কাছে আমার নিদর্শনসমূহ ও এমন সুস্পষ্ট সনদসহ পাঠিয়েছিলাম (যা আমার নবী হওয়ার দলীল ছিল) কিন্তু তারা তাঁকে জাদুকর ও মিথ্যাবাদী বলল। তারপর যখন তিনি আমার পক্ষ থেকে তাদের সামনে সত্য নিয়ে হাজির হলেন, তখন তারা বলল, 'যারা ঈমান এনে তার সাথে শামিল হয়েছে তাদের ছেলেদেরকে হত্যা কর এবং তাদের মেয়েদেরকে জীবিত রাখ।' কিন্তু কাফিরদের চাল ফলহীনই হয়ে গেল। ফেরাউন একদিন (তার দরবারের লোকদেরকে) বলল, 'আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করে দিচ্ছি। সে তার রবকে ডেকে দেখুক। আমি আশঙ্কা করি যে, সে তোমাদের দীনকে বদলে দেবে অথবা দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করবে।' মূসা বললেন, 'যে ব্যক্তি হিসেবের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না, এমন প্রত্যেক অহংকারীর বিরুদ্ধে আমি আমার রব ও তোমাদের রবের নিকট আশ্রয় নিয়েছি। এ সময় ফেরাউনের বংশের এক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন করে রেখেছিল, বলে উঠল, 'তোমরা কি এক ব্যক্তিকে শুধু এ কারণে হত্যা করবে যে, সে 'আল্লাহ আমার রব' বলে? অথচ সে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছে। সে যদি মিথ্যুক হয়ে থাকে তাহলে তার মিথ্যা তার বিরুদ্ধেই যাবে। কিন্তু সে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে সে যেসব ভয়ানক পরিণামের ভয় তোমাদেরকে দেখাচ্ছে এর কিছুটা হলেও অবশ্যই তোমাদের উপর আসবে। আল্লাহ এমন কোন ব্যক্তিকে হেদায়াত দান করেন না, যে সীমা লংঘনকারী মিথ্যাবাদী। হে আমার কাওম! আজ তোমাদের হাতে বাদশাহী রয়েছে। তোমরাই এ দেশে বিজয়ী শক্তি। কিন্তু

যদি আমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়ে, তখন কে আছে, যে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে? তখন ফেরাউন বলল, আমি তোমাদেরকে ঐ মতামতই দিচ্ছি, যা আমি সঠিক মনে করছি। আর আমি ঐ পথেই তোমাদেরকে পরিচালনা করছি, যা সঠিক। তখন ঐ ব্যক্তি, যে ঈমান এনেছিল সে বলল, হে আমার কাওম! আমার ভয় হচ্ছে যে, না জানি তোমাদের উপর ঐ দিন এসে যায়, যা এর আগে বহু দলের উপর এসে গেছে। যেমন নূহের কাওম, আদ ও ছামূদ জাতি এবং তাদের পরের কাওমগুলোর উপর এসেছিল। আর এ কথা সত্য যে, আল্লাহ তার বান্দাহদের উপর যুলুম করার কোন ইচ্ছা রাখেন না। হে আমার কাওম! আমি ভয় করি যে, তোমাদের উপর ফরিয়াদ ও বিলাপের দিন এসে না পড়ে, যখন তোমরা একে অপরকে ডাকবে এবং পালিয়ে বেড়াবে। কিন্তু তখন আল্লাহ থেকে বাঁচাবার কেউ থাকবে না। সত্য কথা হচ্ছে যে, আল্লাহ যাকে গোমরাহ করে দেন, তাকে পথ দেখাবার আর কেউ থাকে না।' (সূরা মুমিন : ২৩-৩৩)

ফেরাউন আল্লাহকে স্বীকার করার পরিবর্তে নিজেকেই রব হিসেবে ঘোষণা দেয়। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى فَأَوْقِدْ لِى يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ
فَٱجْعَل لِّى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝

'তখন ফিরাউন বলল, 'হে (আমার) দরবারের লোকেরা! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ আছে বলে তো আমি জানি না। হে হামান! ইট দিয়ে আমার জন্য একটা উঁচু দালান তৈরি করে দাও তো! হয়তো তাতে উঠে আমি মূসার ইলাহকে দেখতে পাব। আমি তো তাকে মিথ্যুক মনে করি।' (সূরা কাসাস: ৩৮)

ফেরাউন যখন মূসাকে হত্যা করার চক্রান্ত করে তখন তাঁর এক শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁকে স্থান ত্যাগের পরামর্শ দেন। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে:

وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ
فَٱخْرُجْ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّٰصِحِينَ ۝

'এরপর এক লোক শহরের অপর দিক থেকে দৌড়ে এসে বলল, 'হে মূসা! কর্তা ব্যক্তিরা তোমাকে হত্যা করার জন্য পরামর্শ করছে। কাজেই এখান থেকে সরে যাও। নিশ্চয়ই আমি তোমার হিতকামীদের একজন।' (সূরা কাসাস : ২০)

মূসা (আ)-কে ফেরাউনের বাহিনী দেশত্যাগে বাধ্য করে। এভাবে অনেক নবী-রাসূলকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا، فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ ۝

'শেষ পর্যন্ত কাফিররা তাদের রাসূলগণকে বলে দিল, 'হয় তোমাদেরকে আমাদের পথে ফিরে আসতে হবে, আর না হয় আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব।' তখন তাদের রব তাদের নিকট ওহী পাঠালেন, 'আমি ঐ যালিমদেরকে ধ্বংস করে দেব এবং তাদের পর আপনাদেরকে পৃথিবীতে আবাদ করব। যারা আমার কাছে জবাবদিহিকে ভয় করে এবং আমার শাস্তিকে ভয় পায় তাদের জন্যই এ নিয়ামত।' (সূরা ইবরাহীম : ১৩-১৪)

আসিয়া ও তাঁর দাসীকে নির্মমভাবে হত্যা

ফেরাউনের আসিয়া মূসাকে সব সময় সহযোগিতা করেন। ফেরাউনের জনৈক অনুসারী নিহত হবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফেরাউন যখন মূসার উপর ক্ষিপ্ত হয় এবং তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। ফেরাউন পত্নী এ পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন এবং হেযকিলের মাধ্যমে মূসাকে স্থান ত্যাগের পরামর্শ দেয়। কুরআন মাজীদে সে ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'এ সময় শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এল এবং বলল, হে মূসা! রাজ্যের পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। অতএব তুমি বের হয়ে যাও। আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী' (সূরা কাসাস : ২০)

হেযকিল মূসাকে ফেরাউন পত্নীর পরামর্শ দেওয়ার পরপর মূসা স্থান ত্যাগ করে। অতঃপর হেযকিল রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে দেখে আসিয়া খুবই পেরেশান। হেযকিল তাকে মূসার স্থান ত্যাগের কথা জানালে ফেরাউন পত্নী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এরপর অনেক দিন চলে যায়। এরই মাঝে মূসা (আ) নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন। রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণের পর আল্লাহ মূসা (আ)-কে নির্দেশ দেন, 'হে মূসা তুমি ফেরাউনের কাছে যাও, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে।' (সূরা নাযি'আত: ১৭)

আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ পাবার পর মূসা ও হারূন ফেরাউনের রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে রিসালাতের ঘোষণা দেয়। 'মূসা বললেন, হে ফেরাউন! আমি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে রাসূল হিসেবে এসেছি। আমার এটাই দায়িত্ব যে, আমি

আল্লাহর নাম নিয়ে হক ছাড়া কোনো কথাই বলব না। আমি তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলিল নিয়ে এসেছি। তাই বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে যেতে দাও।' (সূরা আ'রাফ: ১০৪-১০৫)

অতঃপর মূসা ও হারূন (আ) ফেরাউনকে আল্লাহর উপর ঈমান আনতে আহ্বান জানায়। তাঁরা ফেরাউনকে আরও বলেন, 'বনী ইসরাঈলের উপর অন্যায়ভাবে আর নির্যাতন চালাতে পারবেন না। ফেরাউন মূসার মুখে এসব কথা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে। ফেরাউন রাগত স্বরে বলে, 'তুমি কি সে মূসা নও, যাকে আমি লালন-পালন করিয়েছি?' আসিয়া ফেরাউনের এ প্রশ্ন শুনে ভেবেছিল, হয়তবা মূসা লজ্জিত হয়ে কথার ইতি টানবে। কিন্তু মূসা এ কথার জবাবে দৃঢ়তার সাথে বললেন, 'হ্যাঁ। তোমার ঘরে আমার লালন-পালন ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। তোমার যুলুম এত চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আমি যদি আমার নিজ ঘরে লালিত-পালিত হতাম তাহলে তুমি আমার ঘরে গিয়ে আমাকে হত্যা করতে। এটা রাব্বুল আলামীনের রহমত যে, আমাকে তোমার ঘরে লালন-পালন করিয়েছেন। আর আমার লালন-পালন তোমার ঘরে হওয়াটাই তোমার যুলুমের নিদর্শন।

এরপর ফেরাউনের ক্রোধ আরও বেড়ে যায়। ফেরাউন উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করে, 'কে সেই রাব্বুল আলামীন?' ফেরাউনের প্রশ্নের জবাবে মূসা বলল, 'তুমি যদি তোমার নিজের জীবন, তোমার চারপাশে যে বিশাল সৃষ্টিজগৎ দেখতে পাও তা নিয়ে একটু ভাব তাহলে তোমার কাছেই পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, যিনি আসমান-যমীন ও এর মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন, তিনিই হচ্ছেন রাব্বুল আলামীন। এ কথা শোনার পর ফেরাউনের রাগ আরও বেড়ে যায়। কারণ, সে নিজেকে রব বলে দাবি করেছিল। ফেরাউন যখন ক্রোধান্বিত, এ সময়ই ফেরাউন পত্নী আসিয়ার সাহসী উচ্চারণ শোনা যায়। আসিয়া নির্ভিকচিত্তে ঘোষণা করল, 'আমি মূসার রবের প্রতি ঈমান এনেছি এবং মূসা ও হারূন যা কিছু দাবি করছে সব কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি।' সে সময় ফেরাউন হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলে 'যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ বলে স্বীকার কর তাহলে তোমাকে কারাগারে আটক করে রাখব।' এরপর মূসা বলল, হে ফেরাউন! যদি আমার দাবির স্বপক্ষে কোন অলৌকিক কিছু দেখ তাহলে কি আমার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে? ফেরাউন ভেবেছিল মূসা আবার কী দেখাবে? তাই তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, আচ্ছা, তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে কিছু মুজিযা দেখাও। এ কথা শোনার পর আসিয়া ভাবল, এবার মূসা কি জাদু দেখাবে? না সেই মুজিযা দেখাবে. যা আমার স্বামী প্রদর্শন করতে বলছে?

আসিয়া মনে মনে ভাবল, মূসা যদি জাদু প্রদর্শন করে তাহলে তো ফেরাউনের সাথে টেক্কা দিয়ে পারবে না। কারণ, ফেরাউনের সাথে বিশ্বসেরা জাদুকরগণ আছে। আর যদি মূসা অন্য কিছু প্রদর্শন করে তাহলে ভিন্ন কথা। মূসা মুহূর্তের মধ্যে হাত থেকে লাঠি ফেলে দিল। লাঠি বিরাট সাপে পরিণত হয়ে ফেরাউনের প্রতি দৌড়াতে লাগল। ফেরাউন ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেকে সামলিয়ে আবার প্রশ্ন করল, 'হে মূসা তোমার কাছে খেলা দেখাবার মতো আর কোন জাদু আছে? মূসা এ কথা শোনার সাথে সাথে নিজের হাত পকেটে ঢুকিয়ে আবার বের করলেন। হাত পকেট থেকে বের করার পর শুভ্র হয়ে গেল এবং ঝকমক করতে লাগল। আসিয়া মূসার এসব কীর্তি দেখে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করল এবং মনে মনে ভাবতে লাগল যে, আল্লাহই মূসার সাহায্যকারী। ফেরাউন মূসার মুজিযা দেখার পর তার সহযোগীদের ডেকে বলে, মূসা ও তার ভাই হারুন জাদুকর হয়ে গেছে। তারা উভয়েই তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে চায়। এ ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কী? এ কথা শোনার পর ফেরাউনের কোন কোন উপদেষ্টা বলল, 'তাদেরকে বন্দী করে রাখা হোক।' আবার কেউ কেউ পরামর্শ দিল, 'আমাদের সকল জাদুকরদেরকে একটি ময়দানে জমায়েত করা হোক। সেখানে মূসা ও তার ভাইকেও ডাকা হোক। মূসার জাদু আমাদের জাদুকরদের সামনে টিকবেই না। ফলে আমাদের জাদুকরদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে।'

অনেক আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো, সকল জাদুকর তাদের জাদু প্রদর্শন করবে। তারপর মূসাকে তার জাদু প্রদর্শন করতে বলা হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক মাঠে সকলেই জমায়েত হলো। জাদুকরগণ যখন নানা ধরনের জাদু প্রদর্শন করতে লাগল। আসিয়া ও মূসা স্বয়ং ভীত হয়ে পড়ল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মূসার মনে সাহস দিলেন। মূসাকে নির্দেশ দেয়া হয় তার হাতের লাঠি ফেলে দিতে। লাঠি মুহূর্তের মধ্যে এত বিরাট সাপে পরিণত হয় যে, সকল জাদুকরের জাদুকর্ম খেয়ে ফেলল। এ দৃশ্য দেখার পর আসিয়া খুশীতে আত্মহারা হয়ে বলে উঠে, সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি মূসাকে নাজাত দিয়েছেন।

মূসার লাঠি বিশাল সাপে পরিণত হবার দৃশ্য দেখার পর অনেক জাদুকর হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং অনেকেই ঈমান আনয়নের ঘোষণা প্রদান করে। এতে ফেরাউন আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং যারা মূসার প্রতি ঈমান এনেছে তাদের উপর নির্যাতন চালায়। অনেককে হত্যা করে। ফেরাউন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তার প্রাসাদে এসে বলতে থাকে, 'আমি মূসাকে হত্যা করব।' সে সময় আসিয়া ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ হেযকিল সেখানে উপস্থিত ছিল। আসিয়া মনে মনে ভাবতেছিল 'যদি হেযকেল চুপ থাকে কতই না ভাল হতো।' কিন্তু হেযকেল

সাহসিকতার সাথে ফেরাউনকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'তুমি কি এমন একজন মানুষকে হত্যা করতে চাও, যে বলে আল্লাহ আমার রব।' হেযকিলের এ ধরনের সাহসী উচ্চারণ ফেরাউনের রাগকে আরও তাতিয়ে তোলে। ফেরাউন নিজেকে মানুষের ইলাহ হিসেবে ঘোষণা দেয়ার পর তার সামনে কেউ এ ধরনের কথা বলতে সাহস পাবে– একথা সে কখনও ভাবেনি। ফেরাউন তাকে কঠিন শাস্তি দেয়ার মনস্থ করল। আল্লাহর ইচ্ছায় হেযকিল ফেরাউনের দরবার থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

ফেরাউন তার বালাখানায় আসিয়ার সাথে মূসা প্রসঙ্গে একান্ত আলাপ শুরু করে। আলাপের এক পর্যায়ে ফেরাউন বলে, 'হে আসিয়া! তুমি কি আমার স্ত্রী নও? তুমি কেন মূসার বিরুদ্ধে আমাকে সহযোগিতা করছ না?' আসিয়া তদুত্তরে বলল 'তুমি মূসাকে কেন অপছন্দ করছ?' ফেরাউন জবাবে বলে 'সে আমাকে ইলাহ হিসেবে স্বীকার করছে না।' আসিয়া প্রতি উত্তরে বলে 'এ কারণে মূসার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়। ভালভাবে চিন্তা কর, তুমি ও তোমার উজির হামান সত্যের উপর নাকি মূসা? আসিয়ার সাথে কথোপকথনের পর ফেরাউনের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, তার রাজ পরিবারের ভেতরই মূসার অনুসারী হয়ে গেছে। বিশেষত হেযকিল, তার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ও আসিয়ার সেবিকা সকলেই মূসার ভক্ত হয়ে পড়ে। ফেরাউন তার সৈন্য বাহিনীকে আদেশ দেয় তাদেরকে নির্মম শাস্তি দেয়ার জন্য। নির্দেশমতো একদল সৈন্য এসে আসিয়ার সেবিকা ও অন্যদেরকে বন্দী করে ফেলে। আসিয়ার সেবিকাকে কেউ চুল ধরে আর কেউ হাত পা ধরে ফেরাউনের সামনে নিয়ে যায়। ফেরাউন তাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করে, 'হে বিশ্বাসঘাতিনী! বল, তোমার রব কে?' সেবিকা জবাব দেয় 'আমার ও তোমার রব একজনই, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। যিনি সকলকেই সৃষ্টি করেছেন।' এ কথা শোনার পর ফেরাউন উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগল, 'হে বিশ্বাসঘাতিনী! তুমি আমার সাথে এ কথা বলতে পারলে? তোমার সাহস এত বেশি হয়ে গেছে?' অতঃপর দেহরক্ষীর দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দেয়, 'একে আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা কর। তাকে হত্যার আগে তার সামনে তার ছেলে সন্তানকে আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা কর। সে যেন তাদের আর্তচিৎকার নিজ কানেই শুনতে পায় এবং করুণ অবস্থা সচক্ষে দেখতে পায়।'

ফেরাউনের রক্ষীবাহিনী আগুন জ্বালিয়ে সেবিকা ও তার ছেলে-মেয়েকে শাস্তি দিতে লাগল। ফেরাউন শাস্তি দেয়া অবস্থায় আবারও প্রশ্ন করে, 'বল, তোমার রব কে?' সেবিকা জবাব দেয়, 'আমার রব সেই একক সত্তা, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন.।' এ কথা শোনার পর শাস্তি আরও বাড়িয়ে দেয়া হয়। সেবিকার সামনেই তার ছেলেকেও শাস্তি দেয়া হয়। আল্লাহর প্রতি কী ঈমান! এত নির্যাতনের পরও ভড়কে না গিয়ে ছেলে তার মাকে লক্ষ্য করে বলে, 'হে আমার প্রিয় মা! ধৈর্য ধারণ কর।

তুমিই হকের উপর আছ।' আসিয়ার চোখের সামনে এ ধরনের নির্যাতন দেখার পর বেদনায় কাঁদতে থাকে এবং উচ্চস্বরে বলতে থাকে, 'হে ফেরাউন তুমি ধ্বংস হও। তুমি আমার ও তার রবের জাহান্নামের আগুনে ধ্বংস হবে।' ফেরাউন আসিয়ার কথা শোনার পর বলতে থাকে, 'আসিয়াকেও সর্বশেষ মূসার শয়তানে ধরেছে। সে পাগল হয়ে গেছে।' আসিয়া জবাব দেয়, 'না আমি পাগল হইনি। আমি পূর্ণ সুস্থ আছি। নিশ্চয়ই আমি আমার, তোমার, তোমার উজিরবৃন্দ, সৈন্য বাহিনী ও সকল কিছুর যিনি রব, সেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। যিনি রাব্বুল আলামীন।' ফেরাউন এ কথা শোনার পর নির্দেশ দেয় আসিয়াকেও তার সেবিকার মতো শাস্তি দাও। তবে তাকে শাস্তি দেয়ার আগে তার মাকে সংবাদ দাও। তার মা এসে তার মেয়ের পরিণতি স্বচোখে প্রত্যক্ষ করুক। আসিয়ার মা এসে আসিয়াকে লক্ষ্য করে বলল, 'মা বল, মূসার প্রতি তোমার ঈমান আনার কথা কি সত্য?' আসিয়া দৃঢ়তার সাথে জবাব দেয়, 'হে আমার প্রিয় মা! মূসা যা কিছু দাবি করে তা সত্য। আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি।' আসিয়াকে তার মা ঈমানের দাবি থেকে ফেরানোর অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। ফেরাউন যখন দেখল আসিয়া ঈমানের দাবিতে অটল ও অবিচল আছে তখন তাকে শাস্তি দেয়ার আদেশ দেয়া হয়। ফেরাউনের সৈন্যবাহিনী নির্মম নির্যাতন শুরু করে। আসিয়া নির্যাতনের কঠিন মুহূর্তে কিভাবে কাতরকণ্ঠে আল্লাহর দরবারে আকুতি জানায় তা কুরআনে এভাবে উল্লেখ আছে–

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي
الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

'ঈমানদারদের ব্যাপারে আল্লাহ ফেরাউনের বিবির উদাহরণ পেশ করেছেন, যখন সে দোয়া করেছিল, 'হে আমার রব! আমার জন্য তোমার কাছে বেহেশতে একটা বাড়ি বানিয়ে দাও, আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করো এবং যালিম কাওম থেকে আমাকে নাজাত দাও।' (সূরা তাহরীম : ১১)

মুফতী শফী (র) বলেন, এটা ফেরাউন পত্নী আসিয়া বিনতে মুযাহিমের দৃষ্টান্ত। মূসা (আ) যখন জাদুকরদের মোকাবেলায় সফল হন তখন বিবি আসিয়া তার ঈমান প্রকাশ করেন। ফেরাউন ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে ভীষণ শাস্তি দিতে চাইল। কিছু রেওয়ায়েতে আছে, ফেরাউন তার চার হাত পায়ে পেরেক মেরে বুকের উপর ভারী পাথর রেখে দিল যাতে তিনি নড়াচড়া করতে না পারেন। এ অবস্থায় তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত দোয়া করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ফেরাউন উপর থেকে একটি ভারী পাথর তার মাথার উপর ফেলে দিতে মনস্থ করলে তিনি এ দোয়া করলে আল্লাহ তাঁর জান কবজ করেন এবং পাথরটি নিষ্প্রাণ দেহে পতিত হয়।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে আল্লামা শাওকানী (র) লেখেন, মুমিন লোকদের প্রকৃত অবস্থা কী হতে পারে তা দেখার ও তার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের নারীকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন। সে সাথে আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ়তা দেখানো, দীন ইসলামকে সর্বদা আঁকড়ে ধরে থাকার এবং কঠোর দুর্বিসহ অবস্থায়ও ধৈর্য ধারণ করার উৎসাহ দান করা হয়েছে এ উপমা থেকে। পরন্তু দেখানো হয়েছে যে, কুফরী শক্তির যতই দাপট বা প্রতাপ হোক তা ঈমানদার লোকদের এক বিন্দু ক্ষতি করতে পারে না। যেমন ফেরাউনের মতো একজন বড় কাফেরের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও সে তার স্ত্রীর এক বিন্দু ক্ষতি করতে পারেনি। বরং তিনি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমানসহকারেই নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে চলে যেতে পেরেছেন।

আসিয়ার এ কাহিনী থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। আজকের যুগেও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের কথা ঘোষণা করার অপরাধে মিসরের যয়নাব আল গাযালীসহ অনেক মহিলাকে নির্মম নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। যারা এভাবে নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করে আল্লাহর পথে অটল ও অবিচল থাকেন, তাদের অনুপ্রেরণার উৎস আসিয়া। আসিয়া রাজসম্মান, সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ পদদলিত করে নির্যাতনকে হাসিমুখে বরণ করে প্রমাণ করলেন, আখিরাতে নাজাতের জন্য দুনিয়ার সুখ-সাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করার মধ্যেই প্রকৃত সুখ নিহিত। আসিয়া আজ পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের আবেগ ও অনুভূতির সাথে জড়িত। আর ফেরাউনকে স্মরণ করা হয় ঘৃণা ও ধিক্কারের সাথে। তার পরিণতিও হয়েছিল কত শোচনীয়! নীল নদের মধ্যে ডুবে চরম বেইজ্জতির সাথে তার মরণ হয়। আর আখিরাতে তাকে আগুনে জ্বলতে হবে অনন্তকাল। আর আসিয়াসহ যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কারণে যালিমদের যুলুম ভোগ করেছিলেন তারা থাকবে জান্নাতে সুন্দর বালাখানায়, মনোরম প্রাসাদে।

আসিয়ার সেবিকার ঈমান গ্রহণের বিষয়টিও শিক্ষণীয়। তাকে যখন নির্যাতন করা হয়, তার ছেলের ঈমানদীপ্ত উচ্চারণ, 'হে মা! তুমি ধৈর্য ধারণ কর। তুমি হকের উপর আছ।' একথা আজও শিহরণ জাগায়। মায়ের কারণে ছেলেকেও নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয়। অথচ নির্যাতনের মুহূর্তে ভড়কে না গিয়ে মাকে সান্ত্বনার বাণী শোনানো বিরাট হিম্মত ও ঈমানী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। অপরদিকে আসিয়ার মা আসিয়াকে ঈমানের পথ থেকে ফেরানোর চেষ্টার মধ্যেও শেখার অনেক কিছু আছে। বর্তমানেও যারা আল্লাহর পথে চলছে, তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরানোর জন্য আত্মীয়-স্বজন দিয়েও চেষ্টা করা হয়। আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করে বলে, 'তুমি দীন কায়েমের পথ থেকে চলে এসো। কী দরকার এতসব ঝামেলায় জড়ানো?' এ ধরনের কথায়

কেউ কেউ পিছপা হয়ে যায়। একমাত্র তারাই আল্লাহর দীন কায়েমের পথে অটল ও অবিচল থাকে, যাদের মধ্যে আসিয়ার মতো ঈমানী জযবা আছে। যাদের হৃদয় আল্লাহর প্রেম ও ভালবাসায় ভরপুর। যারা দুনিয়ার যেকোন চাওয়া-পাওয়ার চেয়ে আল্লাহর সন্তোষ লাভকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

ইউসুফ (আ)-এর প্রতি মিথ্যা তোহমত ও কারাগারে প্রেরণ

ইউসুফ (আ) সম্পর্কে রানী জুলায়খার অপবাদের বিষয়টি কুরআনে বর্ণিত আছে। আল্লাহর প্রিয় নবী ইউসুফ (আ) মিথ্যা অপবাদের শিকার হয়ে কারাবরণ করেন। অবশ্য আল্লাহ তাআলা তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য এভাবে তুলে ধরেন যে, এক পর্যায়ে আযীযে মিসরের পত্নী স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, ইউসুফ নির্দোষ ছিল এবং জেল থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁকে মিসরের খাদ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। আল কুরআনে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত আছে,

'যে মহিলার ঘরে সে ছিল, সে তাকে তার দিকে আকৃষ্ট করতে লাগল। একদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে বলল, 'এদিকে আসো'। ইউসুফ বললেন, 'আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আমার রব তো আমাকে খুবই সুন্দরভাবে রেখেছেন (আমি কি এ কাজ করতে পারি?) নিশ্চয়ই যালিমরা কখনো সফল হতে পারে না। সে তার দিকে এগিয়ে এল, ইউসুফও তার দিকে এগিয়ে যেতেন, যদি তিনি তাঁর রবের দলীল-প্রমাণ দেখতে না পেতেন। এমনটাই হলো, যাতে আমি তার নিকট থেকে মন্দ ও অশ্লীলতা দূর করে দেই। আসলে তিনি আমার বাছাই করা বান্দাহদের একজন ছিলেন। অবশেষে ইউসুফ ও সে আগে-পরে দরজার দিকে দৌড়ালো। সে ইউসুফের জামা পেছন থেকে (টেনে) ছিঁড়ে ফেলল এবং তারা দু'জনেই তার স্বামীকে দরজার সামনে দেখতে পেল। ঐ মহিলা বলে উঠলো, 'যে লোক তোমার নারীর প্রতি খারাপ নিয়ত রাখে তাকে জেলে দেওয়া বা অন্য কোন কঠোর সাজা ছাড়া আর কী শাস্তি দেওয়া যায়?' ইউসুফ বললেন, 'সেই আমাকে ফাঁসাতে চেষ্টা করেছিল।' ঐ মহিলার পরিবারেরই এক লোক সাক্ষ্য দিল যে, 'যদি ইউসুফের জামা সামনের দিক দিয়ে ছেঁড়া হয়ে থাকে তাহলে তো মহিলাই সত্যবাদী। কিন্তু যদি জামা পেছনের দিক দিয়ে ছেঁড়া হয়ে থাকে তাহলে মহিলা মিথ্যাবাদী এবং সে সত্যবাদী। 'যখন মহিলার স্বামী দেখল যে, ইউসুফের জামা পেছনের দিক দিয়ে ছেঁড়া, তখন সে বলল, 'এটা তোমাদের মহিলাদেরই চালাকি। নিশ্চয়ই তোমাদের চালাকি বড়ই সাংঘাতিক।' ইউসুফ! এ বিষয়টা ছেড়ে দাও। আর (হে মহিলা) তুমি তোমার অপরাধের জন্য মাফ চাও। আসলে তুমিই দোষী। শহরের মহিলারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল যে, 'আযীযের বিবি নিজের জোয়ান দাসের প্রেমে পড়েছে। ভালোবাসা তাকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে। আমরা তাকে স্পষ্ট ভুলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। সে যখন তাদের ধোঁকাবাজির কথা শুনতে পেল,

তখন সে তাদেরকে তার কাছে ডেকে আনল এবং তাদের জন্য হেলান দেওয়া আসনের ব্যবস্থা করল। খাওয়ার মজলিসে প্রত্যেকের সামনে একটা ছুরি রেখে দিল। (তারপর ঠিক যখন তারা ফল কেটে কেটে খাচ্ছিলো তখন) সে ইউসুফকে তাদের সামনে আসতে বলল। যখন মহিলারা তাকে দেখতে পেলো তখন তারা দেখে চমকিত হয়ে গেল এবং তারা সবাই তাদের হাত কেটে ফেলল। তারা বলে উঠলো, 'আল্লাহর কসম, এ লোকটি মানুষ নয়, এতো কোন সম্মানিত ফেরেশতা।' আযীযের বিবি বলল, 'দেখলে তো, এ-ই হলো ঐ লোক, যার সম্বন্ধে তোমরা আমাকে দোষারোপ করছিলে। অবশ্যই আমি তাকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছি। কিন্তু সে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। আমি তাকে যা করতে বলি যদি সে তা না করে তাহলে সে অবশ্যই জেলে যাবে এবং অপদস্থ হবে।' ইউসুফ বললেন, 'হে আমার রব! এরা আমাকে যে কাজ করাতে চায় এর চেয়ে আমি জেলে যাওয়া বেশি পছন্দ করি। যদি তুমি এদের ফন্দি আমার কাছ থেকে সরিয়ে না দাও তাহলে আমি তাদের ফাঁদে জড়িয়ে যাব এবং আমি জাহিলদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাব।' তাঁর রব তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং ঐ মহিলাদের ফন্দি তাঁর কাছ থেকে দূর করে দিলেন। অবশ্যই তিনি সবার কথা শুনেন এবং সব কিছু জানেন।' (সূরা ইউসুফ : ২৩-৩৪)

তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে উল্লেখ আছে যে, 'আমি জেলখানা পছন্দ করি' ইউসুফের এ উক্তি বন্দী জীবন প্রার্থনা বা কাম্য নয়; বরং পাপকাজের বিপরীতে এই পার্থিব বিপদকে সহজ মনে করার বহিঃপ্রকাশ। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, যখন ইউসুফ (আ) জেলে প্রেরিত হলেন, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী আসল, আপনি নিজেকে জেলে প্রেরণ করেছেন। কারণ আপনি বলেছিলেন, 'এর চাইতে আমি জেলখানাকে অধিক পছন্দ করি'। আপনি নিরাপত্তা চাইলে আপনাকে পুরোপুরি নিরাপত্তা দান করা হতো। এ থেকে বোঝা গেল যে, কোন বড় বিপদ থেকে বাঁচার জন্য দোয়ার চাইতে অমুক ছোট বিপদে পতিত করা আমি ভাল মনে করি বলা সমীচীন নয়; বরং প্রত্যেক বিপদাপদের সময় আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করা উচিত।

ইয়াহইয়া (আ)-এর হকের দাওয়াত ও তাঁর শিরশ্ছেদ

বনী ইসরাঈল ক্রমাগত কয়েক শতাব্দী ধরে পাপাচারে লিপ্ত ছিল। তারা পরপর কয়েকজন নবীকে হত্যা করে। এ জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে সত্যকে চূড়ান্তরূপে পেশ করার জন্য ইয়াহইয়া ও ঈসা (আ)-এর মত দুজন মহান নবী একই সাথে প্রেরণ করেন। ইয়াহইয়া বয়সে ঈসার চেয়ে ছয় মাসের বড় ছিলেন। উভয়ের মা পরস্পরের নিকটাত্মীয় ছিল। আল্লাহ তাআলা ত্রিশ বছর বয়সে ইয়াহইয়া (আ)-কে নবুওয়াতের দায়িত্ব দেন। তিনি পূর্ব জর্দানে আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। তিনি মানুষকে গোনাহ থেকে তাওবা করাতেন এবং

তাওবার পর গোসল করাতেন। যেন আত্মা ও দেহ পবিত্র থাকে। তিনি উটের লোমের কাপড় পরিধান করতেন। মানুষকে নামাযের উপদেশ দিতেন এবং ঈসা (আ)-এর রিসালাতের সত্যতা প্রমাণকারী ছিলেন। তাঁর যুগের ইহুদি শাসক হিরোদ এন্টিপাসের রাজ্যে তিনি হকের দাওয়াত দিতেন।

হিরোদ অত্যন্ত পাপাচারী ছিল। সে তার আপন ভাই ফিলিপের নারীকে আপন গৃহে এনে শয্যাসঙ্গিনী করে। এর কারণে ইয়াহইয়া তাকে ভর্ৎসনা করে। এ অপরাধে হিরোদ তাঁকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠায়। কিন্তু জনগণ এটাকে ভাল চোখে নেয়নি। এতে হিরোদ ইয়াহইয়ার উপর আরও ক্ষীপ্ত হয়ে তাঁর প্রাণনাশের চক্রান্ত করে। অবশেষে হিরোদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তার মেয়ের নাচে মুগ্ধ হয়ে সে মেয়েকে জিজ্ঞাস করল, 'তুমি কী উপঢৌকন চাও?' মেয়ে তার মার কাছে জানতে চায় সে কী উপঢৌকন চাইবে। মা বলল, 'ইয়াহইয়ার ছিন্ন মস্তক দাবি কর'। এরপর মেয়ে হিরোদকে বলল 'আমি এক্ষুনি ইয়াহইয়ার ছিন্ন মস্তক আমার সামনে একটি থালায় চাই'। সাথে সাথেই ইয়াহইয়া (আ)-এর ছিন্ন মস্তক একটা থালায় রেখে নর্কতী মেয়ের সামনে উপঢৌকন পেশ করা হয়'।

হযরত ঈসা (আ)-কে শূলিবিদ্ধ করার চেষ্টা

হযরত মারইয়াম (আ) বাইতুল মাকদাস মসজিদে ইতিকাফ করাকালে অবিবাহিত অবস্থায় গর্ভবতী হন। আর তাঁর গর্ভেই হযরত ঈসা জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মারইয়াম এ বিষয়ে খুব বেশি চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু শিশু বয়সে কথোপকথনের মাধ্যমে হযরত ঈসা মায়ের পবিত্রতার কথা তুলে ধরেন। নবুওয়াত লাভ করার পর হযরত ঈসা আল্লাহর একত্ববাদের দীক্ষা দেন। তিনি মানুষকে বস্তুবাদের পরিবর্তে আখিরাতের নাজাতের জন্য আমল করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি বলেন, 'দুনিয়াতে নিজের জন্য সম্পদ জমা করে রেখো না। যা কীটে খেয়ে ফেলে এবং জং ধরে নষ্ট হয়ে যায়। যার জন্য চোর ওঁত পেতে থাকে এবং চুরি করে নিয়ে যায়।' (সূরা আন'আম : ১৯-২০)

ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে ইহুদি আলেমরা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা একযোগ হয়ে রোমীয় শাসক পিলাটুসের নিকট মোকদ্দমা দায়ের করে। তাদের অভিযোগ ছিল, ঈসা জাতির মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। পিলাটুস ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃবৃন্দকে বলল, এ ব্যক্তির মধ্যে তো কোন দোষ দেখি না। তারপরও তারা চিৎকার করে দাবি জানাতে থাকে, 'তাকে শূলে চড়ানো হোক'। এ ধরনের কঠিন মুহূর্তে ঈসা (আ) বললেন, مَنْ أَنْصَارِىْ إِلَى اللّٰهِ খোদার পথে আমার সাহায্যকারী কে?' এ প্রশ্নের জবাবে হাওয়ারিগণ বলেছিলেন, 'আমরা আল্লাহর কাজে সাহায্যকারী'।

উল্লেখ্য যে, খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস ঈসা আল্লাহর পুত্র এবং তাঁকে শূলেবিদ্ধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, ঈসা আল্লাহর পুত্র নয়; বরং তাঁর প্রেরিত রাসূল এবং তিনি শূলিবিদ্ধ হনন নি বরং তাঁকে আল্লাহ তাআলা আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন; তাঁর আকৃতির অন্য একজনকে শূলিবিদ্ধ করা হয়। কুরআনে এ বিষয়টি এভাবে বিধৃত আছে, '(তা আল্লাহর গোপন তদবিরই ছিল) যখন তিনি বললেন, হে ঈসা! এখন আমি আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো এবং আপনাকে আমার দিকে উঠিয়ে নেব। আর যারা আপনাকে অস্বীকার করেছে তাদের কাছ থেকে (অর্থাৎ তাদের সঙ্গ ও তাদের অপবিত্র পরিবেশ থেকে) আপনাকে পাক করে দেব এবং আপনার অনুসারীদেরকে আপনাকে অস্বীকারকারীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী করে রাখব। এরপর তোমাদের সবাইকে আমার কাছে আসতে হবে। তখন আমি ঐ সব বিষয়ের ফায়সালা করব, যা নিয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।' (সূরা আলে ইমরান : ৫৫)

আসহাবুল উখদূদের ঘটনা: আগুনে নিক্ষেপ করে হত্যা

আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের পরীক্ষার অনেক উদাহরণ উল্লেখ আছে। সূরা বুরূজে ঈমানের পরীক্ষার কারণ ও যুলুম-নির্যাতনের পরিণামের কথা এভাবে বর্ণনা করেন,

'কসম মযবুত দুর্গবিশিষ্ট আসমানের, কসম ঐদিনের, যার ওয়াদা করা হয়েছে। কসম যারা দেখছে তাদের আর যা দেখা যাচ্ছে তার। গর্তের মালিকরা ধ্বংস হয়েছে, (যে গর্তে) দাউ দাউ করে জ্বলা জ্বালানির আগুন ছিল। যখন ওরা ঐ গর্তের কিনারে বসা ছিল, আর ওরা ঈমানদারদের সাথে যা কিছু করছিল, তা দেখছিল। ঐ ঈমানদারদের সাথে ওদের দুশমনীর এ ছাড়া আর কোন কারণ ছিল না যে, তারা এমন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল, যিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং আপন সত্তায় স্বপ্রশংসিত। যিনি আসমান ও জমিনের রাজত্বের মালিক এবং ঐ আল্লাহ্ সব কিছুই দেখছেন। যারা ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের উপর যুলুম করেছে, এরপর এ জন্যে তাওবা করেনি, তাদের জন্য দোযখের আযাব রয়েছে, আর রয়েছে আগুনে জ্বলবার শাস্তি। যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে বেহেশতের বাগান, যার নিচ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে– এটা বিরাট সফলতা। নিশ্চয়ই তোমার রবের পাকড়াও বড় শক্ত। তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং আবারও সৃষ্টি করবেন। আর তিনি অতি ক্ষমাশীল ও স্নেহশীল, আরশের মালিক ও মহান। তিনি যা চান, তাই করে ছাড়েন। তোমাদের কাছে কি ফেরাউন ও ছামূদ জাতির সৈন্যদের খবর পৌঁছেছে? কিন্তু যারা কুফরী করেছে, ওরা তো মিথ্যা বলেই চলছে। অথচ আল্লাহ্ তাদের ঘেরাও করেই আছেন। (তাদের

মিথ্যাচারে এ কুরআনের কোন ক্ষতি নেই।) বরং এ কুরআন মহত্ত্বের অধিকারী, যা সুরক্ষিত ফলকে (খোদাই করা) আছে।' (সূরা বুরূয)

এ সূরাতে আল্লাহ তাআলা আসহাবুল উখদূদ তথা গর্তওয়ালা বলতে কী বুঝিয়েছেন সে সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীরে কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে। তাফহীমুল কুরআনে বলা হয়েছে, যারা বড় বড় গর্তের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে ঈমানদারদেরকে তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল এবং তাদের জ্বলেপুড়ে মারার বীভৎস দৃশ্য নিজেদের চোখে দেখেছিল তাদেরকে গর্তওয়ালা বলা হয়েছে। আর এ ধরনের ব্যক্তিরা আল্লাহর আযাবের অধিকারী হয়েছে। গর্তে আগুন জ্বালিয়ে ঈমানদারদেরকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করার একাধিক ঘটনা হাদীসে বর্ণিত আছে। এ ধরনের জুলম ও নিপীড়নমূলক ঘটনা দুনিয়ায় কয়েকবার ঘটেছে।

প্রথম ঘটনা: সুহাইব রুমী আল্লাহর রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন। এক বাদশাহর কাছে একজন জাদুকর ছিল। বৃদ্ধ বয়সে সে বাদশাহকে বলল, একটি ছেলেকে আমার কাছে নিযুক্ত কর, সে আমার কাছ থেকে এ জাদু শিখে নিবে। বাদশাহ জাদু শেখার জন্য জাদুকরের কাছে একটি ছেলেকে নিযুক্ত করল। কিন্তু সেই ছেলেটি জাদুকরের কাছে আসা-যাওয়ার পথে একজন রাহেবের সাক্ষাৎ পেল। তাঁর কথায় প্রভাবিত হয়ে সে ঈমান আনল। এমনকি তাঁর শিক্ষার গুণে সে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে গেল। সে অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে এবং কুষ্ঠরোগ নিরাময় করতে লাগল। ছেলেটি তাওহীদের প্রতি ঈমান এনেছে একথা জানতে পেরে বাদশাহ প্রথমে রাহেবকে হত্যা করল। তারপর ছেলেটিকে হত্যা করতে চাইল। কিন্তু কোন অস্ত্র দিয়েই এবং কোনভাবে তাকে হত্যা করতে পারল না। শেষে ছেলেটি বলল, যদি আমাকে হত্যা করতে চাও তাহলে প্রকাশ্য জনসমাবেশে বিসমি রাব্বিল গোলাম, অর্থাৎ 'এই ছেলেটির রবের নামে' বাক্য উচ্চারণ করে আমাকে তীর মার। তাতেই আমি মরে যাব। বাদশাহ তাই করল। ফলে ছেলেটি মারা গেল। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে লোকেরা চিৎকার দিয়ে বলে উঠল আমরা এই ছেলেটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম। বাদশাহর সভাসদরা তাকে বলল, এখনতো তা হয়ে গেল, যা থেকে আপনি বাঁচতে চেয়েছেন। লোকেরা আপনার ধর্ম ত্যাগ করে এ ছেলেটির ধর্ম গ্রহণ করেছে। এ অবস্থা দেখে বাদশাহ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলো। সে রাস্তার পাশে গর্ত খনন করল। তাতে আগুন জ্বালাল। যারা ঈমান ত্যাগ করতে রাজি হলো না তাদের সবাইকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করল। (মুসলিম, নাসায়ী)

দ্বিতীয় ঘটনা: আলী (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইরানের এক বাদশাহ শরাব পান করে নিজের বোনের সাথে ব্যভিচার করে এবং উভয়ের মধ্যে অবৈধ

সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কথাটি প্রকাশ হয়ে গেলে বাদশাহ্ জনসম্মুখে ঘোষণা করে দেয় যে, আল্লাহ বোনের সাথে বিয়ে হালাল করে দিয়েছেন। লোকেরা তার এ কথা মানতে প্রস্তুত হয়নি। ফলে সে নানা ধরনের শাস্তি দিয়ে লোকদের তার কথা মানতে বাধ্য করতে থাকে। এমনকি সে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে যে ব্যক্তি তার এ কথা মানতে প্রস্তুত হয়নি তাকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকে। আলী (রা) বলেন, সে সময় থেকে অগ্নি-উপাসকদের মাঝে রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়কে বিয়ে করার পদ্ধতি প্রচলিত হয়।

তৃতীয় ঘটনা: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) সম্ভবত ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, বেবিলনের অধিবাসীরা বনী ইসরাঈলকে মূসা আলাইহিস সালামের দীন থেকে বিচ্যুত করতে বাধ্য করেছিল। এমনকি যারা তাদের কথা মানতে প্রস্তুত হয়নি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনে ভরা গর্তে নিক্ষেপ করত।

চতুর্থ ঘটনা: ইবনে হিশাম, ইবনে খালদুন প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। এর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে, ইয়েমেনের বাদশাহ তুবান আসায়াদ ইহুদিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে এবং বনূ কুরাইযার দুইজন ইহুদি আলেমকে সঙ্গে করে ইয়েমেনে নিয়ে যায়। সেখানে সে ব্যাপকভাবে ইহুদি ধর্মের প্রচার চালায়। তারপর তার ছেলে যুনুওয়াস তার স্থলাভিষিক্ত হয়। সে দক্ষিণ আরবে ঈসায়ীদের কেন্দ্রস্থল নাজরান আক্রমণ করে। সেখান থেকে ঈসায়ী ধর্মকে উৎখাত করা এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে জোরপূর্বক ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত করা ছিল তার লক্ষ। নাজরানে পৌছে সে লোকদের ইহুদি ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানায়। লোকেরা অস্বীকার করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সে বিপুলসংখ্যক লোককে দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের কুয়ায় নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেয় এবং অনেককে হত্যা করে। এভাবে মোট বিশ হাজার লোক নিহত হয়।

আল্লাহ তাআলা সূরা বুরূজের সর্বশেষ অংশে ফেরাউনের কথা উল্লেখ করে এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন, ফেরাউন যেমনিভাবে দুনিয়াতেও শাস্তিভোগ করেছে তেমনিভাবে বিভিন্ন যুগে যালিমদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে দুনিয়াতেও শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু যালিমরা যদি তাওবা না করে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আখিরাতে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। আর যেসব ঈমানদার বান্দারা যুলুম-নির্যাতন সহ্য করে দীনের উপর অটল ও অবিচল থাকে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আখিরাতে মহাপুরস্কার দান করবেন।

সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স) অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছেন

বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত, সাইয়েদুল মুরসালীন মুহাম্মদ (স) নানা ধরনের নির্যাতন ও নিপীড়নের সম্মুখীন হয়েছেন। তদানীন্তন মানুষগুলো আল্লাহর রাসূলকে নবুওয়াত পূর্ববর্তী সময়ে আল আমীন, আস সাদেক উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কিন্তু কালিমা 'লা ইলাহা ইলাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর প্রতি দাওয়াত দেওয়ার পরপরই তারা নানা অপপ্রচার, বাধা, সামাজিক বয়কট, হত্যা ষড়যন্ত্র ও নির্যাতন শুরু করে। আল্লাহর রাসূলের সীরাত অধ্যয়ন করলে জানা যায়, তিনি শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করেই দীনের উপর অটল ও অবিচল ছিলেন। তিনি নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হন। নিম্নে কয়েকটি চিত্র পেশ করা হলো নির্যাতনের।

গণক ও পাগল হিসেবে আখ্যায়িত করা

আল্লাহ তাআলার প্রিয় বন্ধুকে মক্কার কাফিররা গণক ও পাগল হিসেবে আখ্যায়িত করে। তাদের ভাষায় মহাগ্রন্থ আল কুরআন হচ্ছে গণকের বচন। তাদের এ ধরনের কথার প্রতিবাদ করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۝ وَلَا بِقَوْلِ
كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ
الْأَقَاوِيلِ ۝ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝ فَمَا مِنكُم مِّنْ
أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۝ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝

'নিশ্চয়ই এ (কুরআন) রাসূলে কারীমের (কাছে পাঠানো) বাণী, কোন কবির রচনা নয়। কিন্তু তোমরা কমই ঈমান এনে থাক। এটা কোন জাদুকরের কথাও নয়। তোমরা কমই খেয়াল কর। এটা সারা বিশ্বের রবের তরফ থেকে নাযিলকৃত। এ (রাসূল) যদি নিজের কথা আমার নামে চালিয়ে দিত। তাহলে আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। তারপর নিশ্চয়ই তার শাহরগ কেটে দিতাম। তখন তোমাদের কেউ (আমাকে) তা থেকে ফেরাতে পারতে না। আসলে এ (কুরআন) মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।' (সূরা হা-ক্কাহ : ৪০-৪৮)

আবূ লাহাবের স্ত্রীর পক্ষ থেকে নির্যাতন

আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী দু'জনেই ছিল ইসলামের চরম বিরোধী। উভয়ে মিলে আল্লাহর রাসূলকে অবর্ণনীয় কষ্ট দিয়েছিল। আল্লাহর রাসূলের পথে কাঁটা বিছিয়ে

দিত। নামাজরত অবস্থায় গলায় উটের নাড়িভুড়ি পেঁচিয়ে দিত। তারা উভয়েই তাদের দু'ছেলে উতবা এবং আবুল আস আল্লাহর রাসূলের দু'মেয়ে যথাক্রমে উম্মে কুলসুম ও যয়নাবকে তালাক দিতে প্ররোচিত করে। আবূ লাহাব মক্কার সমাজপতি হওয়া সত্ত্বেও তার স্ত্রীর চাপে হাজীদের পরিচর্যার জন্য সংগৃহীত অর্থ আত্মসাৎ করে। তার স্ত্রী সব সময় সুন্দর সুন্দর বিলাসবহুল কাপড়-চোপড় পরিধান করত। সে ছিল আধুনিকা। আবূ লাহাব মানুষের অর্থ খিয়ানত করে তার জন্য স্বর্ণালংকার বানিয়ে দিত। কিয়ামতের দিন তাই সে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে। আর তার স্ত্রীও, যে গলায় রশি পেঁচিয়ে জঙ্গল থেকে কাঁটাযুক্ত লাকড়ি সংগ্রহ করে রাসূল (স)-কে কষ্ট দেওয়ার জন্য তাঁর চলার পথে বিছিয়ে দিত, সেও জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। বস্তুত তার মরণ হয়েছিল খুবই করুণভাবে। যে পাকানো রশি দ্বারা সে জ্বালানি কাঠ বেঁধে আনতো তার গলায় ঐ রশির ফাঁস লেগে তার মৃত্যু হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, আবূ লাহাব ধ্বংস হোক। আর তার সব ক্ষমতা-প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হোক। সে নিজে ধ্বংস হল। না তার ধন-সম্পদ তাকে রক্ষা করতে পারল, না তার হারাম-হালাল উপার্জন। সে শীঘ্রই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করবে। তার স্ত্রীও তারই সঙ্গে, যার কাজ ছিল কেবল ইন্ধন যোগানো- তার গলদেশে ঝুলতে থাকবে মোটা পাকানো রশি।' (সূরা লাহাব)

কাবাঘরে আল্লাহর রাসূলের গলায় ফাঁস লাগানো

একবার আল্লাহর রাসূল (স) তাওয়াফ করার জন্য কাবাঘরে এলেন। সেই সময় কতিপয় কুরাইশ নেতা কাবাঘরের ভিতর বসা ছিলেন। তাঁরা আল্লাহর রাসূলকে তাওয়াফ করতে দেখে তাঁর কাছে গিয়ে বলল, হে মুহাম্মদ তুমি নাকি মূর্তি, দেবতাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তারা তাঁর গলায় ফাঁস লাগিয়ে এভাবে টান মারল যে, তিনি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার অবস্থা সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় আবূ বকর (রা) এসে আল্লাহর রাসূলকে মুক্ত করলেন এবং বললেন, একজন মানুষ প্রতিপালক হিসেবে একমাত্র আল্লাহকে গ্রহণ করার অপরাধে তোমরা তাঁকে মেরে ফেলবে? এভাবে দীনের পথে বাধা পেয়েও আল্লাহর রাসূল ভড়কে যাননি। তিনি দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ অব্যাহত রাখেন। আরেকদিন সাফা পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে রাসূল (স) ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন। সে সময় আবূ জেহেল ও তার সঙ্গীরা আল্লাহর রাসূলের গায়ে আবর্জনা নিক্ষেপ করা শুরু করে। এরপরও তিনি দাওয়াত দান বন্ধ করেননি। এতে আবূ জেহেল ক্ষিপ্ত হয়ে আল্লাহর রাসূলকে শারীরিকভাবে আঘাত করেন। আল্লাহর রাসূল ভবিষ্যৎ কল্যাণের কথা চিন্তা করে আক্রমণ প্রতিহত না করে নীরবে সহ্য করেন।

কাবাঘরে নামায পড়ার সময় আবূ জেহেল কর্তৃক পাথর নিক্ষেপের চেষ্টা

আবূ জেহেল একবার প্রতিজ্ঞা করল যে, রাসূল (স) যখন কাবা ঘরে নামায আদায় করতে যাবেন তখন সে তার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে একটি পাথর উঠিয়ে আল্লাহর রাসূলের মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে তাঁকে হত্যা করবে। কুরাইশ কাফেররা তাকে সাহস যোগাল। পরিকল্পনা অনুসারে আবূ জেহেল বিরাট এক পাথরখন্ড নিয়ে কাবাঘরে বসে রইল। তার অনুসারী কুরাইশরা জমায়েত হলো এবং অপেক্ষা করতে লাগল যে, আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করার পরবর্তী ঘটনা কী হয় তা দেখার জন্য। আল্লাহর রাসূলকে তাদের পরিকল্পনার কথা জানানো হয়। কিন্তু তিনি সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কাবাঘরে এসে নামায আদায় করতে দাঁড়িয়ে গেলেন। আবূ জেহেল পাথর খন্ড নিয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে আসার পর ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। আবূ জেহেলের এ অবস্থা দেখে তার অনুসারীরা তার কাছে এলে সে বলল, 'আমি মুহাম্মদের প্রতি অগ্রসর হতেই দেখি একটি বিশাল উট আমার ও মুহাম্মদের মাঝখানে এসে ভয়ংকর দাঁত বের করে আমাকে খেতে এগিয়ে এল। আমি আর কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করলে তোমরা আমাকে জীবিত পেতে না। এ ঘটনার পর কাফের কুরাইশদের মনোবল অনেক ভেঙে যায়।

সামাজিক বয়কট

দারুন নদওয়াতে বসে মুশরিক সরদারগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, বনূ হাশিমের সহযোগিতার কারণে মুহাম্মদকে মুকাবেলা করা যাচ্ছে না। তাই তারা বনূ হাশিমকে সামাজিকভাবে বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। বিভিন্ন গোত্রের সরদারগণ এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হন যে, কেউ বনূ হাশিমের সাথে মেলামেশা করবে না। তাদের সাথে কোন কিছু বেচাকেনা করবে না। কেউ তাদেরকে খাদ্যদ্রব্য দেবে না এবং তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না। বনূ হাশিম মুহাম্মদকে তাদের হাতে সোপর্দ করার আগ পর্যন্ত এ বয়কট চলবে। চুক্তিটা কাবাঘরে লটকিয়ে রাখা হয়। বনূ হাশিম গোত্রের প্রধান ছিলেন আবূ তালিব। তিনিসহ অন্যান্য সরদারগণ মুসলমান ছিলেন না। তবে তারা পরম সহিষ্ণু ছিলেন এবং মুহাম্মদের মতো একজন চরিত্রবান মানুষকে হত্যা করা তাদের দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ ছিল। তাই তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে সহযোগিতা করত।

বনূ হাশিম দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়াবার উদ্দেশ্যে বনূ হাশিমকে শি'আবে আবী তালিবে এসে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেয়। বনূ হাশিমের উপর বয়কট কার্যকর হয়। এভাবে সপ্তাহের পর মাস এবং মাস পেরিয়ে বছর গড়িয়ে যায়। তাদের কাছে যা কিছু

খাদ্যদ্রব্য মওজুদ ছিল তা নিঃশেষ হয়ে যায়। ক্ষুধার তাড়নায় তারা গাছের পাতা খেতে শুরু করে। পাতাও শেষ হয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যে। তারা গাছের ছাল খেতে শুরু করে। এক সময় তাও শেষ হয়ে যায়। তাদের তাঁবুগুলো ছিল উটের চামড়ার তৈরি। তাবুর অংশবিশেষ কেটে চিবিয়ে চিবিয়ে তারা ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রয়াস চালায়। কিছুলোক মৃত্যুবরণ করে। অনেকেই রোগাক্রান্ত হয়। এভাবে তিন বছর কেটে যায়। এরপর জুহাইর ইবন আবূ উমাইয়াসহ পাঁচজন যুবকের সাহসী সিদ্ধান্তে উক্ত বয়কটের অবসান ঘটে। জুহাইর উক্ত পাঁচ যুবকসহ কাবার একস্থানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে, হে মক্কাবাসীগণ, আমরা খাব পরব আর বনূ হাশিম অবরুদ্ধ অবস্থায় থেকে ধুকে ধুকে মরবে, কেউ তাদের সাথে লেনদেন করবে না– এটা কি করে চলতে পারে? আল্লাহর কসম! যুলুমের প্ররোচনাদানকারী ও সম্পর্ক বিনষ্টকারী চুক্তিনামা ছিঁড়ে না ফেলা পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না।' তারা কাবাঘরে লটকানো চুক্তিনামা নামিয়ে ফেলে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, উক্ত চুক্তিপত্রের শুরুতে লিখিত 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' শব্দ ছাড়া আর সকল কথা উই পোকা খেয়ে ফেলে। যুবকদল এরপর শি'আবে আবী তালিবে গিয়ে বনূ হাশিম এবং মুহাম্মদ (সা)-কে মুক্ত করে আনে। এ ঘটনায় মক্কার মুশরিক সরদারগণ ভড়কে যায়।

তায়েফে পাথর বৃষ্টি বর্ষণ : রক্তে রঞ্জিত হয় দেহ

নবুওয়াতের নবম বছর আল্লাহর রাসূল (স) ইসলাম প্রচারের জন্য তায়েফ যান। আর্থিক সংকটের কারণে কোন বাহন নিতে পারেননি। পায়ে হেঁটেই তায়েফ গমন করেন। তায়েফের সরদারদের কাছে ইসলাম কবুলের আহ্বান জানালে তারা হেয়প্রতিপন্ন করে বলে, আল্লাহ বুঝি রাসূল বানাবার জন্য তোমাকে ছাড়া আর কোন লোক পেলেন না। কেউ কেউ কথা বলতেও রাজি হলেন না। তায়েফে মহানবীর দাওয়াতী তৎপরতা সহ্য করতে পারেনি তায়েফ সরদারগণ। তারা তাঁর পেছনে লেলিয়ে দেয় একদল গুণ্ডা প্রকৃতির লোকজনকে। এ লোকগুলো তাঁকে লক্ষ্য করে পাথরখণ্ড নিক্ষেপ করতে থাকে। তাঁর শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়। আহতস্থান থেকে রক্ত গড়িয়ে পায়ের দিকে পড়তে থাকে। তাঁর পায়ের স্যান্ডেলে গিয়ে জমেছিল বেশ কিছু রক্ত। সর্বাঙ্গ তার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠে। তিনি কয়েকবার রাস্তায় পড়ে যান। মক্কায় ফেরার পথে জিবরাইল এবং পর্বতের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা তাঁর সাথে দেখা করে আরজ করল, আপনি নির্দেশ দিলে দুই দিকের পাহাড়গুলো এই লোকদের ওপর ফেলে দিয়ে তাদেরকে নিস্পেষিত করে দেব। মহানবী (স) বললেন, না; আমি তো বরং এ আশা করি যে, আল্লাহ

এদের বংশে এমন সব লোক সৃষ্টি করবেন, যারা 'এক লা শারীক আল্লাহ'র ইবাদত করবে। মহানবী (স) মক্কার কাছাকাছি আসার পর সংবাদ পান যে, মক্কার সরদারগণ তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। তিনি এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে আখনাস ইবন শুরাইকের সহযোগিতা চাইলেন। আখনাস রাজি হলো না। অতঃপর তিনি সুহাইল ইবন আমরের সহযোগিতা চাইলেন। সেই ব্যক্তিও রাজি হলো না। তারপর তিনি মুতয়িম ইবন আদির সহযোগিতায় মক্কায় প্রবেশ করেন। মহানবী (স) কাবাঘর তাওয়াফ করে আপন ঘরে ফিরে যান।

হিজরত: প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করতে হয়

নবুওয়াতের দশম বছর মুশরিকদের একটি সভা বসল। উক্ত সভায় একজন মুহাম্মদ (স)-কে বন্দী করার প্রস্তাব করেন। আরেকজন তাঁকে নির্বাসনে দেওয়ার কথা বলেন। সর্বশেষ আবূ জেহেল তাঁকে হত্যা করার প্রস্তাব করে এবং আলোচনাক্রমে তাই সিদ্ধান্ত হয়। এমনি অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ আসে। কিন্তু তাঁর কাছে অনেকের গচ্ছিত মাল ছিল তা মালিকদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আলী (রা)-কে তাঁর বিছানায় রেখে আল্লাহর রাসূল (স) فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ আয়াতটি পাঠ করে মুশরিকদের সামনে দিয়েই যান। আল্লাহর ইচ্ছায় ঘাতক মুশরিকদের তন্দ্রাভাব ছিল। তারা কেউ তাঁকে দেখেনি। রাসূল (স) আবূ বকরকে সাথে নিয়ে মদীনার পথে রওয়ানা করেন।

আল্লাহর রাসূলের বিরোধিতা করে কবিতা রচনা

আব্দুল্লাহ ইবন খাতাল দু'জন বাঁদীকে আল্লাহর রাসূল (স) ও তাঁর সাহাবাদের গালাগাল সম্বলিত কবিতা মুখস্থ করায়। তারা এ কবিতা গান আকারে বাদ্যযন্ত্রসহকারে গাইত।

ওহুদে দাঁত শহীদ হয়

আল্লাহর রাসূল (স) ওহুদের ময়দানে কাফেরদের আক্রমণের শিকার হন। ওহুদে আক্রমণের সময় আবূ তালহাসহ কতিপয় সাহাবী আল্লাহর রাসূলের প্রতি নিক্ষিপ্ত বর্শা থেকে তাঁকে রক্ষার জন্য জীবন বাজি রেখে নিজেদেরকে ঢালের মতো রাখেন। সেই কঠিন সময়ে কাফিরদের আঘাতে আল্লাহর রাসূলের দাঁত মোবারক শহীদ হয়।

সাহাবীগণের উপর নির্যাতন

রাসূলে কারীম (স)-এর সাহাবাগণ নানা ধরনের যুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হন। বেলাল (রা)-এর উপর কী অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছিল! প্রচণ্ড গরম বালুর উপর শুইয়ে দিয়ে বুকে পাথরচাপা দেওয়া হয়েছিল। তবুও তিনি আহাদ আহাদ বন্ধ করেননি। আবূ যার (রা)-কে ঈমান আনার কারণেই রক্তাক্ত হতে হয়েছে। সুদর্শন যুবক মাসয়াব বিন উমাইরকে দীনের দাওয়াত কবুল করার পর ত্যাগ করতে হয়েছে সকল সহায়-সম্পদ। বিলাস বহুল জীবন যাপনের পরিবর্তে কষ্টকর জীবন যাপন করতে হয়েছে। আমের বিন ফাহিরার শরীর কাঁটা দিয়ে বিদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের নির্যাতনে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। অবশ্য আল্লাহর কুদরতে পরে আবার দৃষ্টি ফিরে পান। খাব্বাব (রা)-কে জ্বলন্ত অঙ্গারে শুইয়ে রাখা হতো। ফলে তাঁর গায়ের চর্বিতে আগুন নিভে যেত। আমের (রা)-কে পানিতে ডুবিয়ে নির্যাতন করা হয়। তাঁর মা সুমাইয়ার লজ্জাস্থানে বর্শা নিক্ষেপ করে শহীদ করা হয়। তাঁর পিতা ইয়াসীর ও ভাই আব্দুল্লাহ নির্যাতনের শিকার হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। হযরত যায়েদ বিন দাসানাকে বলা হয়, 'তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদকে শূলে চড়ালে তুমি কি সহ্য করবে?' তিনি জবাব দেন 'তাঁকে শূলে চড়ানোতো দূরের কথা তাঁর পায়ে কাঁটার আঘাতও সহ্য করব না।' এ কথা শোনার পর তাঁর উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন করা হয়। ফলে তিনি শহীদ হয়ে যান। হামজার (রা) কলিজা চিবিয়ে খাওয়া হয়েছে। এভাবে অসংখ্য সাহাবীকে অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করে দীনের পথে চলতে হয়েছে।

মুসলমানরা কখনও ইসলামবিরোধীদের আক্রমণে ভয় পায়নি; ভড়কে যায়নি। তাদের ঐক্যবদ্ধ হামলাও সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করেছে। তাই ওহুদ যুদ্ধের পর আহত অবস্থায়ও জিহাদের ময়দানে ছুটে গিয়েছেন। আহতরা একে অপরের কাঁধে ভর করে জিহাদের ময়দানে যাওয়ার বিবরণ কুরআন এভাবে দিয়েছে, 'আহত হবার পরও যারা আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ, নেককার ও মুত্তাকী তাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান। আর যাদেরকে লোকেরা বলল, তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাসমাবেশ ঘটেছে। তাদেরকে ভয় করো, তা শুনে তাদের ঈমান আরও বেড়ে গেছে এবং তারা জবাবে বলেছে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি সবচেয়ে ভাল কার্যোদ্ধারকারী। (সূরা আলে ইমরান : ১৭২-১৭৩)

খাব্বাব ইবন আরত (রা) সে অবস্থার বিবরণ দিয়ে একটি হাদীস বলেন যে, রাসূলে কারীম (স) একবার কাবাঘরের ছায়ায় বসে আছেন, সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করেন না।

একথা শুনে তাঁর চেহারা রক্তিমবর্ণ হয়ে গেল এবং বললেন, তোমাদের পূর্বে যেসব মুমিনগণ অতিক্রম হয়েছে, তারা এর চেয়েও বেশি নিগৃহীত হয়েছে। তাদের কাউকে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে বসিয়ে দেয়া হতো। তারপর মাথার উপর করাত চালিয়ে দ্বিখণ্ড করা হতো। কারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লোহার চিরুনি দ্বারা মাংস চেছে ফেলা হতো যাতে তারা ঈমান প্রত্যাহার করে।

খুবাইব (রা) বর্ণিত ঘটনা সত্যপথে নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ

খুবাইব (রা)-এর হস্তদ্বয় পিছমোড়া করে বেঁধে মক্কার নারী-পুরুষেরা তাঁকে ধাক্কা দিতে দিতে ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে যায়। জনতা করতালি দিয়ে এ হত্যাকাণ্ডকে যেন উৎসবে পরিণত করে। কিন্তু তাদের নির্মমনির্যাতনে তিনি ব্যাকুল হননি। ফাঁসির মঞ্চে বসার আগে তিনি বললেন,

ان شئتم ان تتركوني اركع ركعتين قبل مصرعي فافعا لوا

'তোমরা আমাকে দু রাকাত নামায আদায় করার সুযোগ দাও এবং অতঃপর হত্যা কর।' তারা নামায আদায়ের সুযোগ দিল। খাব্বাব খুব স্বল্প সময়ে নামায আদায় করলেন। অতঃপর বললেন,

والله لولا ان تظنوا اني اطلت الصلاة جزعا من تالمو لا استكثرت الصلاة

'আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি এ ধারণা না করতে যে, আমি মৃত্যুভয়ে নামায দীর্ঘ করছি তাহলে আমি আরও বেশি নামায আদায় করতাম। নামায আদায়ের পর তারা জীবিত অবস্থায় তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো একের পর এক বিচ্ছিন্ন করতে থাকে আর বলে, 'তুমি কি চাও, তোমাকে ছেড়ে দিয়ে তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদকে হত্যা করি?'

রাসূলপ্রেমিক খুবাইব এই করুণ অবস্থায় উত্তর দিলেন, 'আল্লাহর শপথ আমি মুক্তি পেয়ে আমার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যাব আর রাসূল (স)-এর গায়ে কাঁটার আচড় লাগবে, তা হতে পারে না।' সাথে সাথে তারা চিৎকার করে বলে উঠল 'তাকে হত্যা কর, তাকে হত্যা কর।' সাথে সাথে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলন্ত খুবাইব (রা)-এর উপর হিংস্র হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল কাফিররা। তীর বর্ষা আর খঞ্জরের আঘাতে আঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতের মুহূর্তে কালেমা শাহাদাত পড়ছিলেন আর বলছিলেন 'হে আল্লাহ এদের শক্তি ও প্রতিপত্তি ধ্বংস কর এবং কাউকে ক্ষমা করো না।' খুবাইব (রা)-এর মৃত্যুর এ দৃশ্য দেখে আর তাঁর বদদোয়া শুনে ভয়ে অস্থির হয়ে সাঈদ বিন আমের আল জুমাহী (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইয়াসীর, সুমাইয়া ও আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা)-এর শাহাদাত

আম্মার ইবন ইয়াসীর (রা) উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা ইয়াসির ইবন আমির এবং মাতা সুমাইয়া বিনতে খিয়াত। আম্মার আল্লাহর রাসূলের নবুওয়াতের প্রথম তিন বছরের কোন এক সময়ে ইসলাম কবুল করেন। মুশরিকরা আম্মার, তার পিতা ইয়াসীর ও মাতা সুমাইয়া এবং ভাই আব্দুল্লাহর উপর লোমহর্ষক নির্যাতন চালায়। ইয়াসীর ও হযরত সুমাইয়া বৃদ্ধ ও দুর্বল ছিলেন। কিন্তু মুশরিকদের শত নির্যাতন সত্ত্বেও হকের উপর থেকে সামান্যতম বিচ্যুত হননি। তাঁদেরকে লৌহবর্ম পরিয়ে উত্তপ্ত বালুতে শুইয়ে দেওয়া এবং তাঁদের শরীরের পেছনে আগুন দিয়ে দাগ দেওয়া কাফিরদের নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। উম্মে হানী (রা) বর্ণনা করেন যে, একদিন ইয়াসীর পরিবারের চার সদস্যের উপর কঠিন নির্যাতনকালে আল্লাহর রাসূল (স) সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের উপর নির্যাতন প্রত্যক্ষ করে তিনি ব্যথিত চিত্তে বললেন, ধৈর্য ধর হে ইয়াসীরের বংশধর! তোমাদের জন্য বেহেশতের ওয়াদা রয়েছে। বৃদ্ধ ইয়াসীর এভাবে নির্যাতন সইতে সইতে শহীদ হলেন। সুমাইয়ার লজ্জাস্থানে একদিন আবূ জেহেল বর্শা নিক্ষেপ করলে আঘাতের ব্যথায় তিনি শহীদ হন। ন্যায় ও সত্যের জন্য আল্লাহর রাসূলের সাহাবীদের মধ্যে তাঁরাই ছিলেন প্রথম শহীদ। আম্মার মায়ের উপর নির্যাতনের করুণ অবস্থা দেখে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর রাসূলের কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের যুলুম তো চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে।' হুযুর (স) সে অবস্থায় তাঁকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! ইয়াসীর পরিবারকে দোযখের আগুন থেকে নাজাত দাও। পিতামাতার শাহাদাতের পর আম্মারের উপর নির্যাতন আরও বেড়ে যায়। একবার এক ব্যক্তি আম্মারের গায়ের কাপড় খোলার পর দেখেন যে, সারা শরীরে শুধু দাগ আর দাগ। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, এ কি? তিনি জবাবে বললেন, মক্কার উত্তপ্ত বালির উপর আমাকে যে শাস্তি দেয়া হতো এটা তারই নিদর্শন।

আম্মার নানা ধরনের নির্যাতন ভোগ করেন। একবার মুশরিকরা তাঁকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উপর শুইয়ে দেয়। সে সময় রাসূলে কারীম (স) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আম্মারের মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করলেন, হে আগুন! তুমি আম্মারের উপর এমন শীতল হয়ে যাও; যেমন তুমি ইবরাহীমের উপর হয়েছে। আরেকবার মুশরিকরা তাঁকে পানিতে ডুবিয়ে রাখলেন। ফলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে এলে যালিমরা তাঁর মুখ দিয়ে আল্লাহর রাসূল (স) সম্পর্কে অশোভন উক্তি এবং মূর্তিপূজার প্রশংসাসূচক কথা বলিয়ে নেয়। তাদের কাছ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। রাসূলে কারীম (স) জিজ্ঞাসা করেন, তোমার অন্তরের অবস্থা কী?

তিনি জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর ফজলে আমার অন্তর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানে অবিচল রয়েছে। এ কথা শোনার পর রাসূলে কারীম (স) তাঁর হাত দিয়ে স্নেহের সাথে আম্মারের চোখের পানি মুছে দেন এবং বলেন, তুমি ভয় করো না। ভবিষ্যতেও যদি তারা তোমার উপর নির্যাতন চালায় এবং একই ধরনের দাবি করে তাহলে জীবন রক্ষার জন্য তুমি এই ধরনের কর।'

আম্মার আল্লাহর রাসূলের সাথে প্রায় সকল জিহাদেই অংশগ্রহণ করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আদর্শের প্রতি আপসহীন ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, তিনি বিদ্রোহীদের হাতে শহীদ হবেন। উক্ত ভবিষ্যত বাণীই সত্যে পরিণত হয়। তিনি সিফফীনের যুদ্ধে ৯০ বছর বয়সে শাহাদাত বরণ করেন।

আবূ জান্দাল বিন সোহায়েল (রা)-এর উপর নির্যাতন

আবূ জান্দাল বিন সোহায়েল (রা)-এর মূল নাম ছিল 'আস। তাঁর পিতা সোহায়েল বিন আমের কুরাইশের অন্যতম সরদার ছিলেন। হোদাইবিয়ার সন্ধির আগেই আবূ জান্দাল ইসলাম কবুল করেন। এ কারণে তার উপর তার পিতা প্রচণ্ড নির্যাতন করত এবং কারাগারে আটক রাখতো। তার ইচ্ছা ছিল, মদীনায় চলে যাওয়া। কিন্তু হুদাইবিয়ার সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল, মক্কার কোন ব্যক্তি যদি পালিয়ে মুসলমানদের নিকট চলে যায় আর সে যদি মুসলমানও হয় তবে তাকে কুরাইশদের নিকট ফেরত পাঠাতে হবে। পক্ষান্তরে কোন মুসলমান যদি মক্কাবাসীর কব্জায় আসে তাহলে কুরাইশরা তাকে ফেরত পাঠাবে না। সাধারণ মুসলমানদের কাছে এ শর্ত ইনসাফবিরোধী ও অগ্রহণযোগ্য মনে হলো। আবূ জান্দালের পিতা কুরাইশদের পক্ষে ছিলেন এবং উক্ত শর্ত বহাল রাখার পক্ষে অটল ছিলেন। এমনি সময় আবূ জান্দাল কোন উপায়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে হুদাইবিয়ায় মুসলমানদের কাছে ছুটে আসেন। সে সময় তাঁর পায়ে বেড়ি লাগানো ছিল এবং হাঁটু থেকে রক্ত নির্গত হচ্ছিল। তিনি মুসলমানদের কাছে আকুতি জানান যে, 'হে মুসলিম ভাইয়েরা! আপনারা দেখুন, ইসলাম গ্রহণের অপরাধে আমার পিতা আমার উপর এ ধরনের নির্যাতন করছে। আপনারা কি আমাকে এই মুসীবত থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করবে না? আবূ জান্দালের এ আহ্বানে মুসলমানদের মাঝে কান্নার রোল পড়ে গেল। আবূ জান্দালের পিতা সোহায়েল সে সময় রাসূল (স)-এর উদ্দেশ্যে বলেন, হে মুহাম্মদ! আবূ জান্দালকে আমাদের হাতে ফেরত দানের মাধ্যমেই হুদাইবিয়ার সন্ধি বাস্তবায়ন শুরু করতে হবে। সে সময় আল্লাহর রাসূল (স) বলেন, ভাই সোহায়েল! এই শর্ত তো এখনও লেখা হয় নি। তা কি করে আবূ জান্দালের উপর কার্যকর হতে পারে? তখন সোহায়েল জবাব দেয় যে,

আবূ জান্দালকে আমাদের হাতে ফেরত দেয়ার আগ পর্যন্ত আমরা কোন শর্তেই সন্ধিচুক্তি করব না। মুসলমানেরা কুরাইশদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তারা কোনভাবেই মানতে রাজি হয়নি। ফলে এক পর্যায়ে আল্লাহর রাসূল (স) ঘোষণা করেন যে, ঠিক আছে তোমরা আবূ জান্দালকে তোমাদের সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তখন আবূ জান্দাল চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেন এবং বলতে লাগেন, হে মুসলমানেরা! মুশরিকরা একজন মুসলমানের উপর জুলম-নির্যাতনের পাহাড় আপতিত করতে পারে– একথা জেনেও তোমরা তাকে তাদের নিকট হস্তান্তর করছ? আমার শরীরের দিকে একটু তাকিয়ে দেখ, তাদের অত্যাচারের কারণে আমার শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। এমন হৃদয়বিদারক পরিস্থিতিতে ওমর আবেগাপপ্লুত হয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি সত্য পয়গাম্বর নন? আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই? আমাদের শত্রুরা কি মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়? হুযুর (স) জবাব দিলেন নিঃসন্দেহে আমি সত্য নবী এবং আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তখন হযরত ওমর বললেন, তাহলে আমরা এভাবে নতি স্বীকার করে সন্ধি করব কেন? তখন আল্লাহর রাসূল (স) জবাব দিলেন, আমি আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর নির্দেশ আমি অমান্য করতে পারি না। তিনিই আমার সমর্থক এবং সাহায্যকারী। এরপর আল্লাহর রাসূল (স) আবূ জান্দালকে বললেন, হে আবূ জান্দাল, ধৈর্য ধারণ কর। আমাদের কর্মপদ্ধতির ফল খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। আল্লাহ তোমার এবং অন্যান্য মজলুম মুসলমানদের জন্য কোন রাস্তা তৈরি করে দেবেন। এ কথাগুলো বলার পর রাসূলে কারীম (স) আবূ জান্দালকে সোহায়েলের হাতে তুলে দেন। অবশ্য কিছুদিন পর কুরাইশরাই উক্ত চুক্তি বাতিলের জন্য রাসূলে কারীম (স)-এর কাছে দূত পাঠান। রাসূলে কারীম (স) তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ফলে আবূ জান্দালসহ মাযলুম মুসলমানেরা মদীনায় চলে আসার সুযোগ পান।

মুসআব (রা)-এর শাহাদাত

মুসআব (রা) ধনীর দুলাল ছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর উপর চরম নির্যাতন চালানো হয়। দীর্ঘদিন বন্দী করে রাখা হয়। একদিন বন্দী জীবনের শৃঙ্খল ভেঙে আবিসিনায় চলে যান। সেখান থেকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন একটি পোশাক পরিধান করে মদীনায় আসেন। মুসআবের এ দুরবস্থা দেখে আল্লাহর রাসূল (স)-এর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়। কেননা মুসআব খুবই আরাম-আয়েশের জীবন যাপন করত। শুধু ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তার এ দুরবস্থা।

মুসআব মদীনায় আসার পর ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উক্ত যুদ্ধে মুসআবের হাতে ছিল ইসলামের পতাকা। যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর প্রচণ্ড আঘাতে মুসআবের ডান

হাত কেটে যায়। এরপর তিনি বাম হাত দিয়ে ইসলামের পতাকা উড্ডীন রাখেন। একটু পরে বাম হাতও কাটা যায়। দু হাত কাটা যাওয়ার পর দু হাতের অবশিষ্টাংশ দিয়ে ইসলামের পতাকা বুকে ধরে রাখলেন। যতক্ষণ প্রাণ ছিল ইসলামের পতাকা মাটিতে পড়তে দেন নি। অবশেষে শত্রুপক্ষের তীরের আঘাতে তিনি শহীদ হন।

আবূ যর (রা)-এর উপর নির্যাতন

আবূ যর (রা) ইসলাম কবুল করার পর চুপ করে বসে থাকার পরিবর্তে কাবা ঘরে গিয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা দিলেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই। মুহাম্মদ (স) তাঁর রাসূল। এ ঘোষণা দেওয়ার পর কুরাইশরা হিংস্র পশুর মতো আবূ যরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সবাই তাকে চারিদিক থেকে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগল। এভাবে আঘাতে আঘাতে তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত হলো। রক্তে কাপড়-চোপড় ভিজে গেল। এভাবে শুধু একবার নয় বারবার নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু আবূ যর (রা) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সব কিছুই মেনে নিয়েছেন হাসি মুখে।

সাঈদ ইবন আমের আল জুমাহী (রা)

হযরত উমর (রা) সাঈদ ইবন আমের আল জুমাহী (রা)-কে হিমসের গভর্নর করেন। একবার হিমসের একটি প্রতিনিধিদল খলীফা উমরের সাথে দেখা করে সেখানকার গরীবদের একটি তালিকা দেন সাহায্য প্রদানের জন্য। সে তালিকায় গভর্নরের নামও ছিল। হযরত উমর প্রতিনিধি দলকে সাঈদ এর জন্য এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেন। প্রতিনিধি দল ফিরে এসে গভর্নরকে বললেন, 'খলীফা আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং এগুলো দিয়েছেন।' এই উপঢৌকন দেয়ার পর তিনি খুব বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁর স্ত্রী এ অবস্থা দেখে জানতে চান, 'খলীফার কোন দুঃসংবাদ আছে কি না'? সাঈদ বললেন, তার চেয়েও ভয়াবহ। তাঁর স্ত্রী জানতে চাইলেন, মুসলমানদের কোন দুঃসংবাদ আছে কি না। তিনি উত্তর দিলেন, তার চাইতেও ভয়াবহ। তিনি জানতে চাইলেন সেই ভয়াবহ সংবাদটি কী? তিনি জবাব দিলেন,

دخلت علي الدنيا لتفسد اخرتي- وحلت الفتنة في بيتي

'আমার আখিরাত বরবাদ করার জন্য দুনিয়া এসেছে। আর আমার ঘরে ফিতনা ঢুকে পড়েছে।' তাঁর স্ত্রী একথা শোনার পর বললেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ মুসিবত থেকে নিজেকে মুক্ত করুন। সাঈদ স্ত্রীকে বললেন, তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে? উত্তরে তিনি বললেন, অবশ্যই। এরপর তাঁরা প্রতিনিধিদল থেকে স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করে সবগুলো হিমসের গরীবদের মাঝে বণ্টন করে দেন। আরেকবার উমর (রা) সিরিয়া যাওয়ার পথে হিমসে যাত্রাবিরতি করেন। তিনি হিমসের জনগণের অবস্থা জানতে চাইলে তারা গভর্নর সম্পর্কে গুরুতর চারটি

অভিযোগ পেশ করেন। সাঈদ সম্পর্কে উমরের খুব উঁচু ধারণা ছিল। তিনি অভিযোগের কথা শোনার পর হিমসবাসী ও সাঈদকে একত্র করলেন। এরপর অভিযোগসমূহ বলতে বলেন। তাদের প্রথম অভিযোগ ছিল, তিনি প্রত্যহ বিলম্বে অফিসে আসেন। সাঈদ এর উত্তরে বলেন, ব্যক্তিগত বিষয় আমি বলা পছন্দ করি না, তবে খলীফার নির্দেশে বলতে হয়, আমার ঘরে কাজের কোন ছেলে-মেয়ে নেই। প্রত্যহ সকালে পরিবারের সদস্যদের জন্য রুটি বানিয়ে তা গরম করার জন্য কিছু সময় রাখতে হয়। এরপর অযু-গোসল সেরে আসতে দেরি হয়। দ্বিতীয় অভিযোগ ছিল, রাতের বেলা গভর্নরকে পাওয়া যায় না। তিনি জবাব দিলেন, 'আমি দিনকে রাষ্ট্রীয় কাজে আর রাতকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করেছি।' তৃতীয় অভিযোগ, মাসে একদিন অফিসে অনুপস্থিত থাকেন। তিনি জবাব দিলেন, আমার কোন কাজের লোক নেই বলে মাসে একদিন বাজার করি। আর পরনের পোশাক ছাড়া আর কোন পোশাক নেই বলে বাজার করে এসে তা পরিষ্কার করি এবং পোশাক শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। তাই যোহরের পর ছাড়া অফিসে আসা সম্ভব হয় না। চতুর্থ অভিযোগ হলো, মাঝে-মধ্যে গভর্নর এমন অজ্ঞান হয়ে পড়েন যে, তাঁর পাশের লোককেও তিনি চিনতে পারেন না। এ অভিযোগের জবাবে তিনি বলেন, 'হে খলীফা, কুরাইশরা যখন হযরত খাব্বাবকে নির্মমভাবে ফাঁসি দিয়েছিল, আমি সেদিন জনসমুদ্রে ছিলাম কিন্তু খুবাইবকে কোন সাহায্য করিনি। সেই দৃশ্য যখন আমার মনে পড়ে, আমার মনে হয় আল্লাহ আমাকে মাফ করবেন না এবং এজন্য আতঙ্কিত হয়ে পড়ি।' উক্ত ঘটনার পর খলীফা মদীনা গিয়ে আবার স্বর্ণমুদ্রা পাঠালেন। উপঢৌকন দেখে সাঈদের স্ত্রী প্রথমত খুশি হলেন এবং বললেন যে, এবার একটা চাকর রাখা সম্ভব হবে এবং ঘরের কিছু আসবাবপত্র কেনা যাবে। হযরত সাঈদ স্ত্রীকে বললেন, 'তোমাকে এর চেয়ে উত্তম জিনিস দিতে চাই।' তিনি বললেন, 'এগুলো গরীবদের মাঝে বিলি করে আল্লাহকে করজে হাসানা দিতে চাই।' স্ত্রী বললেন, 'হ্যাঁ তা-ই করুন।' আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদেরকে উত্তম জিনিস দান করবেন। হযরত সাঈদ অফিস ত্যাগ করার আগেই সবগুলো দান করে দিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবন হুযাফা (রা)

আব্দুল্লাহ ইবন হুযাফা আস-সাহামী একবার যুদ্ধবন্দী হন। বন্দী থাকা অবস্থায় রোম সম্রাট তাকে বললেন, তোমাকে মুক্তি দেব যদি তুমি স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ কর। কিন্তু তিনি জবাব দেন, 'তোমরা যা করতে বল তা করার চেয়ে মৃত্যু হাজার বার উত্তম।' এরপর সম্রাট বলেন, 'তোমাকে ক্ষমতার অংশীদার বানাব যদি আমার আহ্বানে সাড়া দাও।' তিনি বললেন, সমগ্র রোম সাম্রাজের ক্ষমতা

ও সমুদয় সম্পদ দিলেও আমি আমার আদর্শ ত্যাগ করব না। এটা দেখে সম্রাট ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ে এবং তাকে জ্বলন্ত ডেকচিতে নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন। যখন জল্লাদরা তাকে জ্বলন্ত ডেকচিতে ফেলার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল, তাঁর চোখে অশ্রুফোটা আসল। তা দেখে জল্লাদরা দৌড়ে গিয়ে সম্রাটকে জানায়, মনে হয় মৃত্যু ভয়ে কাঁদছে। সম্রাট মনে করল, এবার কাজ হবে। সম্রাটের নির্দেশে তাঁকে আবার সম্রাটের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো। সম্রাট আবারও ইসলাম ত্যাগের আহ্বান জানালে তিনি দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন সম্রাট বলল, 'ধিক্কার তোমার প্রতি তুমি মৃত্যুকে ভয় না পেলে কাঁদলে কেন'? তিনি জবাব দিলেন, 'আমি ভেবেছিলাম তোমার অনেকগুলো ডেকচি উত্তপ্ত করবে এবং আমাকে আরও নির্মমভাবে হত্যা করবে আর আমি শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করব।' আমি এ জন্য কেঁদেছি যে, তোমরা বেশি ডেকচি উতপ্ত করনি। ফলে আমি আমার কাঙ্ক্ষিত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি কি না এ কথা ভেবে কেঁদেছি। সম্রাট এ কথা শোনার পর অবাক হলেন এবং বললেন, 'তুমি যদি আমার মাথায় একটি চুম্বন দাও আমি তোমাকে ছেড়ে দেব।' এই প্রস্তাব শোনার পর তিনি বললেন, 'তুমি যদি সমস্ত যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দাও তাহলে এ প্রস্তাব আমি বিবেচনা করে দেখতে পারি।' তখন আব্দুল্লাহ ইবন হুযাফা ভাবলেন, 'একটি চুম্বন দিয়ে সকল মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করতে পারলে চুম্বন দিতে লজ্জা কিসের।' আব্দুল্লাহ ইবন হুযাফা সম্রাটকে একটি চুম্বন দেওয়ার পর সকল মুসলিম বন্দী মুক্তি পেল। এরপর আব্দুল্লাহ ইবন হুযাফা উমর (রা)-এর দরবারে গিয়ে ঘটনার বর্ণনা দেন। উমর (রা) এই ঘটনা শোনার পর বললেন, 'সকল মুসলমানের উচিত আব্দুল্লাহর কপালে চুম্বন দেয়া, আর আমিই প্রথম তার কপালে চুম্বন দিচ্ছি।'

আমর ইবন তুফাইল (রা)

ইয়ামামার যুদ্ধে তাঁর ও তাঁর ছেলের ডান হাত কবজি পর্যন্ত আল্লাহর পথে উৎসর্গ হয়ে যায়। তা তাঁরা দাফন করে আসেন। একবার খলীফা উমরের দরবারে রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় তুফাইল উপস্থিত ছিলেন কিন্তু বাম হাত ব্যবহার ছাড়া খাবার গ্রহণ সম্ভব নয় বলে খানা গ্রহণ করছিলেন না। উমর এটা লক্ষ্য করে বললেন, 'তুফাইল তুমি দুনিয়াতে আছ; কিন্তু তোমার হাতের একটি অংশ জান্নাতে চলে গেছে। আল্লাহর শপথ তুমি বাম হাত দিয়ে খাবার স্পর্শ না করলে আমি কোন খাবার খাব না।'

আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী-সাথীদেরকে মক্কা থেকে হাবশায় এবং মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে হয়েছে। ঈমানের দাবি পূরণে অনেক মহিলাও হিজরত করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত উম্মে সালমার মদীনায় হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করছি।

উম্মে সালমা (রা)

মক্কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য পরিবার, ঐতিহ্যবাহী বনূ মাখযূম গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কন্যা ছিলেন। তিনি ও তাঁর স্বামী প্রাসাদসম অট্টালিকা, বংশীয় প্রতিপত্তি এবং অঢেল সম্পদ রেখে শুধু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন ও আখিরাতের পুরস্কারের আশায় অত্যন্ত দীনহীনভাবে হাবশায় দিনাতিপাত করছিলেন। রাসূল (স)-এর সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে হাবশায় বসবাস করা ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। মক্কায় মুসলমানদের উপর নির্যাতন একটু কমলে উম্মে সালমা তাঁর স্বামীসহ মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু কিছুদিন পর আবারও শুরু হয় চরম নির্যাতন। এমননি অবস্থাই মুসলমানদের মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দেয়া হয়। কুরাইশদের সীমাহীন নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে উম্মে সালমা ও তাঁর স্বামী মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় হিজরতের করুণ কাহিনী উম্মে সালমা এভাবে বর্ণনা করেন, আমার স্বামী আবূ সালমা অতি সঙ্গোপনে মদীনায় হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। প্রয়োজনীয় কাজ সমাপ্ত করে তিনি আমার জন্য একটি উটও প্রস্তুত রাখেন। অতি সতর্কতার সাথে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে আমাদের একমাত্র সন্তান ছালামাকে কোলে নিয়ে আমি উটের পিঠে সওয়ার হই। সাথে সাথে আমার স্বামী এদিক-সেদিক চিন্তা না করে দ্রুতগতিতে মদীনার উদ্দেশ্যে উট চালনা করতে থাকেন। চালকের সংকেত পাওয়া মাত্রই উটটি তার স্বাভাবিক গতির চেয়েও আরও অধিক গতিতে এগিয়ে চলে।

আমরা মক্কার সীমান্ত অতিক্রম করতে যাচ্ছি, ঠিক এ সময়ে আমার নিজ গোত্র বনূ মাখযূমের কিছু লোক আমাদেরকে দেখে ফেলে এবং গতিরোধ করে। তারা আমার স্বামী আবূ সালমাকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'তুমি যদি আমাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে চলে যেতে সক্ষম হও তাতেই বা কী আসে যায়? কিন্তু তোমার স্ত্রী সে তো আমাদের বংশের মেয়ে। তুমি চাইলেই কি তাকে আমরা তোমার সাথে যেতে দেব? আর সে চাইলেই কি তোমার সাথে চলে যেতে পারবে? এই বলেই তারা আমার স্বামীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে তারা আমার স্বামী থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়। অতঃপর তারা আমাকে নিয়ে মক্কায় রওয়ানা হয়। ঠিক এই সময়ে আমার স্বামীর গোত্র আবুল আসাদের কিছু লোকজন ঘটনাক্রমে সেখানে এসে পৌঁছে। তারা দেখতে পায় যে, আমার গোত্রীয় লোকজন আমার স্বামী থেকে আমাকে ও আমার সন্তানকে জোরপূর্বক মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এতে তারা ভীষণ ক্ষুব্ধ হয় এবং তারা আমার গোত্রের লোকদের বলে তোমরা যেহেতু আমাদের গোত্রের আবূ সালমা থেকে তোমাদের মেয়েকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছ সেহেতু আমাদের গোত্রের শিশু সন্তানকে তোমাদের সাথে যেতে দিতে পারি না। সে আমাদের বংশের ছেলে। তাই আমরাই তার বৈধ উত্তরাধিকারী।

এই উত্তরাধিকারীর দাবিতে উভয় গোত্রের লোকজনের মাঝে প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয় এবং এক পর্যায়ে আমার স্বামীর গোত্রের লোকজন সালামাকে ছিনিয়ে নেয়। এভাবে স্বামী ও সন্তান থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। আমার স্বামী আমার গোত্রীয় লোকজনের আক্রমণ থেকে কোনমতে রক্ষা পেয়ে মদীনার দিকে চলে যান। দুগ্ধপোষ্য সালামাকে তার পিতার গোত্রের লোকজন নিয়ে যায়। ক্ষণিকের মধ্যে আমাদের মধুর দাম্পত্য জীবনে নেমে আসে নানা বিপদ। আমার গোত্রীয় লোকজন আমাকে এভাবে পাহারা দিত যে, আমি যেন মদীনায় চলে যেতে না পারি। কিন্তু আমি খুব ভোরে চলে যেতাম আবতাহ্ নামক উপত্যকায় যেখান থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছিল। সেখানে উঠে আল্লাহর দরবারে আহাজারি করতাম। আমার আর্তনাদ শুনে একদিন আমার গোত্রীয় এক লোকের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হলো। তিনি আবেগের সাথে আমার গোত্রীয় লোকদের উপর চাপ সৃষ্টি করল। ফলে তারা আমাকে আমার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে দেয়। কিন্তু ছেলের জন্য আমি পাগলপ্রায় হয়ে যাই। তবে কিছু লোক তারা দয়াপরবশ হয়ে বনূ আসাদ গোত্রের সাথে যোগাযোগ করে আমার ছেলেকে আমার কোলে ফিরিয়ে দিতে রাজি করায়। ছেলেকে ফেরত পেয়েই মদীনায় যাওয়ার জন্য একজন সফর সঙ্গীর অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু তা না পেয়ে একমাত্র ছেলে সন্তানকে নিয়ে একাই মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি।

মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে তানয়ীম নামক স্থানে খানায়ে কাবার চাবি সংরক্ষণকারী ওসমান বিন তালহার সাথে দেখা হয়। তিনি আমাকে দেখে বলেন, 'হে সফর সামগ্রীর যোগানদারের মেয়ে, তুমি কোথায় যাচ্ছ?' আমি বললাম, স্বামীর সাথে মিলিত হওয়ার প্রত্যাশায় মদীনায় যাচ্ছি। তিনি বললেন, তোমার সাথে কি কোন সফর সঙ্গী নেই? উত্তরে বললাম, খোদার কসম আল্লাহ্ এবং আমার এই শিশু সন্তান সালামা ব্যতীত আমার সাথে আর কেউ নেই। আমার এ জওয়াব শুনে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে একাকী যেতে দিতে পারি না। তুমি নিশ্চিত হও যে, আমি তোমাকে মদীনায় পৌছিয়ে দেব। এই বলে তিনি তাঁর নিজের পথ পরিবর্তন করে আমার উটের রশি ধরে মদীনার দিকে চলতে থাকেন। তাঁর মতো আমানতদার, চরিত্রবান সফর সঙ্গী এ জীবনে আর কখনো দেখিনি। যখন কোথাও বিশ্রামের প্রয়োজন হতো তিনি উটকে বসার নির্দেশ দিয়ে আমার দিকে না তাকিয়ে দূরে চলে যেতেন। আমি যেন উট থেকে সহজে নামতে পারি। আমি উট থেকে নামলে তিনি এসে উটকে কোন গাছের সাথে বেঁধে রাখতেন। এভাবে ক্রমাগত কয়েকদিন চলার পর আমরা মদীনায় পৌছলাম। আমাকে নিরাপদে আমার স্বামীর কাছে পৌছে দিয়ে তিনি আবার মক্কায় ফেরত আসেন।

ইমাম, মুজাদ্দিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের উপর নির্যাতন যুগে যুগে

যুগে যুগে মুজাদ্দিদ, ইমাম এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের অনেকই তদানীন্তন শাসকদের হাতে নিপীড়নের সম্মুখীন হয়েছেন। অতীতে যাঁরাই তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠীর যুলুম-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়েছেন, তাঁদের সকলের উপরই নেমে এসেছিল নির্যাতনের স্টীমরোলার। ইতিহাস সাক্ষী, অতীতে যারা যালিমের ভূমিকায় ছিল, আজকেও তাদেরকে মানুষ স্মরণ করে ঘৃণার সাথে। আর যারা মাযলুম ছিলেন তাঁরা শতাব্দীকাল থেকেই সম্মান ও মর্যাদার সাথেই মুসলিম উম্মাহর মন ও মননে রয়েছেন। বর্তমানেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেসব মুসলিম শাসক নিজেদের হীনস্বার্থে বা অন্য কারো স্বার্থ পূরণে ক্ষমতার দর্পে সত্যপন্থি মানুষদের উপর নির্যাতন করছে, ইতিহাস তাঁদেরকেও ক্ষমা করবে না। ইতিহাস তাঁদেরকেও যালিম হিসেবে ঘৃণা করবে আর মাযলুমের জন্য আজকে যেমনি কোটি কোটি মানুষ চোখের পানি ফেলে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছে, তেমনিভাবে আগতকালেও তাঁরা কোটি মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে থাকবেন।

ইসলামী আদর্শের উপর অটল ও অবিচল থাকতে গিয়ে যুগে যুগে ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা দিয়েছেন অনেক ইমাম, মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদ, মুজাহিদ, দীনের দাঈসহ দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী অসংখ্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব। যারা যালিমের যুলুম ও রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র সত্য ও ন্যায়ের জন্য দীনের পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার প্রত্যাশায় হাসিমুখে অপবাদ সহ্য থেকে আরম্ভ করে জীবনের একটি অধ্যায়, প্রয়োজনে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। শুধুমাত্র আদর্শগত বিরোধের কারণে তারা যালিমের যুলুম ও পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

যালিমের যুলুমের শিকার হয়ে কারাগারের অন্তরালে বন্দীবেশে জীবন কাটিয়েছেন ইমাম আবূ হানিফার। তাঁকে তদানীন্তন শাসক নিজের ক্ষমতার স্বার্থে বিচারপতির পদ-পদবি দিয়ে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তিনি তাতে সম্মত না হওয়ায় তাঁকে কারানির্যাতন ভোগ করতে হয়। ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠীর মর্জিমতো ফতোয়া দিতে সম্মত না হওয়ায় তাঁদের উপর নেমে আসে যুলুম ও নিপীড়ন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া শুধু তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠীর কোপানলে পড়েননি বরং সে সময়কার কিছু আলেমও তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাচারে নেমেছিল। মুজাদ্দিদে আলফেসানী বাদশাহ আকবরের কোপানলে

পড়েন দীনে এলাহীর বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য। সৈয়দ নেসার আলী তিতুমীর, শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী, শহীদ হাসানুল বান্না, সাইয়েদ কুতুব শহীদ, সাইয়েদ মুহাম্মদ কুতুব, হামিদা কুতুব, আমিনা কুতুব, ওমর তিলমেসানী, জয়নব-আল-গাজ্জালী ও আব্দুল কাদের আওদাসহ অনেকেই নানাধরনের নির্যাতন ভোগ করেন। এখনো আলজেরিয়ায় সত্যপথের হাজার হাজার পথিককে জেলের অন্তরালে প্রতিনিয়ত অমানুষিকভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)কেও জেলে কয়েক বছর কাটাতে হয়েছে। ফাঁসির রায় শুনেও যিনি ছিলেন পাহাড়ের মতো অটল, ভোরের আলোর মতো স্বতঃস্ফূর্ত ফুরফুরে আর আকাশ ও মাটির মতো চিরঅবিচল-স্থির। ফাঁসির পোশাক পরিধান করার পর যাকে সরকারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার প্রস্তাব দেয়া হলে তিনি বলেছিলেন, 'হায়াত আওর মওত কা ফয়সালা আসমান পর হোতা হ্যায়, যমিন পর নাহী। ইস্ বাতিল হুকুমতকে সামনে মাফী মাঙ্গনে কা মতলব ইয়ে হ্যায় কেহ, আল্লাহ মুঝে শাহাদাত জেসী উঁচ্চ মরতবা দেনা চাহ্তে হেঁ, আওর মাই উস্‌ছে রুগরদানী কারবাহা হোঁ।' অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যুর ফয়সালা আসমান থেকে হয়; জমিন থেকে নয়। এই যালিম সরকারের কাছে ক্ষমা চাওয়ার অর্থ হলো– আল্লাহ আমাকে শহীদের মর্যাদা দিতে চান আর আমি তা প্রত্যাখ্যান করতে চাচ্ছি।

ক্ষমতার লোভ ও বস্তুগত কায়েমী স্বার্থ হাসিলের জন্য শাসকগোষ্ঠী যুগে যুগে যুলুম ও নির্যাতনের মাধ্যমে এসব সত্যের পথে চলা পথিকদের কণ্ঠ স্তব্ধ করতে চেয়েছে। তবুও তাঁরা থেমে যাননি। ত্যাগ ও কুরবানীর নজরানা পেশ করে তারা হয়েছেন মুসলিম উম্মাহর জন্য চির প্রেরণার উৎস। তাদের সে ত্যাগ ও কুরবানী ইসলামের ইতিহাসকে করেছে শাণিত, করেছে গৌরবান্বিত। মুক্তিকামী মজলুম মানুষের ঈমানী পরীক্ষায় যুগিয়েছে অনন্ত প্রেরণা। যে প্রেরণায় জেগে উঠেছে ঘুমন্ত পৃথিবীর ভোরের নকীব মুসলিম যুবক আবাবিলেরা।

বর্তমানে পৃথিবীর কিছু দেশে সত্যপন্থি মানুষদের উপর যুলুম-নির্যাতনের বিভিষীকাময় কিছু ঘটনা জানার পর আমি অতীতে যেসব মর্দে মুজাহিদ শত নির্যাতনের পরও সত্যের পথে অটল ও অবিচল থেকে জীবন কুরবানী করেছেন তাঁদের জীবনী পড়ে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করছি যে, অতীতের যালিমদের সাথে বর্তমান যামানার যালিমদের যুলুমের কি ধরনের মিল রয়েছে? আর অতীতে কিভাবে ইসলামী চিন্তাবিদগণ নিপীড়নের মধ্যেও সত্যের উপর অটল ও অবিচল ছিলেন। অতীতের যুলুমের কিছু বিবরণ পড়ার পর আমার কাছে মনে হলো,

যালিম সব যমানাতে একই রূপে আবির্ভূত হয়। যালিমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসী হতে পারে কিংবা তাদের নাম বা ভাষার মাঝে পার্থক্য থাকতে পারে; কিন্তু তাদের যুলুমের কারণ ও ধরন অনেকাংশে অভিন্ন। সময়ের আবর্তনে নিপীড়নের নিত্য নতুন কৌশল ব্যবহার করলেও সকল যালিমই ক্ষমতা দীর্ঘদিন ভোগ করার জন্যই আপসহীন সত্যপন্থি মানুষকে নির্যাতন করে। দুর্বলচেতা কিছু মানুষ নির্যাতনের ভয়ে সত্যপথ ছেড়ে দিতে দ্বিধাবোধ না করলেও যুগে যুগে সত্যপ্রতিষ্ঠার পথে যাঁরা অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছেন, তাঁরা জীবন দিয়েছেন কিন্তু কখনও আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যার সাথে আপস করেননি। রাত ও দিন যেমনিভাবে একসাথে আসে না। তেমনিভাবে সত্য ও মিথ্যা একসাথে চলতে পারে না। সাময়িকভাবে কখনও মিথ্যাবাদী ও যালিমদের জয়জয়কার অবস্থা দেখা গেলেও মিথ্যা পরাভূত হবেই এবং যালিমদের যুলুমের চুলচেরা হিসাব করে একদিন শাস্তি পেতেই হবে। আমি এখন অতীতের কয়েকজন ইমাম ও ইসলামী চিন্তাবিদের কারাভোগ ও নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরছি।

ইমাম আবূ হানিফার (র) কারাবরণ

ইমাম আবূ হানিফা চার প্রসিদ্ধ ইমামের মধ্যে বড় ইমাম হিসেবে পরিচিত। পাক-ভারত উপমহাদেশে তাঁর মাযহাবের অনুসারীর সংখ্যাই বেশি। খলীফা মানসুরের সময় ইমাম আবূ হানিফাকে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়। তিনি উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে খলীফাকে সম্বোধন করে বলেন, 'আল্লাহর শপথ, কোন ব্যাপারে আমার ফায়সালা যদি আপনার বিরুদ্ধে যায় এবং আপনি আমাকে হুকুম দেন যে, হয়ত সিদ্ধান্ত পাল্টাও না হলে তোমাকে ফোরাত নদীতে ডুবিয়ে মারা হবে। তখন আমি ডুবে মরতে প্রস্তুত থাকব তবু নিজের সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারব না। তা ছাড়া আপনার দরবারে এমন অনেক লোক রয়েছে যাদের মনোতুষ্টি করার মতো কাজীর প্রয়োজন।' এ মন্তব্য করে ইমাম আবূ হানিফা খলীফার প্রস্তাব প্রত্যখ্যান করার পর তাকে ত্রিশটি বেত্রাঘাত করা হয়। যার ফলে তাঁর শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায়। তখন খলীফা মানসুরের চাচা আব্দুস সামাদ ইবন আলী তাকে এজন্য খুবই তিরস্কার করে বলেন, 'ইনি শুধু ইরাকের ফকীহ নন। সমগ্র প্রাচ্যবাসীর ফকীহ।' এতে মানসুর লজ্জিত হয়ে প্রত্যেক চাবুঘাতের বদলে এক হাজার দিরহাম ইমাম আবূ হানিফার কাছে পাঠান। কিন্তু ইমাম উক্ত দিরহাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তখন তাকে বলা হয় তিনি এ অর্থ গ্রহণ করে নিজের জন্য না রাখলেও দুঃখী-গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেন। এর জবাবে ইমাম বলেন, তার কাছে কি কোন হালাল অর্থও রয়েছে? মানসুর

এরপর আরও প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠে। ইমামকে আরও চাবুকাঘাত করা হয়। কারারুদ্ধ করে পানাহারে নানাভাবে কষ্ট দেওয়া হয়। তারপর একটা বাড়িতে নজরবন্দী করে রাখা হয়। সেখানেই ইমাম আবূ হানিফার মৃত্যু হয়। কারো কারো মতে, তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। নির্মম নির্যাতনের শিকার ইমাম আবূ হানিফা মৃত্যুর আগে অসিয়ত করে যান যে, খলীফা মানুসর জনগণের অর্থ অন্যায়ভাবে দখল করে বাগদাদের যে এলাকায় শহর নির্মাণ করেছে সে এলাকায় যেন ইন্তেকালের পর তাঁকে দাফন করা না হয়।

মূলত খলীফা মানসুর তার ক্ষমতার স্বার্থেই ইমাম আবূ হানিফাকে বিচারকের পদে নিয়োগ দিতে চেয়েছিলেন। তাই ইমাম উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইমাম আবূ হানিফা এ বিষয়টি স্পষ্ট করেই খলীফা মানসুরকে এই ভাষায় জানান যে, 'আপনি আমাদেরকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ডেকে আনেননি; বরং আপনি চান যে, আপনার ভয়ে যেন আমরা আপনার মর্জিমাফিক কথা বলি।' বর্তমান যমানায় ইমাম আবূ হানিফার পদাংকানুসরণ করে অনেক ইমাম যালিম শাসকের সাথে আপস করার চেয়ে কারাগারে অন্তরীণ থাকাকে শ্রেয় মনে করছেন।

ইমাম মালেক (র)-এর উপর নির্যাতন

শুধু ইমাম আবূ হানিফা নয় ইমাম মালেকও আব্বাসীয় যালিম শাসকদের যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর ছিলেন। তাই খলীফা মানসুরের চাচাত ভাই মদীনার গভর্নর জাফরের নির্দেশে ইমাম মালেকের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন করা হয়। ইমামের দেহের কাপড় খুলে নির্মমতার সাথে চাবুকাঘাত করা হয়। ফলে শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়। কিন্তু এভাবে নির্যাতন করেও তৃপ্ত হতে পারেননি মদীনার তদানীন্তন যালেম গভর্নর। ইমাম মালেককে ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়ে উটের পিঠে বসিয়ে শহরের অলি-গলিতে প্রদক্ষিণ করা হয়। এভাবে নির্যাতনের পর ইমাম মালেক রক্তাক্ত অবস্থায় মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে রক্ত পরিষ্কার করে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। ইমাম মালেক তৎকালীন গভর্নরের কথামতো ফতোয়া দিতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণেই তাঁর উপর এ ধরনের নির্যাতন করা হয়।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-এর উপর নির্যাতন

২১৮ হিজরীতে খলীফা মামুনুর রশীদ মুতাযিলা সম্প্রদায়ের আকীদাকে কুরআনের আকীদা বলে প্রচারের মাধ্যমে এর প্রতি জোরপূর্বক জনগণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। বাগদাদের তদানীন্তন গভর্নর ইসহাক ইবনে ইবরাহীম সকল আলেমকে একত্রিত করে তাঁকে শাস্তির হুমকি দিয়ে খলীফার নির্দেশ মানার অনুরোধ করেন। মাত্র চারজন ছাড়া আর সব আলেম নির্যাতনের ভয়ে খলীফার

অনুরোধ রক্ষা করেন। এ চারজনের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। গভর্নরের নির্দেশে এদের উপর কঠিন শাস্তি দেয়া হয়। ফলে দুজন মুতাযিলা আকীদায় বিশ্বাস স্থাপনের ঘোষণা দেন। আর একজন নির্যাতনের মুখে শহীদ হন। এরপর ইমাম আহমদকে হাতকড়া ও পায়ে বেড়ি দিয়ে খলীফা মামুনের দরবারে নিয়ে যাওয়ার জন্য রওয়ানা দেওয়া হয়। পথিমধ্যে সংবাদ আসে মামুন মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু মামুনের মৃত্যু হলেও ইমামের প্রতি নির্যাতন কমেনি বরং মুতাসিমের সময় নির্যাতন আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ইমাম সাহেবকে চারটি ভারি বেড়ি পরিয়ে রমযান মাসে দুপুর বেলায় রোদে বসিয়ে চাবুকাঘাত করা হতো। ক্রমাগত চাবুকাঘাতে অসহ্য হয়ে ইমাম সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে তাঁর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হতো। খলীফা মুতাসিমের মৃত্যুর পর খলীফা ওয়াসিকের সময়ও ইমাম আহমদকে গৃহবন্দী করে রাখা হয় এবং তাঁকে নামাযের জন্যও বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার কারাভোগ

ইমাম ইবনে তাইমিয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে বড় হয়ে উক্ত অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য চেষ্টা করেন। যারা সংস্কারক তাদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য এটাই যে, তাঁরা কোন সমাজে বসবাস করে উক্ত সমাজের গতি পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। ইবনে তাইমিয়ার সময় মুসলমানেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। রাষ্ট্রপ্রধানরা ইসলামী খিলাফতের প্রতিনিধিত্ব করার পরিবর্তে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রসারেই ব্যস্ত ছিল। তাতার ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী মুসলিম ঐক্য ছিল না। ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলতে থাকে। সালাহ উদ্দিন আইউবীর হাতে তাদের পতন হওয়ার আগ পর্যন্ত তাতাররা মুসলিম বিশ্বে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। যুদ্ধের কারণসমূহ ছিল–

১. ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের চিরাচরিত শত্রুতা। তারা সব সময় ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাকে।

২. সে সময় ইউরোপে চরম দারিদ্র্য বিরাজ করছিল। দারিদ্র্যের কারণে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হয়। তাদের ধারণা ছিল ইসলামী বিশ্বে প্রচুর স্বর্ণ রয়েছে, যা কুক্ষীগত করে তারা অতি দ্রুত ধনী হয়ে যেতে পারবে।

৩. শ্রেণী-বৈষম্য। ইউরোপের মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল– (ক) ধর্মানুসারী (খ) যুদ্ধংদেহী (গ) কৃষক ও কর্মচারী। কর্মজীবী মানুষেরা পরিশ্রম করে উপার্জন করত। আর তাদের প্রদত্ত করের টাকায় শাসকরা আনন্দ উপভোগ করত। (ঘ) খ্রিস্টানদের বিশ্বাস ছিল যে, মাসীহ (আ)-এর পূণ্যভূমির সংরক্ষণ করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব।

এ সময় তাতাররা মুসলমানদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাদের অপরাধ শুধু এটিই ছিল যে, তারা এক আল্লাহর উপর ঈমান এনেছিল এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী ও রাসূল হিসেবে স্বীকার করেছে এবং ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ দীন বা জীবনব্যবস্থা হিসেবে মেনে নিয়েছে। তাতাররা অনেক মসজিদ ও মিম্বর ধ্বংস করে দেয় এবং কুরআনের সহীফাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। অনেক আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাদের নির্মমতায় বুখারা ও সমরকন্দে খুনের নহর প্রবাহিত হয়। এভাবে তারা একের পর এক মুসলিম দেশ দখল ও ধ্বংস করে। ৬৫৬ হিজরীতে ইসলামী খিলাফতের রাজধানী বাগদাদ আক্রমণ করে খলীফা মু'তাসিম আব্দুল্লাহ বিন মানসুরকে তার পরিবার পরিজনসহ হত্যা করে এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগার জ্বালিয়ে দেয়। তাতাররা বাগদাদ দখল করার পর দামেশকের দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে তারা আমীর 'ইবন নিয়ান'-এর সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ফলে খ্রিস্টানদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। সে সময় ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর লেখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে তাতারদের যুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান। ইবনে তাইমিয়া প্রত্যক্ষ যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। তিনি ৭০২ হিজরীতে শাকহাব নামক স্থানে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে শরীক হন। এতে মুসলমানেরা বিজয় লাভ করে। কিন্তু উক্ত এলাকায় পাহাড়ি অঞ্চলে 'আল-হাশাশীন' নামক একটি গোষ্ঠী থাকত। তারা তাতারদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নারী ও শিশুদেরকে আটক করত এবং সম্পদ লুণ্ঠন করত। ইবনে তাইমিয়া তাদের সাথে ৭০৪ হিজরীতে যুদ্ধ করে জয়ী হন এবং তাদেরকে বশ্যতা স্বীকার ও ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য করেন।

ইবনে তাইমিয়া যেসময় জন্মগ্রহণ করেন, সেসময় তাতারদের আক্রমণে মুসলমানরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম দেশগুলোতেও ইসলামী অনুশাসন কার্যকর ছিল না। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়। তারা কৃষিকর্ম এবং স্বীয় কারখানায় কাজ করত। পুঁজিপতি ব্যবসায়ীরা মাল গুদামজাত করে মূল্য বৃদ্ধি হলে বিক্রয় করত। ফলে গরীব মানুষদেরকে প্রকৃত মূল্যের কয়েকগুণ বেশি দিয়ে কিনতে হতো। ইবনে তাইমিয়া সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলা ও লেখা শুরু করেন।

যুলুমের বিরুদ্ধে ইবনে তাইমিয়া প্রতিবাদী ছিলেন। তাই তিনি একাধিকবার নজরবন্দী ও কারানির্যাতনের শিকার হন। ৭১৭ হিজরীতে তালাক সংক্রান্ত একটি ফতোয়া দেওয়ার পর তদানীন্তন উলামায়ে কেরাম তাঁর ফতোয়ার বিরোধিতা করেন। ৭১৮ হিজরীতে সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর উপর ফতোয়া প্রদানে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়; কিন্তু ফতোয়া দেওয়া বন্ধ করেননি। ৭২০ হিজরীতে এ

কারণে তাঁকে পনেরো মাস আঠার দিন কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। ৭২১ হিজরীতে কারাগার থেকে মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি জ্ঞান-গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। চক্রান্তকারীরা সব সময় তাঁর বিরুদ্ধে লেগে থাকত। ৭২৬ হিজরীতে কবর যিয়ারত সংক্রান্ত একটি ফতোয়াকে কেন্দ্র করে তারা সরকারের কাছে ইবনে তাইমিয়ার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ দায়ের করে যে, তিনি নেক বান্দাহ ও রওযা যিয়ারতের বিরোধী। এ অভিযোগে তাঁকে ৭২৬ হিজরীর ১৬ শা'বান আবার আটক করা হয়। এ পর্যায়ে নির্যাতন শুধু তাঁর উপর সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁর ছাত্র এবং ভক্তদের উপরও নির্যাতন চালানো হয়। ইবনে কাছীর বলেন, ইবনে তাইমিয়া বন্দী থাকাবস্থায় তাঁর কাছে এ প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, তিনি যদি তাঁর কিছু আকীদা থেকে ফিরে আসেন তাহলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। এ সম্পর্কে হানাফী, শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবের তিন বিচারপতি তাঁর সাথে দীর্ঘসময় আলোচনা করেন। কিন্তু তিনি তাঁর আকীদা থেকে ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানান।

ড. মুহাম্মদ হরবী বলেন, 'ইবনে তাইমিয়া আল্লাহ প্রদত্ত অনেক গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তাঁর গুণাবলির মধ্যে রয়েছে:

১. অসাধারণ স্মৃতিশক্তি: তিনি কোন কিছু একবার শুনলেই মুখস্থ হয়ে যেত।
২. অধ্যবসায়: তিনি ছোট বেলা থেকে অন্যান্য ছেলেদের মতো খেলাধুলায় সময় ব্যয় করতেন না।
৩. স্বাধীন চিন্তা: তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতেন। মূলত এ চিন্তাশক্তিই তাঁকে এত সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে।
৪. বাগ্মীতা ও লেখনী শক্তি: ইবনে তাইমিয়া বিশুদ্ধ বাগ্মী এবং অনন্য লেখক ছিলেন। তিনি যা চিন্তা করতেন তা দ্রুত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারতেন।

মুজাদ্দিদে আলফেসানী শায়খ আহমদ সরহিন্দ (১৫৬৩-১৬২৪ খ্রি.)-এর কারাবরণ

শায়খ আহমদ সরহিন্দ ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় সম্রাট আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিল। আকবর প্রথম জীবনে ধার্মিক ছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে তিনি 'দীনে ইলাহী' নামক এক নতুন ধর্মনীতি চালু করেন। তাঁর ধর্মনীতি বিভিন্নভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। প্রথমত, সুফীবাদ ও শিয়া মতবাদ তাঁর উপর প্রভাব ফেলে। দ্বিতীয়ত, সমকালীন হিন্দু ধর্মযাজকদের ধর্ম সংস্কার আন্দোলন তাঁর উপর প্রভাব ফেলে। তৃতীয়ত, শেখ মোবারক ও তাঁর পুত্রদ্বয় শাইখ ফৈজী ও শাইখ আবুল ফজলের প্রভাব ছিল।

তিনি ১৫৭৫ সালে ধর্ম নিয়ে আলোচনার জন্য ফতেহপুরে এক ইবাদতখানা স্থাপন করেন। প্রথম পর্যায়ে শুধু মুসলিম আলেমরাই আমন্ত্রিত হতেন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টানসহ সকল ধর্মাবলম্বীরা আমন্ত্রিত হয়। তাঁরা আলাপ আলোচনা করে ১৫৭৯ সালে অভ্রান্ত মতবাদ বলে একটি মতবাদ চালু করেন। আর ১৫৮১ সালে দীনে ইলাহী নামক এক নতুন ধর্মমত প্রচার করেন।

আকবর মূলত রাজনৈতিক কারণে উক্ত ধর্ম শুরু করেন। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মের লোকজনককে একই ধর্মে এনে তাঁর ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। তিনি দীন ই ইলাহীকে জাতীয় ধর্মের রূপ দিতে প্রয়াস চালান। উক্ত ধর্ম প্রচার শুরু করার পর আকবর ইসলামবিরোধী হয়ে উঠে। সে মনে করত যে, ইসলাম বেদুঈনদের ধর্ম এবং তা সভ্যসমাজে উপযোগী নয়। ইসলামী আকীদা তথা রিসালাত, আখিরাত, হাশর, ওহী প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিদ্রূপ করত। কুরআন যে আল্লাহর কালাম– এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ এবং নবীর মিরাজকে অসম্ভব বলে মন্তব্য। এমনকি আহমদ ও মুহাম্মদ নাম নিয়েও (স) কটূক্তি করে। আকবর স্বার্থবাদী কিছু আলেমের সহযোগিতা নিয়ে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সংমিশ্রণে দীনে ইলাহী নামে এক নতুন ধর্মের সূচনা করে এবং 'লা ইলাহা ইলাল্লাহ আকবর খলীফাতুল্লাহ'- এ নতুন ধর্মের কালেমা হিসেবে ঘোষণা করে। এ সময় আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ বলার পরিবর্তে 'আল্লাহু আকবর' বলে সালাম দেওয়ার প্রচলন করা হয়। সালামের জবাব দানকারীকে বলতে হতো 'জাল্লা জালালুহু'। আকবরকে সিজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইসলামী কৃষ্টি-কালচার ও আইন কানুনের প্রতি ঘৃণা ছড়ানো হয়। দেশের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্মানুসারে ঘণ্টা বাজানো চালু করা হয় এবং হিন্দু ধর্মের অনুসরণে প্রতিকৃতি পূজা শুরু হয়। মুসলমানদের জন্য গরু জবাই নিষিদ্ধ করা হয় এবং মুসলমানদেরকেও সূর্যের উপাসনা, কপালে তিলক লাগানো, কোমর ও কাঁধে পৈতা বাঁধতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

সুদ, জুয়া ও মদকে হালাল ঘোষণা করা হয় এবং দাঁড়ি ছেঁচে ফেলার ফ্যাশন শুরু হয়। রাজ দরবারে মদ পান করার রেওয়াজ চালু হয়; আলেমদেরকেও রাজ দরবারে মদ পান করতে হতো। ইসলামের অনুমোদিত একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। ইসলামের নির্দেশের বিরোধিতা করে পুরুষদের জন্য রেশমের ব্যবহার বৈধ করা হয়। আকবর শুকরকে অতি পবিত্র প্রাণী হিসেবে ঘোষণা করে এবং সকালে ঘুম থেকে উঠার পর শুকর দর্শনকেই কল্যাণকর বলে ঘোষণা দেয়। মুসলমানদের মৃতদেহ কবরে দেয়ার পরিবর্তে আগুনে পুড়ে ফেলা বা পানিতে ভাসিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কোন মুসলমান তার মৃত আত্মীয়কে কবরস্থ করতে চাইলে উক্ত মাইয়েতের পা কিবলার দিকে দিয়ে কবর দিতে বলা হতো। আরবি ভাষা

শিক্ষা ও ফিক্‌হ চর্চাসহ দীনি ইলম চর্চার পরিবর্তে দর্শনসহ আধুনিক জ্ঞান চর্চার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

শত চেষ্টা করেও আকবর তার নতুন ধর্ম প্রচারে সফল হয়নি। তার জীবদ্দশায় মাত্র আঠারজন ব্যক্তি উক্ত ধর্ম গ্রহণ করে। তাঁর মৃত্যুর পর তারা নিজ নিজ ধর্মে ফিরে যায়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মুজাদ্দিদে আলফেসানী শায়খ আহমদ সরহিন্দ এর ভূমিকা ছিল মুখ্য। তিনি আকবরের দীন-ই ইলাহীকে দীন থেকে বিচ্যুতি বলে অভিহিত করেন এবং তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে আকবর তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয় এবং তাঁকে কারারুদ্ধ করে। তবে আলফেসানী সরকারের রোষাণলে পড়েও আদর্শ প্রচার থেকে বিরত হননি।

জামাল উদ্দিন আফগানীর (১৮৩৯-১৮৯৭) নির্বাসন

জামাল উদ্দিন আফগানী মুসলিম বিশ্বের এক গভীর সংকটকালে জন্মগ্রহণ করেন এবং জাতিকে সংকট উত্তরণে দিক নির্দেশনা দান করেন। এ সময়ে অনেকেই নীরব দর্শক থাকেন কিংবা সমালোচনা করেই দায়িত্ব শেষ করেন। কিন্তু আফগানী নীরব দর্শক বা নেহায়েত সমালোচক না হয়ে তাঁর মেধা ও যোগ্যতা সংকট উত্তরণে নিয়োজিত করেন। তিনি মুসলিম বিশ্বের ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি স্থাপনের প্রতি গুরুত্ব দেন। তিনি ছিলেন বিশ্বপ্যান ইসলামী আন্দোলনের পথিকৃৎ। প্যান ইসলামীজমের মূল কথা ছিল–

১. সকল মুসলিম রাষ্ট্র নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঐক্যজোট গঠন করবে।

২. নিজেদের মধ্যে একটি যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

৩. একে অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।

আফগানী রাজতন্ত্র কিংবা পশ্চিমা গণতন্ত্রের পরিবর্তে সামাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক কল্যাণমূলক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে প্রয়াস চালান। তিনি মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। আফগানী মনে করতেন, আলেমদের দায়িত্ব অনেক বেশি। কিন্তু একশ্রেণীর আলেম উক্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম নন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমাদের আলেমদের সবচেয়ে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হলো তাঁরা ইসলাম রক্ষার নামে আধুনিক জ্ঞানার্জনের পথে বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সাথেই শত্রুতা করেন। অথচ ইসলাম হচ্ছে, জ্ঞান ও শিক্ষার সবচেয়ে সহায়ক আদর্শ।'

আফগানী একজন সংস্কারক ছিলেন। কিন্তু তিনি সমাজ সংস্কার আন্দোলনে একশ্রেণীর আলেমদের প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হন। এভাবে অব্যাহত বাধার সম্মুখীন

হয়ে তিনি ভারত থেকে তুরস্কে চলে যান। তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী আলী পাশা তাঁকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। কিন্তু একপর্যায়ে স্বার্থান্বেষী কতিপয় আলেম তাঁর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষেপে যায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে সুলতানের কাছে অভিযোগ দেয়। সুলতান আব্দুল হামীদ প্রশাসনিক শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে আফগানীকে তুরস্ক ত্যাগের নির্দেশ দেন। তুরস্ক থেকে বিতাড়িত হয়ে আফগানী কায়রো চলে যান এবং সেখানে সেবা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি নিয়ে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যুবসমাজকে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে মিসরবাসীর মাঝে এক জাগরণ সৃষ্টি হয়। ফলে ফরাসী ও ইংরেজরা আফগানীকে তাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ মনে করে। তাদের চাপে মিসর সরকার আফগানীকে মিসর ত্যাগের নির্দেশ দেয় এবং ১৮৭৯ সালে তাঁকে ভারতে নির্বাসনে পাঠায়। কিন্তু নির্বাসিত জীবনের সকল বাধা উপেক্ষা করে আফগানী মুসলমানদের মাঝে তাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

বালাকোটে সাইয়েদ আহমদ বেরলভীর শাহাদাত

শাহ ওয়ালিউল্লাহর চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে সাইয়েদ আহমদ বেরলভী ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন শুরু করেন। তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের জীবনে যেসব অনাচার ও বিদআত ঢুকে পড়ে সাইয়েদ আহমদ বেরলভী সেগুলো সংস্কারের প্রয়াস চালান। এ সময় মোগল সাম্রাজ্যের এক বিরাট অংশে মারাঠাগণ হাঁটু গেড়ে বসে। তখন উপমহাদেশের মুসলমানদের সামনে তিনটি পথ খোলা ছিল:

১. সত্য পথ ত্যাগ করে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলা। মূলত এ পথ হচ্ছে মৃত মুসলমানদের জন্য।
২. সত্য পরিত্যাগ না করা এবং এ কারণে যত বিপদই আসুক না কেন তা ধৈর্যসহকারে মোকাবেলা করা। এ পথ হচ্ছে যারা মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকার আশায় তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে চায় তাদের জন্য।
৩. অসত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। এ পথ হচ্ছে বীরের মতো বেঁচে থাকার পথ। এ পথ মুজাহিদদের পথ।

সাইয়েদ আহমদ বেরলভী মুসলমানদের সেই দুর্যোগময় সময়ে তৃতীয় পথটিই বেছে নেন। তাঁর প্রধান কাজ ছিল, আল্লাহর বান্দাহদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান জানানো এবং তাদের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করা। তিনি তরীকায়ে মুহাম্মদী নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং লেখনীর মাধ্যমে তাঁর সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে জনগণের মাঝে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেন।

এজন্য তিনি ব্যাপক সফর করেন। ১৮২১ সালে কলকাতায় আসেন। বাংলার ওলামায়ে কেরামসহ সর্বস্তরের মানুষ তাঁর সান্নিধ্যে এসে বাইআত গ্রহণ করেন। তখন সীমান্তের মুসলিম জনবসতির উপর শিখদের নির্যাতন চরম পর্যায়ে পৌঁছে। তারা মসজিদে আযান বন্ধ করে দেয় এবং গরু জবেহকে বেআইনী করে। তাদের যুলুম সীমার বাইরে চলে গেলে ১৮২৬ সালে বেরলভী হাজার হাজার অনুসারী নিয়ে শিখদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তাঁকে ব্রিটিশ, শিখ ও হিন্দু– এ তিন শক্তির মোকাবেলা করাসহ অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়।

১৮২৮ সালে কঠিন সংকটকালে বাংলাদেশ থেকেই জনশক্তি ও আর্থিক সাহায্য করা হয়। তাঁর আন্দোলনকে সহযোগিতা করার জন্য বাংলার মুসলমানদের ঘরে ঘরে মুষ্টি চাল রাখার ব্যবস্থা চালু হয়। মুসলিম মহিলারা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মহিলারা তাদের অলংকার ও কৃষক তাদের গরু বাছুর বা জমি বিক্রয় করে আর্থিক সাহায্য পাঠায়।

সৈয়দ সাহেব সীমান্তের বিরাট এলাকায় ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। শরীয়তের বিধান চালু হবার পর পুরো এলাকায় শান্তি নেমে আসে। একের উপর অন্যের যুলুম বন্ধ হয়। উশর, যাকাত, খারাজ আদায় ও বণ্টনের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু কিছু দিন পর উক্ত ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হয়। সৈয়দ সাহেব কর্তৃক উশর ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর মোল্লাদেরকে চাঁদা দেওয়ার নিয়ম বাতিল হয়ে যায় এবং স্থানীয় সরদারদের কর্তৃত্ব লোপ পায়। এরা ইচ্ছামতো জনগণকে শোষণ করার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

কতিপয় মোল্লা ও সরদার ইংরেজ ও শিখদের সাথে গোপনে যোগাযোগ করে সৈয়দ সাহেবের বিরুদ্ধে নানা ধরনের প্রচারণা চালায়। এমনকি তাঁকে ইংরেজদের চর হিসেবেও আখ্যায়িত করে জনসাধারণের নিকট প্রচার করা হয় যে, সৈয়দ সাহেবের সহযোগিতার পরিবর্তে তাঁর বিরোধিতাই হচ্ছে ইসলামের বড় খিদমত। ইংরেজ সরকার এবং শিখরা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। তারা তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে বিভিন্নস্থানে মুজাহিদদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে। কাউকে ঘুমের মধ্যে আর কাউকে নামাযের মধ্যে কিংবা পথ চলার সময় হত্যা করা হয়। বিভিন্নস্থানে রক্ষিত খাদ্যগুদাম লুট করা হয়। এমতাবস্থায় তিনি পাঞ্জতর থেকে হিজরত করেন।

সে সময় কাশ্মীরের কিছু মুসলিম সরদার কাশ্মীরের নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য সৈয়দ সাহেবের প্রতি অনুরোধ করেন। তাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে সৈয়দ সাহেব তাঁর অনুগত

বাহিনী নিয়ে বালাকোট পৌছেন। তখন উক্ত অঞ্চলে শিখ বাহিনীর সেনাপতি ছিল শের সিংহ। তার সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল মুসলমানদের কয়েকগুণ বেশি। শের সিংহ সৈয়দ সাহেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। এ ধরনের কঠিন অবস্থায় সৈয়দ সাহেব আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে শত্রুর মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৩১ সালের ৬ মে বালাকোট ময়দানে শের সিংহের বাহিনীর সাথে সৈয়দ আহমদ বেরলভীর অনুসারীদের প্রচণ্ড লড়াই হয়। উক্ত যুদ্ধে সাইয়েদ আহমদ বেরলভী ও মাওলানা শাহ ইসমাঈলসহ দুই শতাধিক মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন।

তিতুমীরের শাহাদাত (১৭৮২-১৮৩১)

মাওলানা সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর ছিলেন ইসলামী জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি সাইয়েদ আহমদ বেরলভীর খলীফা হিসেবে ইংরেজ ও হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারের মোকাবেলায় জনগণকে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন এবং ইসলামী অনুশাসনের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের জন্য সবাইকে আহ্বান জানান। মুসলমানী নাম রাখা, ধুতি ছেড়ে লুঙ্গি পরা, এক আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা, কুরআন ও হাদীসের খেলাফ কাজ বন্ধ করা ছিল তাঁর আন্দোলনের মূল কর্মসূচি। ফরিদপুরের নারকেল বাড়িয়ার একটি মসজিদকেন্দ্রিক তাঁর সমাজ সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত হয় এবং ইসলামী শাসনের ভিত্তিতে স্বাধীন ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালান।

তিতুমীর শান্তিপূর্ণভাবে তাঁর আদর্শ প্রচার করলেও ইংরেজদের এজেন্ট হিন্দু জমিদারগণ চক্রান্ত করে উক্ত শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য মুসলমানদের উপর যুলুম বাড়িয়ে দেয়। ফলে তিতুমীরের সাথে ইংরেজ ও হিন্দু জমিদারদের যুদ্ধ শুরু হয়। বিভিন্ন খণ্ডযুদ্ধে ইংরেজ ও জমিদারদের পরাজয় হয়। কিন্তু ১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর এক যুদ্ধে ইংরেজদের কামানের গোলার আঘাতে তিতুমীর তাঁর পুত্র জওহর আলীসহ অনেকেই শাহাদাত বরণ করেন। প্রধান সেনাপতি গোলাম মাসুমসহ তিন শতাধিক বন্দী হন। পরবর্তীতে গোলাম মাসুমকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

সিপাহী বিপ্লব ও হাজারো মুসলমানের শাহাদাত

১৮৫৭ সালে ভারতে ইংরেজবিরোধী আন্দোলন তুমুল পর্যায়ে উন্নীত হয়। এ সময় দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহ এক ফরমানের মাধ্যমে বিদেশি সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানায়। উক্ত আহ্বানে জনগণ বিপুলভাবে সাড়া দেওয়ায় ইংরেজদের ক্ষমতার ভীত নড়ে

উঠে। তারা স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের উপর যুলুম-নির্যাতন চালায়। ১৮৫৭ সালে লালবাগের কেল্লা হাজারো মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত হয়। লালবাগের যে স্থানটিতে স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের রক্ত ঝরে, সেই স্থানটিকে পরবর্তীতে ইংরেজরা কারাগারে পরিণত করে। ইংরেজদের হাতে বন্দী বিপ্লবী মুসলমানদের অনেককেই বিচারের নামে প্রহসন করে গাছের সাথে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। এভাবে নিষ্ঠুরভাবে হাজার হাজার মানুষকে ফাঁসি দেওয়া হয়। সে সময় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসে দন্ডিতদের সংখ্যাই ছিল দশ হাজারের বেশি। আন্দামানে বন্দী ফজলে হক খায়রাবাদী লিখেন, 'স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণের অভিযোগ প্রমাণিত হলেই হিন্দুদেরকে আটক করা হতো; আর মুসলমানদেরকে হত্যা করা হতো।'

১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর মুসলমানদের রাজনৈতক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে। ইংরেজরা বিপ্লবের জন্য একমাত্র মুসলমানদেরকেই দায়ী করে তাদের ওপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালাতে থাকে। বিপ্লবে নেতৃত্বদানকারী ওলামায়ে কেরাম ও সাধারণ মুসলমানদের অনেকই ইংরেজদের রোষাণলে পড়ে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলেন। কেউ মাল্টা বা আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত হন। কেউ দীর্ঘকাল যাবৎ কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অন্তরীণ থেকে তিলে তিলে নিঃশেষ হন।

মাওলানা বদিউজ্জমান সাঈদ নুরসীর কারাবরণ

বিংশ শতাব্দীতে যে কয়েকজন ইসলামী চিন্তাবিদ মুসলিম উম্মাহর দুর্দশার কারণ নির্ণয় করে উম্মাহকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, বদিউজ্জমান সাঈদ নুরসী তাঁদের অন্যতম। তুরস্কে যখন উসমানীয় খিলাফতের বিলুপ্তি ঘটিয়ে কামাল আতাতুর্ক সেক্যুলার তুরস্ক প্রতিষ্ঠা করেন, সেই কঠিন সময়ে নুরসী মুসলমানদের হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ অনুসরণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। নুরসীর সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পরিচয় তাঁর 'রেসালায়ে নুর'-এ চমৎকারভাবে বিধৃত আছে।

সাঈদ নুরসী ১৮৭৬ সালে পূর্ব তুরস্কের বিতলিস প্রদেশের নুরস গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মির্জা ও মাতার নাম নুরীয়া। তিনি তাঁর প্রাথমিক জীবন গ্রামেই কাটান। সাঈদ নুরসী যখন বড় হন তখন তুরস্কে সুফীজমের প্রভাব ছিল। সাঈদের পরিবার নকশবন্দী তরিকাতে দীক্ষা নেন। আব্দুল কাদের জিলানীর কাদেরিয়া সুফী দর্শনের সাথেও তিনি পরিচিত ছিলেন। সুফীজমের প্রভাব তাঁর জীবনে থাকলেও তিনি প্যান-ইসলামীজমের প্রভাবে বেশি প্রভাবান্বিত ছিলেন। তাই খানকাহভিত্তিক আধ্যাত্মিকতা চর্চার মধ্যে তাঁর তৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিল

না। তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনও পরিচালনা করেন এবং ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সমাজের কোথায় কিভাবে কুসংস্কার প্রবেশ করেছে তা তুলে ধরেন এবং কুসংস্কার দূরীকরণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান।

নুরসী ছিলেন সত্য প্রতিষ্ঠায় আপসহীন ও অকুতোভয়। একবার বিলতাগের গভর্নর তাঁকে গভর্নরের বাসভবনে দাওয়াত দেন। নুরসী গভর্নরের বাসভবনে যাওয়ার পর বুঝলেন যে, গভর্নরের রুমে কিছু কর্মকর্তা মদ্যপানের আসর জমিয়েছে। নুরসী সোজা উক্ত রুমে গিয়ে মদ পানের জন্য সকলকে ভর্ৎসনা করেন এবং এ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীস শোনান। এ সময় একজন এডিসি নুরসীকে বলেন, 'গভর্নরকে এভাবে অপমানিত করার জন্য আপনার মৃত্যুদণ্ড হতে পারে।' নুরসী সোজা উত্তর দেন, 'যদি এ কারণে মৃত্যুদণ্ড হয় তাহলে তা হবে আল্লাহর আইনের মর্যাদা রক্ষার জন্য। এতে ক্ষতির কিছু নেই।' অবশ্য গভর্নর তার কৃতকর্মের জন্য নুরসীর কাছে ক্ষমা চান।

নুরসী শিক্ষা সংস্কারেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি মনে করতেন যে, বিজ্ঞান শিক্ষার অভাব মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে সংকীর্ণমনা করে তোলে আর ধর্মশিক্ষার অভাব স্কুল-কলেজের ছাত্রদেরকে উগ্র ও অশালীন করে তোলে। তাই তিনি উভয় ধারার মাঝে সমন্বয় সাধন করে শিক্ষাব্যবস্থার একটি নতুন রূপরেখা তুলে ধরেন।

নুরসী ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রতি তুর্কীদের অনুরাগ দেখে ব্যথিত হন। তাঁর মতে, 'আমরা ইউরোপের ভাল দিকগুলো নিতে দ্বিধা করব না, আমাদের অগ্রগতিতে গতি সঞ্চারের জন্য। কিন্তু আমরা আমাদের সমাজের সীমানায় শরীয়তের তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, যাতে ইউরোপীয় সংস্কৃতির পাপাচার আমাদের সীমানায় ঢুকতে না পারে। আমাদের তরুণ প্রজন্ম শরীয়তের শীতল পরশ থেকে যেন বঞ্চিত না হয়।'

তুরস্কে উসমানীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু কামাল আতাতুর্ক ১৯২৪ সালে খিলাফত বিলুপ্ত করে সেক্যুলার তুরস্ক প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের সকল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। খিলাফতের সময় বিচার বিভাগে অনেক আলেম বিচারপতি ছিলেন। আতাতুর্ক বিচার বিভাগ থেকে সকল আলেমকে বরখাস্ত করেন। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে যেসব ধার্মিক আমলা ছিল তাদেরকে চাকরিচ্যুত করেন। আইন করে মাদ্রাসাসমূহের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে দেন। তুরস্কের আদি হরফ ছিল আরবি। কিন্তু আরবি হরফের পরিবর্তে ল্যাটিন হরফে লেখা বাধ্যতামূলক করা হয়। আরবি হরফ লেখা নিষিদ্ধ করেই সরকার ক্ষান্ত

হয়নি। একই আইনে কুরআন সংরক্ষণ, শিক্ষাদান ও অধ্যয়ন একই ধরনের অপরাধের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। টুপি ও দাঁড়ি নিষিদ্ধ করা হয়। টুপি মাথায় কাউকে দেখলেই গ্রেফতার করা হতো। স্কুলের ছোট ছোট শিশুদেরকেও টুপির পরিবর্তে ইউরোপীয় হ্যাট পরিধান করতে দেওয়া হতো। একটি স্কুলে এভাবে টুপি খুলে হ্যাট পরিধান করানো হলে শিশুরা হ্যাট খুলে তা উক্ত রক্ষীর দিকে ছুড়ে মারে। এ খবর আতাতুর্কের কাছে গেলে সে উক্ত স্কুলের সকল শিশুকে স্কুলের পিছনে একটি ঝর্নার কাছে দাঁড় করিয়ে হত্যার নির্দেশ দেয়। এভাবে অকালে ঝরে পড়ে অসংখ্য নিষ্পাপ শিশুর জীবন। ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসে নামাজ পড়া, আযান দেওয়া ও খুতবায় আরবি ভাষা ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। শুক্রবারের পরিবর্তে শনি ও রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা করা হয়। স্কুল, কলেজ, মসজিদ, হাসপাতাল সর্বত্র আতাতুর্ক-এর মূর্তি তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়। এভাবে তুরস্কে শুরু হয় পৌত্তলিকতার চর্চা। মুসলমানদের জন্য আরবি নাম রাখা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৩৪ সালে মোস্তফা কামালের নাম আতাতুর্ক হয় এবং এ নাম অন্য কারো জন্য রাখা নিষিদ্ধ ঘোষণা হয়।

আতাতুর্ক মদ পানকে জাতীয়করণ করেন। মদকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আনার জন্য ব্যাপকভাবে মদের লাইসেন্স দেওয়া হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, মদের বাণিজ্যের মাধ্যমে তুরস্কের অর্থনীতি মজবুত হবে। সে সময় গ্রীন সোসাইটি নামক একটি সংগঠন উক্ত ঘোষণার বিরোধিতা করে এবং কুরআনের নির্দেশনাসহ মদের সামাজিক ক্ষতির কিছু দিক তুলে ধরে পুস্তিকা প্রকাশ করে। সরকার উক্ত সংগঠন নিষিদ্ধ করে এবং সংগঠনের সদস্যদেরকে গ্রেফতার করে তাদের উপর নির্যাতন করে।

সেই কঠিন সময়ে নুরসী তার অনুসারীদেরকে শান্তিপূর্ণ পন্থায় ইসলামের মর্মবাণী তুলে ধরার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'এদেশের সন্তানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর না। শরীয়ত কখনও এর অনুমতি দেয়নি। আমাদের কাজ হচ্ছে, সব বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে জনগণের কাছে কুরআনের মর্মবাণী পৌছে দেওয়া ও পুরো জাতির আমূল পরিবর্তন। হতে পারে তারা জ্ঞানের অভাবে মুর্খ হয়েছে; কিন্তু তারাও তোমার ভাই। তাদের বুঝানোর কাজই করা উচিত।' নুরসীর এ আহ্বান সত্ত্বেও তুরস্কে আতাতুর্কের সেক্যুলার দর্শনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ হয়। উক্ত বিদ্রোহ দমনে আতাতুর্ক হাজারো আলেম, মুফতি, ইমাম, নেতা ও ইসলামপ্রিয় জনতাকে হত্যা করে। এ সব হত্যাকাণ্ডের বিবরণ কোন বইতে লেখা নেই। কেননা আতাতুর্কের বিরুদ্ধে কিছু লেখা তুরস্কে কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়ায় কেউ তা লিখতেও

সাহস করেনি। অথচ অসংখ্য আলেম ও মুসল্লীকে জাহাজে করে সমুদ্রে নিয়ে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। ইস্তাম্বুলের রাস্তার প্রতিটি লাইটপোস্টের সাথে অনেক আলেমের লাশ দিনের পর দিন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। এখনও তুরস্কের বিভিন্ন স্থানে অনেক গণকবর রয়েছে, যা ঐ সময়ের অত্যাচারের নীরব সাক্ষী হয়ে আছে।

ইসলামের কথা বলার কারণে অনেক আলেমকে গ্রেফতার করে বিশেষ ট্রাইবুনালে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। সে সময় নুরসীকেও গ্রেফতার করা হয়। অন্তরীণ থাকার সময় নুরসী তার এক অনুসারীকে বলেন, 'ভয় পেয়ো না। আমাদেরকে যে দুর্যোগ আক্রান্ত করেছে তা স্বল্প সময়ের। একটিমাত্র বিষয় তোমরা যত্নের সঙ্গে মনে রাখবে যে, তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে ইসলামের সঠিক শিক্ষা দাও। নতুবা তোমরা এই মহামূল্যবান দীন অবিলম্বে হারাতে বসবে।'

তুরস্কে টুপি নিষিদ্ধ করা হলেও নুরসী কখনই টুপি নিষিদ্ধ আইন মান্য করেননি। একবার আংকারার গভর্নর তাঁকে টুপি খুলে ইউরোপীয় হ্যাট পরিধান করতে বললে তিনি বলেন, 'প্রয়োজনে এই টুপি ও মাথা এক সঙ্গে মাটিতে পড়বে। তারপরও আমি তোমাদের কথা অনুসরণ করব না।' তাঁর এই মন্তব্য শুনে গভর্নর ক্ষীপ্ত হয়ে তাঁকে আবারও কারাগারে প্রেরণ করেন। কারাগারে নুরসীর সাথে কেউ দেখা করতে এলে তাকেও লাঞ্ছিত করা হতো। নুরসীকে কষ্ট দেওয়ার জন্য ঠাঁসাঠাসিও করে একটি অন্ধকার কুঠুরীতে রাখা হয়। উক্ত কক্ষে কোন আলো বা বাতাস যেত না। ইঁদুরের উৎপাত ও মশার কামড়ে রাত যাপন কঠিন ছিল। কিন্তু নুরসী সকল অত্যাচার সহ্য করেন কিন্তু দীনের ব্যাপারে আপস করেননি। তাঁকে কারাগারে ভয়ানক দাগি আসামিদের সাথে রাখা হতো। কিন্তু তিনি তাদের সাথে মধুর ব্যবহার করতেন। ফলে তারা তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ত। নুরসীর উপর কারাগারে অমানবিক ব্যবহারের পাশাপাশি নানাভাবে মানসিক কষ্ট দেওয়া হতো। তিনি শাইখুল ইসলামের যে দফতরে কুরআনের ভাষ্য প্রদানের কাজ করতেন উক্ত দপ্তরকে প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের সাজসজ্জা ও খেলাধুলার জায়গা করা হয়।

শত যুলুম সত্ত্বেও নুরসীর মনোবল এক বিন্দুও কমেনি। জেলখানা থেকেই তাঁর অনুসারীদের জন্য দিকনির্দেশনা পাঠাতেন। এভাবেই রচিত হয় তাঁর অমর কীর্তি রেসালায়ে নুর। তিনি ছোট ছোট কাগজে বা পাতায় লিখে তাঁর অনুসারীদের নিকট গোপনে পাঠাতেন। আর তাঁর অনুসারীরা উক্ত রেসালায়ে নুর পাঠ করে নুতন জীবনীশক্তি খুঁজে পেত। সরকার রেসালায়ে নুর ধ্বংস করার চক্রান্ত করে। কিন্তু তার অনুসারী নারী-পুরুষরা নুরসীর লেখা সংরক্ষণে ত্যাগের নাজরানা স্থাপন করেন। অনেকে নিজেদের স্মৃতিতে ধারণ করার চেষ্টা করেন। কেউ কেউ তাঁর লেখনী মাটির কলসের ভিতর ঢুকিয়ে মাটিতে পুঁতে রেখেছেন, যা পরবর্তীতে

আবিষ্কৃত হয়েছে। রেসালায়ে নুর পাঠ করা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষণা দেয়ার পরও ছোট ছোট হালকা করে রেসালায়ে নুর পাঠ করা হতো। অবশ্য এজন্য অনেককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কারো কাছে রেসালায়ে নুর পাওয়া গেলে তাকে গ্রেফতার করে প্রচণ্ড নির্যাতন করা হতো।

শহীদ হাসানুল বান্নার শাহাদাত বরণ

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মিসরের তথা অধিকাংশ আরব দেশগুলোর অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলাম ও মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে প্রকাশ্যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হতো। চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে মুসলিম নামধারী পাশ্চাত্যের এজেন্টরা কুরআন সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। তারা অবাধ নারী স্বাধীনতার দাবি তোলে। দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে খোদার জানাযা করা হয় (নাউযুবিল্লাহ)। ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্রের চেষ্টা হতে থাকে। এমতাবস্থায় হাসানুল বান্না সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসেন। ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে একদল সচেতন ব্যক্তি তাঁর বাসায় মিলিত হন। তাঁরা মুসলমানদের ঈমান-আকীদা রক্ষার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ ও কুরবানী করার বায়আত গ্রহণ করেন। এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় ইখওয়ান আল মুসলীমুন। আর হাসানুল বান্না নির্বাচিত হন প্রতিষ্ঠাতা মুর্শিদে আম।

হাসানুল বান্না ছিলেন একনিষ্ঠ দাঈ। মসজিদ-বাজার, বাস-ট্রেন যখন যেখানেই থাকতেন সেখানেই তিনি দাওয়াতী কাজ করতেন। ছোট বেলায় ছাত্রদের চরিত্র গঠনের জন্য জমিয়তে আখলাকে আদাবিয়া নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে ছোট বেলা থেকেই দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। ১৪ বছর বয়সে সেবা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে খ্রিস্টান মিশনারীদের তৎপরতা প্রতিরোধে চিকিৎসাসহ গরীব মানুষদেরকে নানাভাবে সহযোগিতা করতেন। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় জমিয়তে মাকারিমে আখলাকিয়া গঠন করেন। যারা মসজিদে আসতো না এমনকি মদের আসরে আড্ডা দিত তাদের কাছে গিয়ে দীনের দাওয়াত দিতেন। তাঁর সব সময় ফিকির ছিল কিভাবে আল্লাহর দীনের কথা মানুষদের কাছে উত্তমভাবে তুলে ধরা যায়। তিনি একদিকে মসজিদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসল্লীদের মাঝে ইসলামের কথা বলতেন অপরদিকে ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে যুবকদেরকেও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারা ছিলেন তাদের কাছেও ইসলামের আলোকে রাষ্ট্রীয় সংস্কারের দাওয়াতসহ চিঠি প্রেরণ করেন।

হাসানুল বান্না অল্প সময়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। বিশেষভাবে ইংরেজদের সুয়েজখাল দখলের বিরুদ্ধে স্বাধীন মিসর চাই শ্লোগান ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়। ইখওয়ান ও হাসানুল বান্নার জনপ্রিয়তায় ইংরেজ ও তাদের মদদপুষ্ট সরকারের ভীত নড়ে উঠে। সরকার ভীত হয়ে ইখওয়ানকে নিষিদ্ধ করে। ইখওয়ানের হাজারো নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে প্রচণ্ড নির্যাতন চালায়। অনেককে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয়। কাউকে কাউকে নগ্নদেহে ছাদে লটকিয়ে গায়ে গরম পেট্রল ঢেলে দেওয়া হতো। একটি রুমে লোহার শিকলে পা বেঁধে রেখে উক্ত রুমে শিকারী কুকুর ছেড়ে দেয়া হতো। ভায়ের সামনে বোনকে বিবস্ত্র করা হতো। জেলে তাদের সামনে অন্যদেরকে খানা দেওয়া হতো আর তাদেরকে অবিরাম ক্ষুধার্ত রাখা ছিল মামুলি ব্যাপার। এছাড়া গুপ্ত হত্যা ও ফাঁসি দিয়ে অনেক নেতাকে শহীদ করা হয়।

হাসানুল বান্নাকে ১৯৪৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আততায়ীর মাধ্যমে হত্যা করা হয়। হত্যা করার পর তাঁর লাশ ইখওয়ানের কোন নেতা-কর্মীকে দেখতে দেওয়া হয়নি। লাখো ভক্তদের কাউকে জানাযায় শরীক হবার অনুমতি দেওয়া হয়নি। সেনাবাহিনীর ট্যাংক ও সাঁজোয়া বাহিনীর প্রহরায় তার লাশ বাড়ির মহিলারাই কবরে নিয়ে যায়। আর ভক্তরা নীরবে চোখের পানি ফেলে, কিন্তু তাদের প্রিয় নেতাকে শেষ মুহূর্তেও একবারের জন্য দেখার সুযোগ পায়নি। এভাবেই বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ হাসানুল বান্না শহীদ আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান।

হাসানুল বান্না আজ নেই, কিন্তু তিনি আমাদের প্রেরণার উৎস। আমরা যারা দীনের দাওয়াত দিতে চাই তাদের চিন্তা করা উচিত আমাদের মাঝে কি হাসানুল বান্নার মতো পেরেশানী আছে? আমরা দীনকে যতটুকু বুঝেছি তাকি দরদভরা মন নিয়ে মুসলিম-অমুসলিম সকলের কাছে পৌছানোর চেষ্টা করি? আমাদের দাওয়াতী কাজে মনের আবেগ ও জজবা কতটুকু সম্পৃক্ত?

সাইয়েদ কুতুবের কারাবরণ ও শাহাদাত

সাইয়েদ কুতুব আর দশটি সাধারণ নামের মতো একটি নাম হলেও অসাধারণ এই নাম। এ নামের মানুষটির ঈমানী মিনার এজন্য অনেক উঁচু। যে কোন চক্ষুস্মানের নজরে এর শীর্ষ বিন্দু নজরে পড়বে। এ মিনার ঈমানের দীপ্তিতে দেদীপ্যমান। এ থেকে ঈমানের দীপ্তিই বিচ্ছুরিত হতে থাকবে অনাদি অনন্তকাল। আঁধারবিনাশী এই দীপ্তি তো আল্লাহরই দান। যারা সাইয়েদ কুতুব নামের ব্যক্তিত্বকে ঈমানে, চরিত্রে, তাঁর জেহাদী জিন্দেগী এবং শাহাদাত বরণের ঘটনার মাধ্যমে চিনেছেন,

জেনেছেন, পরিচিত হয়েছেন, তারা এ মহান ব্যক্তিত্বকে হৃদয়ে ঠাঁই না দিয়ে পারবেন না। কারণ তিনি শির দিয়েছেন, কিন্তু ঈমানের আমামা দেননি, তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন, কিন্তু প্রাণভিক্ষা চাননি, বাতিল শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। মিসরের ফেরাউনী শক্তির কাছে মাথানতও করেননি।

মিসরেই সাইয়েদ কুতুবের জন্ম। ১৯০৬ সালে মিসরের উসয়ূত জেলার মুশা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সাইয়েদ তাঁর নাম। কুতুব তাঁদের বংশীয় উপাধি। কুতুব পরিবার ছিল খুবই দীনদার। এ পরিবারের পিতা হাজী ইবরাহীম কুতুব ও মাতা ফাতেমা হুসাইন ও ওসমানের স্নেহ পরশে সাইয়েদ লালিত-পালিত হন।

সাইয়েদ কুতুব মিসরের উসয়ূত জেলার মুশা গ্রামের ছায়া সুনিবিড় সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় হন। পনেরো বছর পর্যন্ত গ্রামেই কাটান। তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী। তাঁর স্মরণ শক্তি ছিল খুবই প্রখর। মায়ের আগ্রহে গ্রামের মকতবে কুরআন হিফজ করেন। সে সময়ে মিসরের দীনদার পরিবারে কুরআন হিফজের ঐতিহ্য ছিল। বিশেষত, যারা আল আজহারে তাদের সন্তানদের পড়াশুনায় আগ্রহী ছিল, তাদের সন্তানদের কুরআন হিফজ বাধ্যতামূলক ছিল। সাইয়েদ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯১২ সালে মাদ্রাসাই তাজহিযিয়াতে ভর্তি হন। ১৯১৮ সালে সাইয়েদ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তের পর দু'বছর পড়া বন্ধ থাকে। ১৯২০ সালে সাইয়েদ কায়রো যান। তিন বছরের শিক্ষা কোর্স ১৯২৪ সালে শেষ করেন। ১৯২৫ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা আত তাজহিযিয়াতে ভর্তি হন। চার বছরের এ শিক্ষা কোর্স ১৯২৯ সালে সমাপ্ত হয়। এখানে আরবি ভাষা, ফেকাহ, ইসলামী শিক্ষা, কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ভূগোল, ইতিহাস, জীববিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। ১৯২৯ সালের শেষ দিকে দারুল উলুম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। চার বছর এখানে কাটান। ১৯৩৩ সালে তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্যে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন।

সাইয়েদ কুতুব ১৯৩৩ সালে শিক্ষক হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করেন। ১৯৪০ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। সেখানে আরবি ও সংস্কৃতি বিভাগ দেখাশুনা করতেন। অতঃপর অনুবাদ বিভাগে বদলি হন। ১৯৪৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব পান। সংশিষ্ট মন্ত্রীর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। কিছুদিন যাওয়ার পর ১৯৪৫ সালে এপ্রিল মাসে সাংস্কৃতিক দফতরে স্থানান্তরিত হন। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এখানে কর্মরত ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ৩ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আমেরিকা গমন করেন।

সাইয়েদ কুতুব ১৯১৯ সালের জাতীয় আন্দোলনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ১৭ বছরের অধিক সময় হেযবুর ওয়াফদের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল। পরবর্তীতে উক্ত সংগঠন ত্যাগ করেন। তাঁর মতে, আগামী দিনের সঠিক নেতৃত্বের জন্য নতুন বংশধরদের চরিত্র গঠন প্রয়োজন। এ জাতীয় আন্দোলনে চারিত্রিক সংশোধনের কর্মসূচি নেই। উক্ত সংগঠন ত্যাগের পর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও একাডেমিক ক্ষেত্রে সংশোধনের প্রচেষ্টা চালান। ইখওয়ানে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দাওয়াত ও ইসলাহের কাজ করেন। ১৯৫২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চাকুরি থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ইখওয়ানে যোগ দেন। তিনি ১৯৫৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ইখওয়ানে যোগদান করলেও আরও আগে থেকেই ইখওয়ান সম্পর্কে জানতেন। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 'স্বাধীন মিসর চাই' ইখওয়ানের এ স্লোগান ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। দু'বছরে ইখওয়ানের কর্মী সংখ্যা ২৫ লাখে পৌঁছে। সমর্থক ও সহযোগীদের সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। সাথে সাথে ষড়যন্ত্র ও নির্যাতন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ইখওয়ানের মুর্শিদে আম উস্তাদ হাসানুল বান্নাকে শহীদ করা হয়। ইখওয়ানুল মুসলিমীনকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। সাইয়েদ কুতুব সে সময় আমেরিকায় ছিলেন। তিনি হাসানুল বান্নার শাহাদাতের খবর পত্রিকায় পড়ার সময় চোখের পানিতে পত্রিকা ভিজে যায়।

সাইয়েদ কুতুব দীর্ঘদিন থেকে সংস্কারবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য একটি যুব সংগঠন করার চিন্তা করছিলেন, তাঁর স্বপ্নের বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পেলেন ইখওয়ানুল মুসলিমীনের মধ্যে। ১৯৪৯ সালেই তিনি তাঁর লিখিত 'আল আদালাতুল ইজতিমাইয়াতু ফিল ইসলাম' বইটি উপহার দেন সেসব যুবকদের উদ্দেশ্যে যারা সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রত। এ নযরানার মাধ্যমে ইখওয়ানের প্রতি তাঁর আন্তরিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে হাসানুল বান্নার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা এটার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, তিনি আমেরিকা থেকে ফিরে এসেই ইখওয়ানের ফরম পূরণ করেন। ১৯৫৩ সালে সরকারি চাকরি থেকে ইস্তেফা দেওয়ার আগ পর্যন্ত সরকারি কাজ আনজাম দিয়ে গোপনে ইখওয়ানের কাজে সময় দিতেন।

সাইয়েদ কুতুব ইখওয়ানের একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে কাজ শুরু করার পর তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করে ইখওয়ানের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। লেখনী বক্তৃতা নেতৃত্ব সকল ক্ষেত্রেই তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ইখওয়ানের কেন্দ্রীয় প্রচার ও দাওয়াতী কার্যক্রম বিভাগের ইনচার্জের দায়িত্ব পান।

১৯৫৪ সালে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইখওয়ানের পঞ্চাশ হাজার নেতা-কর্মীকে কারাবন্দী করা হয়। এর মধ্যে সাইয়েদ কুতুবসহ ছয়জন কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। সাইয়েদ কুতুবকে যখন গ্রেফতার করা হয় তখন তিনি ছিলেন জ্বরে আক্রান্ত। রোগশয্যায় শায়িত সাইয়েদ কুতুবের হাতে Hand Cup পরিয়ে তাঁকে কারাগারের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে কোন গাড়িতে না চড়িয়ে পায়ে হেঁটে যেতে বাধ্য করা হয়। অত্যধিক অসুস্থতার কারণে রাস্তায় চলার পথে তিনি বারবার অজ্ঞান হয়ে পড়েন। হুঁশ ফিরে এলে তাঁর মুখে উচ্চারিত হতো ইখওয়ানের প্রিয় স্লোগান 'আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।' কারাগারের ভিতর প্রবেশের সাথে সাথে হিংস্র হায়েনার দল তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু'ঘন্টা যাবৎ জেলের অন্ধকার কক্ষে অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। তাঁর উপর এক ভয়ংকর কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তাঁকে একটি নির্জন কক্ষে নিয়ে নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়। এমন অবস্থার পরও তাকে রিমান্ডে নিয়ে একের পর এক বিভিন্ন প্রশ্ন করে মানসিক নির্যাতন করা হয়।

নির্যাতনে সাইয়েদ কুতুব শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেও মানসিকভাবে ছিলেন খুবই সবল। ঈমানী বলে তিনি ছিলেন বলীয়ান। কখনো নির্যাতনের সীমা বৃদ্ধি পেলে তিনি মুখে উচ্চারণ করতেন 'আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।' রাতে তাকে একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রাখা হতো। সকাল বেলা খালি পায়ে প্যারেড করতে বাধ্য করা হতো। এভাবে অমানুষিক নির্যাতনে তার বুকের ব্যথা, ঘাড়ের ব্যথাসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ব্যথা-বেদনার সৃষ্টি হয়। তিনি নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হন। ফলে ১৯৫৫ সালের ২ মে তাকে সামরিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। সাইয়েদ কুতুবের শিষ্য ইউসুফ আল আযম লিখেছেন, 'সাইয়েদ কুতুবের ওপর বর্ণনাতীত নির্যাতন চালানো হয়। আগুন দ্বারা সারা শরীর ঝলসে দেওয়া হয়। পুলিশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর লেলিয়ে দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থান রক্তাক্ত করা হয়। মাথার ওপর কখনো উত্তপ্ত গরম পানি ঢালা হতো। পরক্ষণে আবার খুবই শীতল পানি ঢেলে শরীর বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা করা হতো। পুলিশ লাথি, ঘুষি মেরে একদিক থেকে অন্যদিকে নিয়ে যেত।'

এমনও হয়েছে যে, একাধারে ৪ দিন একই চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে; কোন খানাপিনা দেয়া হয়নি। তাঁর সামনে অন্যরা পানি পান করত অথচ তাঁকে এক গ্লাস পানি দেওয়া হতো না।

১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে সাইয়েদ কুতুবকে ১৫ বছর কারাদণ্ডের আদেশ শোনানো হয়। সে সময় তিনি এত বেশি অসুস্থ ছিলেন যে, সে আদেশটি শোনার জন্য

আদালতের কাঠগড়ায় যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। তিনি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হন। কারাগারের ভেতর তাঁর চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করা হলো না। বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠে তাঁকে কারাগরের বাইরে বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু কোন ফল হলো না।

সাইয়েদ কুতুবকে 'তাররা' কারাগারে রাখা হয়েছিল। সেখানে ইখওয়ানের আরও ১৮৩ জন কর্মী ছিল। তাদের সাথে পরিবার পরিজনকেও দেখা করতে দেওয়া হতো না। একবার 'আব্দুল্লাহ্ মাহের' ও 'আব্দুল গাফফার' নামক দু'জন ইখওয়ান কর্মীকে তাদের আত্মীয়-স্বজন দেখতে আসেন। কিন্তু তাদের সাথে আত্মীয়দের সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হয়নি, বরং তাদের দেখতে আসার শাস্তিস্বরূপ কারাগারে আটক রাখা হয়। কারাবন্দী ইখওয়ান কর্মীরা উক্ত অমানবিক ঘটনার প্রতিকার চেয়ে কারা তত্ত্বাবধায়কের নিকট আবেদন জানান। কিন্তু ফল হলো উল্টো। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে কারাগারে অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যরা প্রবেশ করে। সৈন্যরা অগ্নিগোলা বর্ষণ করতে থাকে। ঘটনাস্থলেই ২১ জন ইখওয়ান কর্মী শাহাদাত বরণ করেন, ২৩ জন মারাত্মক আহত হন। রক্তে রঞ্জিত হয় তাররা কারাগার। এ ঘটনার পর মন্ত্রিপরিষদের সচিব সালাহ্ দাসুকী তদন্তে আসেন। তদন্তে কী হয় এ ভয়ে সকলেই তটস্থ হয়ে পড়ে। না, যাদের গুলিতে রক্তের স্রোত বইছে তাদের কিছুই হয়নি। ইখওয়ান কর্মীদের উপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ দিয়ে চলে গেলেন যালিম সরকারের সচিব মহোদয়।

সাইয়েদ কুতুবের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি সময় পেলেই জেলে দাওয়াতী কাজ করতেন, ইখওয়ানুল মুসলিমীন নিয়ে ভাবতেন ও বিভিন্ন পরিকল্পনা করতেন। তিনি ঈমানী চেতনায় এত বেশি উদ্দীপ্ত ছিলেন যে, কোন সময়ই অন্যায়ের সাথে আপস করতে চাননি। কারাগারে যাওয়ার ১ বছর পরই সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, 'যদি আপনি ক্ষমা চেয়ে কয়েকটি লাইন লিখে দেন, যা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে, তাহলে আপনাকে মুক্তি দেওয়া হবে। আপনি জেলের কষ্টকর জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে ঘরে আরামে থাকতে পারবেন।' উক্ত প্রস্তাব শুনে সাইয়েদ কুতুব এই ভাষায় জবাব দেন, 'আমার অবাক লাগে যে, এ সকল লোকেরা মযলুমকে বলছে যালিমের কাছে ক্ষমাভিক্ষা চাইতে। আল্লাহর শপথ! যদি কয়েকটি শব্দ উচ্চারণের ফলে আমাকে ফাঁসির মঞ্চ থেকে নাজাত দেয় তবু আমি তা বলতে প্রস্তুত নই। আমি আমার রবের দরবারে এভাবে হাজির হতে চাই যে, আমি তাঁর উপর সন্তুষ্ট আর তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট।' জেলখানায় যখনই তাকে ক্ষমা চাইতে বলা হতো, তিনি

বলতেন, 'যদি আমাকে কারাবন্দী করা সঠিক হয়, তাহলে সঠিক সিদ্ধান্তের উপর আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আর যদি অন্যায়ভাবে আমাকে কারাগারে আটক রাখা হয়, তাহলে আমি যালিমের কাছে করুণাভিক্ষা চাইতে রাজি নই।' এরপর সরকারের পক্ষ থেকে টোপ দেওয়া হয়, তিনি যদি সম্মত হন তাহলে তাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হবে। সাইয়েদ এ প্রস্তাব শুনে প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আমি দুঃখিত; মন্ত্রিত্ব গ্রহণ আমার পক্ষে সে সময় পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না মিসরের পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামী ছাঁচে ঢেলে সাজাবার এখতিয়ার দেওয়া হবে।'

সাইয়েদ কুতুবকে আল্লাহ তাআলা এক বিরাট জাদুকরী সম্মোহনী শক্তি দান করেন। কারাগারের সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত, সম্মান করত। তাঁর কাছে অন্য কয়েদিরা তাদের সকল কথা খুলে বলতো। হাজতি, কয়েদিদের পরস্পরে ঝগড়া হলে তিনি বিচার করতেন। তাই তাঁকে উপাধি দেওয়া হয় 'কাজী উস সিজন' তথা কারাগারের বিচারপতি। যখন কোন কয়েদিকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা হতো তিনি তাকে বিদায় দিতেন। তাঁকে খাবারের কোন কিছু দেওয়া হলে তা অন্যদের মাঝে বিতরণ করতেন। জেল সুপার, জেল ডাক্তার সবাই তাকে ভালবাসতো। তিনি কারাবন্দীদের খোঁজ-খবর রাখতেন। এমনকি কারাগারে যেসব প্রাণী থাকত, তিনি তাদেরও যত্ন নিতেন, খাবার দিতেন। তিনি তাঁর আচরণে সবার মন জয় করেন। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। কারাসঙ্গী অন্যরা তাঁর খিদমত করতেন। তিনি হাসপাতাল আঙিনায় অন্যদের সাথে খোশ-গল্প করতেন। তিনি ছিলেন খুবই ধৈর্যশীল। ইখওয়ান নেতৃবৃন্দ পরামর্শের জন্য কারাগারে গেলে স্বাভাবিকভাবেই পরামর্শ দিতেন। কখনও কখনও ছোট বোন হামিদা কুতুবের মাধ্যমে পরামর্শ পাঠাতেন। সাইয়েদের কারাজীবনে মানসিকতার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। একবার আদালতের কাঠগড়ায় তিনি দাঁড়ানো। তাঁর ভাই-বোনেরা তাঁকে দেখতে এসেছেন। সবাইকে দেখে তিনি মুচকি হাসলেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন এবং ধৈর্যের উপদেশ দিলেন।

সাইয়েদ কুতুব ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত কারাগারে ছিলেন। প্রথম তিন বছর চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হন। আত্মীয়-স্বজনদেরকেও দেখা করতে দেওয়া হতো না। পরবর্তীতে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়। লেখালেখির সুযোগ দেওয়া হয়। তাঁকে পনের বছরের সশ্রম করাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৬৪ সালে ইরাকের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট আব্দুস সালাম আরিফ কায়রো সফর করেন। ইরাকের আলেমদের আবেদনে ইরাকী প্রেসিডেন্ট

মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসেরের সাথে বৈঠককালে সাইয়েদ কুতুবকে মুক্তি দেওয়ার অনুরোধ জানান। ইরাকের প্রেসিডেন্টের সাথে নাসেরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। নাসের এ ঘনিষ্ঠতা আরো বৃদ্ধি করতে আগ্রহী ছিলেন। তাই সাইয়েদকে মুক্তি দেন। মুক্তির পর কারাগারের উপকণ্ঠে অবস্থানকালে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন কড়া দৃষ্টি রাখে, কারা কারা সাইয়েদের সাথে দেখা করতে আসে তা জানার জন্যে। সে সময় সাইয়েদের পরামর্শ নেওয়ার জন্য সারা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তাঁর কাছে ছুটে আসতেন।

জেল থেকে মুক্তির পর সাইয়েদকে ঘিরে এক মজার অপপ্রচার শুরু হয়। ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা হয়, 'সাইয়েদ কুতুব ইসলামের কথা বলেন, অথচ তাঁর জীবনে ইসলাম নেই। সাইয়েদ কুতুব জেল থেকে মুক্তি পাবার পর কায়রোর পথ দিয়ে যাবার সময় তাঁর সাথে ছিল তার স্ত্রী ও বড় মেয়ে। তাঁরা উভয়ে ছিল নগ্নপ্রায়। তাঁদের মাথায় স্কার্ফ পর্যন্ত ছিল না।' এ ধরনের ভিত্তিহীন অপপ্রচারের সম্মুখীন হন সাইয়েদ কুতুব। অথচ তিনি জীবনে বিয়েই করেননি।

সাইয়েদ কুতুব জেল থেকে মুক্তির পর কায়রোতে নিযুক্ত ইরাকী রাষ্ট্রদূত তাঁর সাথে দেখা করে ইরাকে সম্মানজনক চাকরির প্রস্তাব দেন। সাইয়েদ প্রত্যুত্তরে বলেন, 'আমি মিসরের অধিবাসী। মিসরেই আমি জন্মেছি। দেশের প্রতি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আমি দেশেই অবস্থান করব। আমি দুঃখিত এ জন্য যে, আপনার প্রস্তাবিত পদ গ্রহণ করতে পারছি না।' সাইয়েদ দেশের বাইরে গেলেন না। দেশের প্রতি তাঁর দরদ ও মমতা ছিল বলেই। কিন্তু মিসর সরকার তাঁকে আবার গ্রেফতার করার জন্য একটি নাটক সাজায়।

এক গোয়েন্দা পুলিশ পকেটে ইখওয়ানের সদস্য ফরম রেখে জামাল আব্দুন নাসেরের জনসভায় যায়। সভার কাজ শুরু হলে সে নাসেরকে লক্ষ্য করে পরপর ১২ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। কিন্তু গুলি কারো গায়ে লাগেনি এবং যে ব্যক্তি গুলি ছুঁড়েছে সেও পালাবার কোন চেষ্টা করেনি। পুলিশ গ্রেফতার করে ঐ ব্যক্তিকে নাসেরের সামনে নিয়ে গেল। নাসের বলল, তার পকেট তল্লাশী করে দেখ ইখওয়ানের কোন কাগজ আছে কি না। তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই সে বলতে শুরু করল, হ্যাঁ, আমি ইখওয়ানের লোক। প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার জন্য ইখওয়ান আমাকে পাঠিয়েছে। সাথে সাথে পুলিশের লোকেরা চিৎকার করে উঠলো, স্যার, এই যে দেখুন! ইখওয়ানের সদস্য ফরম তার পকেটে। নাসের তো এই অজুহাতটির খোঁজেই ছিল। সাথে সাথে শুরু হয় ইখওয়ান কর্মীদের গণ গ্রেফতার।

মিসরের প্রেসিডেন্ট ইখওয়ান কর্মীদের বিচারের জন্য স্পেশাল সামরিক আদালত বসায় এবং এক অধ্যাদেশ জারি করে গণগ্রেফতারীর বিরুদ্ধে আদালতে আপীল করার সুযোগ রহিত করে। সাইয়েদ কুতুবকে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার আখ্যায়িত করে ইখওয়ানকে তার পদাঙ্কানুসারী বলে প্রচারণা চালিয়ে ঘায়েল করার চেষ্টা করেন। সে সময় সাইয়েদ কুতুবসহ চল্লিশ হাজারেরও বেশি নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। এবার গ্রেফতারী পরওয়ানা দেখে সাইয়েদ কুতুব নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, 'আমি জানি, যালিমরা এবার আমার মাথা-ই চায়। তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। নিজের মৃত্যুর জন্য আমার কোন আক্ষেপ নেই। আমার তো বরং সৌভাগ্য যে, আল্লাহর রাস্তায় আমার জীবনের সমাপ্তি হতে যাচ্ছে। আগামী কালের ইতিহাসই এটা প্রমাণ করবে যে, ইখওয়ানুল মুসলিমীন সঠিক পথের অনুসারী ছিল, নাকি এই যালিম শাসকগোষ্ঠী সঠিক পথে ছিল।'

গ্রেফতারকৃতদের মাঝে সাইয়েদা জয়নাব আল গাযালীও ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল যাট বছরের বেশি। তিনি ছিলেন মহিলা সংগঠনের নেত্রী। তাঁকে দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। হাসান হোদাইবী, তাঁর ছেলে মামুন আল হোদাইবী ইসমাঈল, তাঁর মেয়ে সাইয়েদা খালেদা, স্ত্রী ও পুত্রবধূকেও কারাগারে আটক করা হয়। কারাবন্দী নারী-পুরুষের উপর চালানো হয় অমানুষিক নির্যাতন।

ইখওয়ানের এক মহিলা সদস্যাকে তার ভাইসহ জেলে এনে ভাইকে বলা হয়, 'তুমি লেখ আমার বোন দুশ্চরিত্রা মহিলা এবং দেহ ব্যবসায়ী।' ভাই এই কথা লিখতে অস্বীকার করায় তার উপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়। বোন তাকে অনুরোধ করে বলে 'ভাইয়া, আপনি এ কথা লিখে দিন এবং শাস্তির হাত থেকে জীবন রক্ষা করুন।' কিন্তু ভাই জবাব দেয়, 'বোন, তুমি আমার জন্য উত্তম আদর্শ এবং আমিও তোমার জন্য আদর্শ হয়ে থাকব।' এরপর ভাই নির্যাতনে শাহাদাত বরণ করেন।

শাওকী আব্দুল আযীয নামক একজন ইখওয়ান কর্মীকে সম্পূর্ণ নগ্নদেহে ছাদে লটকানো হয়। তারপর ফোঁটা ফোঁটা পেট্রল তার মাথায় ঢালা হয়। তখন তার দম বন্ধ হয়ে আসত। প্রতিদিন পাঁচ ঘণ্টা এ শাস্তি চলত। জেল দারোগা কটাক্ষ করে তাকে জিজ্ঞাসা করত, তুমি কি এখনও পাক্কা মুমিন রয়েছ? তিনি জবাব দিতেন, 'হে আল্লাহ! তুমি যদি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হও তাহলে এ শাস্তিকে আমি পরওয়া করি না।' একথা শোনার পর তাঁকে আরও চাবুক মারা হতো। গায়ে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরা হতো। মহিলাদের কাঠের সাথে বেঁধে অর্ধনগ্ন করে নির্যাতন করা হত। রক্ত ও পুঁজে তাদের শরীর ভরে যেত। পুরুষদের কাপড় খুলে শিশুর মতো উলঙ্গ করে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঁচু করে রাখতে বাধ্য করা হত। লোহার

শিকলের সাথে বেঁধে হিংস্র কুকুর ছেড়ে দিত। অনেককে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করত। ভাইয়ের সামনে বোনকে বিবস্ত্র করা, অবিরাম ক্ষুধার্ত রাখা, বৈদ্যুতিক শক দেওয়া, ঘুমাতে না দেওয়া– এসব ছিল শাস্তিপ্রদানের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

সাইয়েদ কুতুবের ভাই-বোনদের কারাবরণ

সাইয়েদ কুতুবের ভাই-বোনরাও কারাবরণ করেন। সাইয়েদের ছোট ভাই মোহাম্মদ কুতুব। ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে গ্রেফতার করে কোথায় রাখা হয়েছে তা কেউ জানত না। তাকে এত বেশি অত্যাচার করা হয় যে, তাঁর দিকে তাকালে তাঁকে চেনাই যেত না। তিনি ইখওয়ানের নেতা ছিলেন না। তিনি লিখতেন। তাঁর লেখনিতে ইখওয়ান কর্মীরা উদ্দীপ্ত হতো। এটাই ছিল তাঁর অপরাধ। সাইয়েদের পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে সবার ছোট ছিলেন হামিদা কুতুব। ছোটবেলা থেকে সাহিত্য চর্চার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তিনি কারারুদ্ধ ইখওয়ান নেতা-কর্মীদের সেবা-যত্ন করতেন। সাইয়েদ কুতুবের বাণী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছাতেন। তিনিও বর্ণনাতীত নির্যাতনের শিকার হন। তাঁকে দশ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ছয় বছর চার মাস কারাবরণের পর তিনি মুক্তি পান। ড. হামুদী মাসউদের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বর্তমানে তাঁরা ফ্রান্সে বসবাস করছেন।

সাইয়েদের আরেক বোন আমিনা কুতুব। তিনি উচ্চ শিক্ষিত এক মহিলা। দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে আপন ভাইয়ের সাথে শরীক ছিলেন। সমাজ সংস্কারে তিনি অনেক লেখালেখি করেন। তিনিও অনেক নির্যাতন ভোগ করেন। দীর্ঘদিন কারাগারে অন্তরীণ থাকেন। কারাগারেই ১৯৫৪ সালে কামাল ছানানী নামক জনৈক ইখওয়ান কর্মীর সাথে দেখা হয়। সেখানে থেকেই বিয়ের প্রস্তাব। কারামুক্তির পর উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৮১ সালে আনোয়ার সাদাত হাজার হাজার ইখওয়ান কর্মীকে গ্রেফতার করে। কামাল ছানানীও গ্রেফতার হন। কারাগারে পাশবিক নির্যাতনে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। সাইয়েদ কুতুবের আরেক বোন যার নাম খুব কমই শোনা যায়, তিনি হচ্ছেন নাফীসা কুতুব। তাঁকেও অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁর বড় ছেলের নাম রিফাত। সে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। তাকেও গ্রেফতার করা হয়। মামার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে নির্যাতন চালানো হয়। কিন্তু তিনি রাজি হননি। নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। কারার চার দেয়ালের ভিতরই তিনি শহীদ হন। সাইয়েদের অপর ভাগিনার নাম আযম। সে মেডিক্যালের ছাত্র ছিল। তাকেও কারাগারে অন্তরীণ করা হয়। সাইয়েদ কুতুবের ভাই-বোন সকলেই কারা নির্যাতনের সম্মুখীন হন। ধৈর্যের সাথে তাঁরা ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

রিমান্ডে সাইয়েদ কুতুব

সাইয়েদ কুতুবকে গোয়েন্দা বিভাগের তদন্ত কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয়। সাইয়েদ কুতুবকে জিজ্ঞাসাবাদে যেসব প্রশ্ন করা হয় তিনি বলিষ্ঠতার সাথে স্পষ্ট ভাষায় সেসব প্রশ্নের জবাব দেন। নিম্নে কতিপয় প্রশ্ন ও তার জবাব তুলে ধরা হলো–

প্রশ্ন : আপনার নাম, ঠিকানা, পেশা ও বয়স বলুন।

জবাব : নাম সাইয়েদ, পিতা ইবরাহীম। উসয়ূত জেলার মুশা গ্রামে জন্ম। বর্তমানে হালওয়ানের ৪৪ হায়দার রোডে বাস করছি। পেশায় একজন লেখক, বয়স ৬০।

প্রশ্ন : আপনি কি কারাগারের ভেতরে লেখালেখি করছেন?

জবাব : হ্যাঁ, আমি আমার আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা তুলে ধরে কিছু বই লিখেছি। ইসলামী জীবনদর্শন নিয়ে লিখেছি।

প্রশ্ন : এ সম্পর্কে হাসান হুদাইবী কি অবগত আছেন?

জবাব : আমার ধারণা তিনি অবহিত আছেন।

প্রশ্ন : এর আগে কারাগার থেকে বের হবার পর আপনি কি হাসান হুদাইবীর মুখোমুখি হয়েছেন?

জবাব : হ্যাঁ, আমার ঘরে তাঁর সাথে তিনবার সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি এবং আমি ছাড়া তখন কেউ উপস্থিত ছিল না।

প্রশ্ন : আপনাদের সংগঠনের অর্থ বিদেশ থেকে অর্থাৎ সাউদি আরব ও অন্যান্য দেশ থেকে আসে, তাই না?

জবাব : হ্যাঁ, আমাদের আকীদা ও চিন্তাধারায় যারা বিশ্বাসী পৃথিবীর যেকোন দেশেই থাকুক না কেন, তাঁরা আমাদের ভাই। তাঁদের সাথে আমাদের আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু কোন দেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন : আপনি যে সম্পর্কের কথা বলেছেন তা ইখওয়ানের সাংগঠনিক দৃষ্টিতে, ইসলামের দৃষ্টিতে নয়, তাই না?

জবাব : ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিই ইখওয়ান গ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন : আপনার দৃষ্টিতে যেসব মুসলিম ইখওয়ানের সাথে সম্পৃক্ত এবং যারা সম্পৃক্ত নয় তাদের মাঝে পার্থক্য কী?

জবাব : ইসলাম বাস্তবায়নে ইখওয়ান কর্মীদের কাছে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি রয়েছে। আর অন্যদের নেই। আমার দৃষ্টিতে তারাই উত্তম, ইসলাম প্রতিষ্ঠায় যাদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি আছে।

প্রশ্ন : আপনি কি বিশ্বাস করেন, যারা ইখওয়ানের সাথে সম্পৃক্ত তারা 'ফী সাবিলিল্লাহ'র কাজ করছে?

জবাব : এটা নির্ভর করছে যারা ইখওয়ানের সাথে জড়িত তাদের নিয়ত ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর।

প্রশ্ন : সাঈদ রমদান সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি ইসলামের নামে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে মানুষদের সংগঠিত করছেন।

জবাব : আমি এ প্রশ্নের জবাব দান থেকে ক্ষমা চাই।

প্রশ্ন : আপনার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের পথ কী?

জবাব : আমাদের লক্ষ্য ইসলামী সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, মানবরচিত বিধান নয়। এ কারণে লোক তৈরির জন্যে ইসলামী প্রশিক্ষণের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে।

প্রশ্ন : আপনার সংগঠন কি গোপনে না প্রকাশ্যে তৎপরতা চালাচ্ছে?

জবাব : গোপনে।

প্রশ্ন : যখন দীনি চরিত্র গঠনই আপনাদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্য, তাহলে গোপনে তৎপরতার হেতু কী?

জবাব : প্রকাশ্য তৎপরতা ও প্রশিক্ষণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি আছে।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন, উম্মতে মুসলিমা দীর্ঘদিন ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন?

জবাব : এ প্রশ্নের জবাব বিস্তারিত ব্যাখ্যার দাবি রাখে। তবে তারাই উম্মতে মুসলিমার অন্তর্ভুক্ত, যারা ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলে।

প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত বিধানকে কি জাহেলিয়াতি বিধান মনে করেন?

জবাব : আমি মনে করি এটা গায়রে ইসলামী বিধান।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন, এটা জাহেলী সমাজ ও গায়রে ইসলামী সমাজ?

জবাব : এখানে জাহেলী সমাজের সংমিশ্রণ রয়েছে।

প্রশ্ন : আপনার এ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মিসরের বর্তমান শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

জবাব : আমি এটাকে জাহেলী ব্যবস্থা মনে করি।

প্রশ্ন : এর অর্থ কি এটা যে, আপনি বর্তমান প্রচলিত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করেন?

জবাব : আমি মনে করি, ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপাদানসমূহ পরিবর্তন হবে।

প্রশ্ন : আপনার মতে, 'তাগুত' অর্থ কি?

জবাব : আমার মতে, 'তাগুত' মানে আল্লাহর শরীয়তের বিপরীত অন্য সকল ব্যবস্থা।

প্রশ্ন : 'আল হা-কিমাতু লিল্লাহ' সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

জবাব : আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তকে জীবন যাপনের বিধান হিসেবে গ্রহণ করা।

প্রশ্ন : আপনি এটা কিভাবে বুঝলেন?

জবাব : ইসলামের উপর অধ্যয়নের ফলে।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন, প্রাচীন যুগে খারেজীরা এ পরিভাষা বলত।

জবাব : ঐতিহাসিক এ তথ্য আমার জানা নেই।– এ পরিভাষা কখন তারা ব্যবহার করত, আমি যা বুঝি তা হচ্ছে, আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তই হবে জীবনবিধান। কেননা, আল্লাহ নিজে হুকুম দেওয়ার জন্যে আসেন না। তিনি শরীয়ত নাযিল করেছেন, যেন তার ভিত্তিতে সকল কিছু পরিচালনা করা হয়। তাই 'হা-কিমাতু লিল্লাহ' বলতে বুঝায়, আল্লাহ প্রদত্ত বিধান বাস্তবায়ন। আর এটা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্ন : আপনি কি আপনার এ চিন্তাধারা মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য থেকে নকল করেছেন?

জবাব : আমি ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করাকালীন মাওলানা মওদূদীর গ্রন্থ এবং অন্যদের গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত হয়েছি।

প্রশ্ন : মাওলানা মওদূদীর আহ্বান এবং আপনার আহ্বানের মধ্যে পার্থক্য কি?

জবাব : কোন পার্থক্য নেই।

প্রশ্ন : সংগঠনে সামরিক কায়দায় অস্ত্র-প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কী?

জবাব : শত্রুতা ও বাড়াবাড়ি প্রতিরোধের জন্য, যখন কারো বাড়াবাড়ির সম্মুখীন হতে হয়। আমার দৃষ্টিতে বাড়াবাড়ির ধরন হচ্ছে, কারা নির্যাতন, হত্যা, বিচারপূর্ব নানা ধরনের দমন-পীড়ন। যেমন ১৯৫৪ সালে করা হয়েছিল।

প্রশ্ন : এটার দ্বারা বুঝা যায়, আপনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, আপনাদের সংগঠন সালতানাতের মোকাবেলা করতে সক্ষম?

জবাব : যে শক্তিকে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, তা সরকারের শক্তি হিসেবে পরিগণিত নয়। আর এর বিরোধিতা করা সরকারের বিরোধিতার অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন এ ধরনের সংগঠন করা আইন পরিপন্থী?

জবাব : আমি জানি, এটা আইন পরিপন্থী। কিন্তু আমি এটা করতে বাধ্য হয়েছিলাম। যদিও এটা প্রচলিত আইন পরিপন্থী, কিন্তু সফলভাবে ইসলামী তারবিয়াত দেওয়ার জন্য এর বিকল্প ছিল না।

প্রশ্ন : তারবিয়তের জন্য প্রচলিত আইনের বিরোধিতা কিভাবে করছেন? ইসলামী শরীয়ত কি এটা অনুমোদন করে? অথচ দেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হচ্ছে ইসলাম।

জবাব : প্রচলিত আইন একজন মুসলিমকে 'মুসলিম' হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে বাধা প্রদান করে, স্বয়ং প্রচলিত আইনের এটা ক্রটি ছাড়া কিছুই নয়।

প্রশ্ন : কিভাবে দেখলেন, প্রচলিত আইন একজন মুসলিমকে 'মুসলিম' হিসেবে বাধা প্রদান করছে?

জবাব : ইখওয়ানুল মুসলিমূনের প্রকাশ্য তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ ইখওয়ান দীনি দায়িত্ব পালনেরই চেষ্টা করছে।

প্রশ্ন : 'ইখওয়ানুল মুসলিমূন' নিষিদ্ধ করার কারণ কি দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্যই?

জবাব : হ্যাঁ, আমি এ কারণকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছি।

প্রশ্ন : সংগঠন নিষিদ্ধ করার প্রেক্ষাপট কি জানেন?

জবাব : আমি জানি, সরকারি সিদ্ধান্তেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সরকার কী কারণে করেছে, তা আমার জানা নেই। আমি বিশ্বাস করি, ইখওয়ানের দীনি তৎপরতার কারণেই একে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা, এটি একটি ইসলামী আন্দোলন। ইসলাম বিরোধীদের মোকাবেলায় এটা এক বিপ্লবী শক্তি।

প্রশ্ন : কিন্তু ইখওয়ান নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার গোপন সংগঠনের ধ্বংসাত্মক তৎপরতার কারণে!

জবাব : আমি যা জানি তা হচ্ছে, ইখওয়ানের গোপন সংগঠন রয়েছে। আমি এটাও জানি যে, সংগঠন নিষিদ্ধের এটা কোন প্রত্যক্ষ কারণ নয়। বরং মূল কারণ হচ্ছে, বাইরের চক্রান্ত। স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্র এটা মেনে নিতে পারে না, কিন্তু আপসে এ ধরনের গোপন সংগঠন নিষিদ্ধ করা সম্ভব। ইখওয়ানকে প্রকাশ্য তৎপরতার সুযোগ দিলেই তা সম্ভব হতো।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন, একমাত্র ইখওয়ানই দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করছে?

জবাব : আমি মনে করি, 'ইখওয়ানুল মুসলিমূন' অতীত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অধিকতর সফলতার সাথে দীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত। এর মধ্যে যে সকল ক্রটি আছে তা আমি নিঃসন্দেহে স্বীকার করি। কিন্তু ইখওয়ান দীন প্রতিষ্ঠার জন্যই চূড়ান্তভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রশ্ন : সংগঠনের নেতৃবৃন্দ স্বীকার করেছেন যে, আপনি তাদের বুঝিয়েছেন, বর্তমান জাহেলী সমাজের মধ্যে তারাই প্রকৃত মুমিন। তাঁরা দেশ, সমাজ ও প্রচলিত বিধানের সাথে কোন ধরনের সম্পর্কই রাখছে না। তাঁরা এমন মুসলিম হিসেবে নিজেদের মনে করে যে, তাঁরা রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধাবস্থায়ই রয়েছে। আপনি তাঁদের কাছে দেশকে অভিহিত করেছেন 'দারুল হরব' হিসেবে। এটা কি 'ইসলামী ইসতেলাহ'। আর এরই ভিত্তিতে যে কোন ধরনের হত্যাযজ্ঞকে ক্ষতিকর ও শাস্তিমূলক মনে করা না হয় বরং উল্টো পুণ্যের কাজ বলে মনে করা হয়?

জবাব : এ ধরনের মনে করা ভুল। মুমিন সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি সবার নিকট সুস্পষ্ট। দারুল হরব ও দারুল ইসলামের সাথে উম্মতে মুসলিমার সম্পর্ক আছে। এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য ছিল দার্শনিক দৃষ্টিতে বিধান বর্ণনা করার জন্য, বর্তমান সময়ে একথা চালিয়ে দেওয়ার জন্য নয়। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, তাঁরা আমার কথা ভুল বুঝেছে।

প্রশ্ন : কিভাবে তারা বুঝার ক্ষেত্রে ভ্রান্তিতে আছে? বিশেষত তাদের একজন- যার নাম 'আলী ওসমানী' স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে, আপনার সাথে মুসলিমদের হত্যার সম্পর্কে আলোচনা করা এই যে, যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহ ইলাল্লাহ' বলবে তাঁকে হত্যা করা হারাম। এতদসত্ত্বেও আপনি মুসলমানদের হত্যার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন?

জবাব : এ ধরনের আলোচনার কথা আমি স্মরণ করতে পারছি না। এটা ঠিক যে, আত্মরক্ষার অধিকার সকলের রয়েছে।

প্রশ্ন : আপনারা যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তার সাথে বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থার বিরোধ কী?

জবাব : প্রচলিত মানবরচিত বিধানে আল্লাহর শরীয়ত নেই। আমাদের দাবি হচ্ছে, আল্লাহর শরীয়তই হবে জীবনবিধান। আমার মতে, এটাই প্রধান বিরোধ। এ কারণেই ছোট-খাটো আরো অনেক বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন : মুহাম্মদ কুতুব কি আপনার এই গোপন সংগঠন সম্পর্কে অবহিত?

জবাব : না।

প্রশ্ন : কেন তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করেননি অথচ তিনি তাঁর রচিত পুস্তকে আপনার চিন্তাধারাই প্রকাশ করছেন?

জবাব : আমি মুহাম্মদ কুতুবের অবস্থা জানি। কোন সংগঠনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে সে অনাগ্রহী। অপরদিকে আমি চেয়েছিলাম, অন্য কেউ এ সংগঠন সম্পর্কে না জানুক। যদিও সে আমার নিকটজন।

রিমান্ড শেষে বিচার প্রহসন

১৯৬৫ সালের ২১ ডিসেম্বর সাইয়েদ কুতুব ও তাঁর সঙ্গীদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হয়। এরপর বিচার প্রহসন শুরু হল। অভিযুক্তদের কোন কৌশলী নেই; আত্মপক্ষ সমর্থনেরও সুযোগ নেই। সুদান, মরক্কোসহ কয়েকটি আরব দেশের আইনজীবীরা সেদেশে এসেছিলেন সাইয়েদ কুতুব ও তাঁর সাথীদের মামলা পরিচালনার জন্য। তাদের সবাইকে কায়রো বিমান বন্দর থেকেই ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফরাসী বার এসোসিয়েশনের সভাপতি 'উইলিয়াম থরপ' মামলার কাজে কায়রো আসার অনুমতি পাননি। পর্যবেক্ষক পাঠাতে চেয়েও সফল হননি। বিচারকক্ষে কোন সাংবাদিক, বিদেশি নাগরিক, জনপ্রতিনিধি এমনকি সাধারণ মানুষকেও ঢুকতে দেওয়া হয়নি। টেলিভিশনে এ বিচার অনুষ্ঠান দেখানোর কথা থাকলেও অভিযুক্তরা অভিযোগ অস্বীকার করে কারানির্যাতনের বর্ণনা দিতে শুরু করলে সম্প্রচারের সিদ্ধান্তই বাতিল করা হয়। সাইয়েদ কিছু বলতে চাইলেও তাঁকে কিছু বলতে দেওয়া হয়নি। এমনি অবস্থায় ১৮ মে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত আদালতে বিচার প্রহসন নাটক মঞ্চস্থ হয়।

বিচারক আব্দুন নাসেরের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করে ১৯৬৬ সালের ২১ আগস্ট রায় ঘোষণা করেন। অভিযুক্ত ৪৩ জন নেতা-কর্মীর মধ্যে ৭ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁরা হচ্ছেন, সাইয়েদ কুতুব, মুহাম্মদ ইউসুফ, আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাঈল, শবরী আ'রাফাহ, আহমদ আব্দুল মজিদ, আব্দুল আজিজ, আলী উসমাভী। ২৫ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১১ জনকে দশ থেকে পনের বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে আলী উসমাভী বিদেশি নাগরিক। কিছুদিন পর তাঁকে মুক্তি দিয়ে আমেরিকা যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়। আহমদ আব্দুল মজীদ, আব্দুল আজিজ ও শবরী আ'রাফাহর মৃত্যুদণ্ড হালকা করে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেওয়া হয়। সাইয়েদ কুতুবসহ মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্তদের উদ্দেশ্যে রায় ঘোষণাকালে বিচারক বলেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের নিজেদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক তোমরা সবাই মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসেরকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছ। তোমরা এদেশের ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতাচ্যুত করতে চেয়েছ। তাই তোমাদের ফাঁসির আদেশ দেওয়া হলো।'

বিচারক সাইয়েদ কুতুবের মৃত্যুদণ্ডাদেশ ঘোষণা করার পর আদালতের নথিপত্র যারা লিখেন তারাও কান্নায় ভেঙে পড়েন। কিন্তু সাইয়েদ রায় শোনার পর খুশি মনে বলে উঠেন, 'আলহামদুলিল্লাহ'। হাসতে হাসতে আরও বলেন, 'আমার কাছে এটা কোন বিষয় নয় যে, আমি কোথায় মরতে যাচ্ছি এবং কিভাবে যালিমরা

আমায় মৃত্যুদণ্ড দেবে। আমি তো এতেই সন্তুষ্ট যে, আমি আল্লাহর একজন অনুগত বান্দা হিসেবে শাহাদাতের পেয়ালা পান করতে যাচ্ছি।'

জয়নাব আল গাযালী তাঁর 'কারাগারে রাতদিন' বইতে লিখেন, মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়ার পাঁচ দিন পর সাইয়েদ কুতুব কারাগারে আটক ছোট বোন হামিদা কুতুবকে দেখতে তার কক্ষে যান। ছোট বোন তাঁকে দেখে বলেন, 'ধন্যবাদ, প্রিয়ভাই সাইয়েদ। এটা আমার জন্য এক দুর্লভ মুহূর্ত। আপনি আমার পাশে একটু বসুন।' সাইয়েদ কুতুব তাঁর পাশে বসে বিভিন্ন বিষয়ে অনেক আলোচনা করেন এবং সবাইকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেন। কিন্তু মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ভাইকে দেখে হামিদা কুতুব বিষণ্ন হয়ে পড়ায় সাইয়েদ কুতুব হাসি-কৌতুক করে কিছু কথা বলার পর হামিদা কুতুবের বিষণ্ন মনেও হাসির রেখা ফুটে উঠে।

সাইয়েদের মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের ঝড় উঠে। বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধান ও বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ রহিত করার জন্য মিসর সরকারের নিকট আবেদন জানানো হয়। বাদশাহ ফয়সাল বিন আব্দুল আজীজ তার একজন মন্ত্রীর মাধ্যমে জামাল আব্দুন নাসেরের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। মন্ত্রী সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার পর নাসের মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চান, হাতে কী?' মন্ত্রী জবাব দেন, 'বাদশাহ ফয়সলের বার্তা।' নাসের জানতে চান, 'কি সম্পর্কে?' মন্ত্রী জবাব দেন, 'সাইয়েদ কুতুব ও তাঁর সঙ্গীদের মৃত্যুদন্ডাদেশ রহিত করার জন্য।' এ কথা শোনার পর নাসের ক্রোধান্বিত হয়ে বাদশাহ ফয়সালের বিশেষ দূতকে শুনিয়ে পরবর্তী দিন খুব সকালে সাইয়েদ কুতুবের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দেন।

মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়ার পরও সাইয়েদকে বশে আনার জন্য সরকার নানা প্রলোভন দেয়। মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করার আগের রাতে একজন কারাপ্রহরী হামিদা কুতুবের রুমে এসে জানায়, আপনাকে কারা-তত্ত্বাবধায়ক হামজা বসুনী তার অফিসে দেখা করতে বলেছেন। হামিদা কুতুব তার কক্ষে যাওয়ার পর তাকে বড় ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরের নির্দেশ দেখানো হয়। অতঃপর কারা-তত্ত্বাবধায়ক বলেন, 'আপনার ভাই যদি তাদের ইচ্ছামতো সব কিছু করতে সম্মত হয় তাহলে মিসর সরকার মৃত্যুদণ্ডাদেশ হালকা করতে প্রস্তুত আছে। আমরা জানি, আপনি ছাড়া আপনার ভাইকে বুঝাবার অধিক উত্তম ব্যক্তি আর কেউ নেই। আপনার ভাইয়ের কয়েকটি কথা তাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে মুক্তি দিতে পারে। আমি মনে করি, আপনি তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন। আমি এও

বিশ্বাস করি যে, আপনারা মিসরের খুবই ভাল মানুষ। আপনারা শুধু আপনাদের বিশ্বাসের বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছেন। আমরা চাই, সাইয়েদ মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচুক।' এরপর কারা-তত্ত্বাবধায়ক সাফাত হামিদাকে তার ভাইয়ের কাছে নিয়ে যায়। হামিদা সাইয়েদ কুতুবকে সালাম করে তাদের বক্তব্য পৌছায়[৪]। সাইয়েদ কুতুব বোনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি যা বললে, তাকি তুমি চাচ্ছ, না তারা চাচ্ছে? হামিদা ইশারায় বুঝানোর চেষ্টা করে যে, তারা চাচ্ছে। তারপর সাইয়েদ কুতুব বলেন, 'আল্লাহর শপথ! যদি এ কথা বলা সঠিক হতো তাহলে আমি বলতাম। দুনিয়ার কোন শক্তি আমাকে এ কথা বলা থেকে ফেরাতে পারত না; কিন্তু তারা যা বলছে আমি তা করব না। আমি কখনই মিথ্যা বলব না।' অতঃপর কারা-তত্ত্বাবধায়ক সাফাত সাইয়েদকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি আপনার সিদ্ধান্তের উপর অটল?' সাইয়েদ কুতুব, হ্যাঁ সূচক জবাব দেওয়ার পর সাফাত রুম থেকে চলে যায়। এরপর হামিদা পুরো ঘটনা বলেন। পুরো ঘটনা বলার পর সাইয়েদ কুতুব হামিদাকে প্রশ্ন করেন, 'তাদের কথায় তুমি কি সন্তুষ্ট?' হামিদা জবাব দেয়, 'না'। তারপর সাইয়েদ কুতুব হামিদাকে লক্ষ্য করে বলেন, 'জীবন মৃত্যু আল্লাহর হাতে। হায়াত বৃদ্ধি কিংবা কমানোর ক্ষমতা তাদের হাতে নেই। তারা কারো ক্ষতি কিংবা উপকারে ক্ষমতা রাখে না।'

সাইয়েদ কুতুবের সাথে ছোট বোন হামিদা কুতুবের এটাই ছিল শেষ সাক্ষাৎ। সাইয়েদ বোনকে শেষবারের মতো দেখে নেন। ছোট বোন অশ্রুসজল নয়নে সালাম দিয়ে সাইয়েদ কুতুবের কাছ শেষ বিদায় নিয়ে কারাগারে তার রুমে চলে যান।

১৯৬৬ সালের ২৮ আগস্ট দিবাগত রাত। সাইয়েদ কুতুব, তাঁর সঙ্গী মুহাম্মদ হাওয়াশ ও আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাঈলকে ফাঁসির সেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৯ আগস্ট ভোর রাতে সাইয়েদ কুতুব ও তাঁর দু'সঙ্গীকে ফাঁসির মঞ্চে নেওয়া হয়। সাইয়েদ কুতুব আনন্দচিত্তে, নির্ভীকভাবে ফাঁসির মঞ্চে যান। সুবহে সাদিকের সময় যখন চারদিকে ফজরের আযান ধ্বনিত হয় সে সময় সাইয়েদ কুতুব হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে বসেন। এভাবেই বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ কুতুব ও তাঁর সঙ্গীদের ফাঁসি কার্যকর হয়।

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসি কার্যকর করার সংবাদ প্রচারের সাথে সাথে মিসরের মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা প্রেসিডেন্ট নাসেরের সাথে সাক্ষৎ করে উল্লাস প্রকাশ করে। কিন্তু মিসরের বিভিন্ন কারাগারের কারাবন্দীরা বুকফাটা আর্তনাদ করে। তাঁদের

কান্নায় সিক্ত হয় কারাগার। বাদশাহ ফয়সাল মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করার খবর শোনার পর 'ইন্নালিলাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন' পাঠ করার সময় তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়। শুধু বাদশাহ ফয়সাল নন; সারা বিশ্বের অগণিত মানুষ সাইয়েদ কুতুবের জন্য কান্নায় ভেঙে পড়েন।

সাইয়েদ কুতুব আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর জীবন ও কর্ম বিশ্বের অগণিত মানুষের প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। আল্লাহর রাহে নিবেদিত ছিল তাঁর গোটা জিন্দেগী। জেল, যুলুম ও নির্যাতনের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে তাঁকে সামনে অগ্রসর হতে হয়েছে আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে। ফাঁসির মঞ্চ হাসিমুখে বরণ করে তিনি এক অনন্য নজীর স্থাপন করেছেন। শুধু তিনিই নন, তার অন্যান্য ভাই-বোনেরাও কারানির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন। কারাগারই ছিল তাঁর পরিবারের বাসগৃহ।

আলজেরিয়ার আব্বাস মাদানীর কারাবরণ

১৯৩১ সালে জনাব মাদানী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লন্ডন থেকে দর্শনশাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করে দেশে ফিরে আলজেরিয়ার ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্টের নেতা হন এবং অল্প সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। ১৯৯৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে তাঁর দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু তাঁকে বা তাঁর দলকে দেশ পরিচালনার সুযোগ দেওয়ার পরিবর্তে কারাগারে প্রেরণ করা হয় আব্বাস মাদানীসহ হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে।

মাওলানা মওদূদীর কারাবরণ ও ফাঁসির আদেশ

মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন সাধন করেছে। মুসলমানদের চিন্তা জগতে শতাব্দী কালের যে স্থবিরতা ছিল তাঁর সাহিত্য এ স্থবিরতা দূর করতে বিরাট ভূমিকা পালন করে। ২০০৩ সালের ১৪ জুলাই New Statement পত্রিকায় Jason Cowley কর্তৃক লিখিত 12 Great thinkers of our time শীর্ষক প্রবন্ধে মাওলানা মওদূদীর নাম উল্লেখ করেন। তিনি তাঁর মন্তব্যে উল্লেখ করেন যে, He was, still is, regarded by many Muslims as a great intellectual. The most inventive aspect of his thought relates to his unique perspective of Islamic histry.

মাওলানা মওদূদী সারা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। তাঁর সাহিত্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। জনাব আবূ সলিম মুহাম্মদ আব্দুল হাই বলেন,

মওদূদী এক অসাধারণ মেধাসম্পন্ন আলেমে দীন ছিলেন। তিনি একাধারে মুফাসসির, মুজতাহিদ, বক্তা, আলেম, দীনের মহান মুজাহিদ, রাজনীতিবিদ, নেতা, সংগঠক, আইনজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও পরিচ্ছন্ন মনের অধিকারী প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব, সমাজ ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি সমাজের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে ইসলামের দৃষ্টিতে উক্ত সমস্যা সমাধানের নির্দেশনা দান করেন।

পাকিস্তান সরকার ১৯৪৮ সালের ৪ অক্টোবর জননিরাপত্তা আইনে মাওলানা মওদূদী, মাওলানা ইসলাহী ও মিয়া মুহাম্মদ তোফায়েলসহ জামায়াত নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে। তারপর ইসলামী আইন বাস্তবায়নের দাবি প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। একপর্যায়ে ১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদ কর্তৃক 'আদর্শ প্রস্তাব' গৃহীত হয়। আদর্শ প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তানে ইসলামী শরীয়ত অনুসারে পরিচালিত হবার কথা আইন পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত হয়। অতএব, জনগণ আশা করেছিল যে, উক্ত প্রস্তাব পাসের পর মাওলানা মওদূদীসহ গ্রেফতারকৃত উলামায়ে কেরামকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং সমস্ত পাকিস্তান ইসলামী শাসনতন্ত্র অনুযায়ী চলবে। কিন্তু সরকার শুধু জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য উক্ত প্রস্তাব পাস করার কারণে জামায়াত 'ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের' দাবিতে আবার আন্দোলন শুরু করে। সে সময় মাওলানা মওদূদী ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি শীর্ষক দুটি গ্রন্থ লিখেন। মওদূদীর মুক্তি ও ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবিতে জনমত প্রবল হলে সরকার ১৯৫০ সালের ২৫ মে মওদূদীকে মুক্তি দেন। মাওলানা মওদূদী মুক্তি লাভের পর অন্যান্য উলামায়ে কেরামকে এ দাবিতে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। উক্ত প্রচেষ্টার ফলে ১৯৫১ সালের ২১ জানুয়ারি করাচিতে প্রখ্যাত উলামায়ে কেরামের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি গৃহীত হয় এবং তা সরকারের নিকট পেশ করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিকতা প্রদর্শিত না হওয়ায় জামায়াত নয় দফা দাবিতে গণস্বাক্ষরতা অভিযানসহ ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে।

১৯৫৩ সালে কাদিয়ানীদের সংখ্যালঘু ঘোষণার দাবিতে করাচিতে এক সর্বদলীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা মওদূদী এতে অংশগ্রহণ করেন এবং কাদিয়ানী সমস্যাকে পৃথকভাবে বিবেচনা না করে একে শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যেই শামিল করার উপর জোর দেন। উক্ত কনভেনশনে পাকিস্তানের সমস্ত রাজনৈতিক

ও ধর্মীয় দলগুলো শামিল ছিল। মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তান, জমিয়তে আহলে হাদীস, আঞ্জুমানে তাহাফুজে হকুকে শিয়া প্রভৃতি দল কাদিয়ানীদের সংখ্যালঘু ঘোষণার দাবি জানায়। উক্ত কনভেনশন থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct action) কর্মসূচি দেয়া হয়। জামায়াত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বিরোধিতা করে উক্ত কর্মসূচির সাথে সম্পর্কচ্যুতির ঘোষণা দেয়। মাওলানা মওদূদী এ ধরনের কর্মসূচির ভয়াবহ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে জনসাধারণকে এ থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। মওদূদী নিয়মতান্ত্রিক কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারের প্রতি চাপ প্রয়োগের পক্ষে ছিলেন। সে সময় তিনি কাদিয়ানী সমস্যা শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কর্মসূচির ফলে পাঞ্জাবে ব্যাপক হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়। এ ধরনের দাঙ্গা সৃষ্টিতে একটি মহলের ইন্ধন ছিল। সরকার এ ব্যাপারে সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ না করে মাওলানা মওদূদীসহ উলামায়ে কেরাম ও জামায়াত নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে। কাদিয়ানী সমস্যা শীর্ষক পুস্তক রচনার জন্য সামরিক আদালত মাওলানা মওদূদীকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করে। সরকারের অভিযোগ ছিল, উক্ত গ্রন্থে মাওলানা মওদূদী উস্কানি দিয়ে দেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছেন।

মাওলানা মওদূদীকে জেলখানায় যখন তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ শোনানো হয় তখন তিনি ছিলেন অত্যন্ত শান্ত এবং স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের জন্য বরাদ্দকৃত সেলে হেঁটে যান। তবে মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীসহ তাঁর সঙ্গীরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। সরকারের পক্ষ থেকে উক্ত মৃত্যুদণ্ডাদেশ মওকুফের জন্য মওদূদীকে প্রাণভিক্ষা করার কথা বলা হয়। তিনি উক্ত প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আপনারা মনে রাখবেন, আমি কোন অপরাধ করিনি। আমি তাদের কাছে কিছুতেই প্রাণভিক্ষা চাইব না। এমনকি আমার পক্ষে অন্য কেউ যেন প্রাণ ভিক্ষা না চায়– না আমার মা, না আমার ভাই, না আমার স্ত্রী-পুত্র পরিজন। জামায়াতের লোকদের কাছেও আমার এই অনুরোধ। কারণ জীবন ও মরণের সিদ্ধান্ত হয় আসমানে– যমীনে নয়।' মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ার পর নির্ভীকচিত্তে তিনি হাসিমুখে শাহাদাতের সুধা পান করার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু এ আদেশ রেডিও-টিভিতে প্রচারিত হওয়ার পর দেশে-বিদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। ফলে সরকার মওদূদীর ফাঁসির আদেশকে যাবজ্জীন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করে। তারপরও বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে এবং মাওলানা মওদূদীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবি করা হয়। মওদূদীর মুক্তির দাবিতে বিশ্বব্যাপী বিক্ষোভ শুরু হলে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৪ সালের শেষের দিকে মাওলানা মওদূদীকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

খুররম মুরাদের কারাবরণ

বিংশ শতাব্দীতে যে কয়েকজন ইসলামী চিন্তাবিদ বিশ্বব্যাপী অবদান রেখেছেন তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন খুররম মুরাদ। তিনি পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়েও উঁচুমাপের ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন। ১৯৩২ সালের ৩ নভেম্বর ভুপালে তাঁর জন্ম হয়। ১৯৪৯ সালে ইসলামী জমিয়তে তালাবা পাকিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত হন এবং ১৯৫১ সালের ৪ নভেম্বর জমিয়তের তৃতীয় নাযেমে আলা নির্বাচিত হন।

১৯৫৩ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন। একজন পেশাদার প্রকৌশলী হিসেবে অনেক অবদান রাখেন। বিশেষভাবে পবিত্র কাবা শরীফ প্রশস্তকরণে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ১৯৬৩ সালে ঢাকা মহানগর জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে আইউববিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগ-জামায়াতসহ বিরোধী দলের সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হয় এবং তিনি এর কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশের নিরপরাধ মানুষের উপর যে যুলুম চালায় সে সময় তিনি তার প্রতিবাদ করেন, যা তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন। তিনি মরহুম শেখ মজিবুর রহমানের ধানমণ্ডির বাসায় গিয়ে মুজিব পরিবারের সদস্যদেরকে তাঁর ঘরে থাকার আমন্ত্রণ জানান। ১৯৭১ সালের শেষ দিকে তিনি ভারতীয় বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন এবং ১৯৭৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর ভারতের কারাগার থেকে মুক্তি পান।

জনাব খুররম মুরাদ প্রচুর ইসলামী সাহিত্য রচনা করেন। যুক্তরাজ্যের লেস্টারে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট অবদান ছিল। ১৯৯৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান।

খুররম মুরাদ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। জ্ঞান, আমল, তাকওয়া, সহযোগীদের সাথে সম্পর্ক, সংগঠন পরিচালনা, পেশাগত দায়িত্ব পালন ও পরিবারের হক আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি ভারসাম্য রক্ষার এক অনুপম দৃষ্টান্ত রেখেছেন। তাঁর সর্বশেষ অসীয়তনামা পড়লে উপলব্ধি করা যায় যে, খুররম মুরাদ কী ধরনের আল্লাহপ্রেমিক ছিলেন। আল্লাহ তাআলার প্রতি তাঁর প্রেম-ভালবাসা ছিল কত গভীর। তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতেন সব সময়। মূলত আল্লাহপ্রেমিকরা দুনিয়াতে যতদিন বেঁচে থাকেন, তারা প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন আল্লাহকে খুশি করার জন্য।

মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহীর (১৯০৪-১৯৯৭) কারাবরণ

মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী ১৯০৪ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের আযমগড় জেলার বোম্বোর গ্রামে এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন

এবং ১৯৯৭ সালে ১৫ ডিসেম্বর লাহোরে ইন্তিকাল করেন। তিনি একজন প্রজ্ঞাবান আলেম, রাজনীতিবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, তাফসীরকার ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা হিসেবে পরিচিত। তাঁর চিন্তাধারা মুসলিম উম্মাহর মন ও মননে গভীর প্রভাববিস্তার করেছে। বিশেষত তাঁর তাফসীর 'তাদাব্বুর কুরআন' সর্বমহলে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে।

পাকিস্তানে সভা-সমাবেশের মাধ্যমে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পক্ষে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করায় ১৯৪৮ সালের ১৫ অক্টোবর পাঞ্জাব নিরাপত্তা আইনে তাঁকে গ্রেফতার করে দীর্ঘ বিশ মাস বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। অন্তরীণ অবস্থায় তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৫০ সালের ২৮ মে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। জেলখানায় তাঁর মনে বিন্দুমাত্র চিন্তা ছিল না। তিনি জেলের ভেতর আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত এবং অন্যদের মাঝে কুরআনের শিক্ষা প্রচারের কাজ করেন। জেলের ভেতর তিনি সকাল বেলা কুরআনের দারস দিতেন। মিয়া মুহাম্মদ তোফায়েল জেলখানার ভেতর তাঁর কাছে আরবি ভাষা, আরবি সাহিত্য ও মুয়াত্তা ইমাম মালেক শিখেন। জেলখানাতে অবস্থানকালে মাওলানা ইসলাহী তাঁর বন্ধু বান্ধবদের কাছে যেসব চিঠি লিখেন এতে তাঁর ঈমান, তাকওয়া ও আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল এর বিষয় ফুটে উঠে। তিনি জেলখানা থেকে তাঁর জনৈক বন্ধুর কাছে লেখা এক চিঠিতে উল্লেখ করেন, 'আপনারা আমার জন্য চিন্তিত হবেন না। আমি যখন যে স্থানে থাকি, আমার রবের ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট। আমার মনে এক মুহূর্তের জন্যও এই চিন্তা আসে না যে, আমার রব আমার সাথে বেইনসাফ করছেন। আমার জীবন ও মরণ সব কিছুতো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য। দীনের খিদমত করার জন্যই আমি স্বাধীন ও মুক্ত থাকতে চাই। অনুরূপভাবে আল্লাহর দীনের পথে জেলখানায় বন্দী থাকাকেও পছন্দ করি।' ইসলাহী জেল থেকে মুক্তি লাভের পর ইসলামী গণজাগরণ সৃষ্টির জন্য ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়ে জনমত গঠনে দেশব্যাপী ব্যাপক সফর করেন। সত্যের পথে চলার ক্ষেত্রে কারানির্যাতন এক মুহূর্তের জন্যও বাধা হয়নি।

কারাগারে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ভারতীয় উপমহাদেশের একজন খ্যাতিমান আলেম, রাজনীতিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন। দু'বার নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ১৮৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক আবাস দিল্লীতে, মাতৃকুলের আবাস মদীনা মুনাওয়ারায়। আর তাঁর জন্ম মক্কা মুকাররামার কাদওয়াহ (قدوه) মহল্লায়।

মাওলানা আযাদ তুরস্ক মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে ১ম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেন। তদানীন্তন ভারতের ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের প্রতি আস্থাশীল বিশিষ্ট মুসলিম নেতাদের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়ে। ১৮ মার্চ ১৯১৬ খ্রি. ডিফেন্স এ্যাক্টের ৩য় ধারা মুতাবেক সরকার আদেশ জারি করেন যে, আযাদকে চার দিনের মধ্যে বাংলার বাইরে চলে যেতে হবে। উক্ত আদেশের পর তিনি করাচি চলে যান। সেখানে ৫ মাস তাঁকে নজরবন্দী করে রাখা হয়। সে সময় তাঁর গৃহে তল্লাশী চালিয়ে সমাপ্ত ও অসমাপ্ত প্রায় অনেক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পুলিশ নিয়ে যায় এবং তা নষ্ট করে ফেলে।

১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি নজরবন্দিত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন। তখন দেশে স্বাধীনতা অর্জন ও খিলাফত রক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু হয়। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কনফারেন্স'-এর সভাপতি হিসেবে তিনি 'খিলাফত সমস্যা ও জাযীরাতুল আরাব' সম্পর্কে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। এ বক্তৃতা ছিল মুসলিমদেরকে সরকারের সাথে অসহযোগের আহ্বান। এ সময়ে তিনি জনসাধারণের অনুরোধে ইমামতের বায়'আত (আনুগত্য শপথ) গ্রহণ করতে শুরু করেন। ১০ ডিসেম্বর ১৯২১ সালে তাঁকে আবার গ্রেফতার করে তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। উক্ত মোকদ্দমায় তাঁর এক বছরের কারাদণ্ড হয়। মাওলানা আযাদ করাচির নজরবন্দী হতে শুরু করে জুন ১৯৪৫ পর্যন্ত মোট ১০ বছর ৭ মাস বন্দী জীবন যাপন করেন।

শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানীর কারাবরণ (১৮৮৭-১৯৪৯ খ্রি.)

উসমানী বিশিষ্ট আলিম, মুফাসসির, রাজনীতিবিদ ও প্রবন্ধকার হিসেবে পাকভারত উপমহাদেশে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর মূল নাম হচ্ছে শাব্বীর আহমাদ ও উপাধি শায়খুল ইসলাম। উসমান (রা)-এর বংশধর বলে তিনি নিজের নামের সঙ্গে উসমানী শব্দটি জুড়ে দেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও দেশের রাজনীতিতে আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সব সময় জড়িত ছিলেন। খেলাফত আন্দোলনে তাঁর বিরাট ভূমিকা ছিল।

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান বিদেশি পণ্য বর্জন আন্দোলনে গ্রেফতার হন এবং মাণ্ডা দ্বীপে পাঁচ বছর অন্তরীণ ছিলেন। কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর উসমানী বিভিন্ন সভা-সমিতিতে শাইখুল হিন্দের সঙ্গে থাকতেন। সাহারানপুর, গাজীপুর, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেনারস, আলীগড় প্রভৃতি স্থানে তিনি শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসানের সঙ্গে আযাদী আন্দোলনে শরীক ছিলেন। এ জন্য তাঁকে কারাভোগসহ অনেক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

শহীদ আব্দুল মালেক

১৯৬৯ সালে আইউব সরকারের বিরুদ্ধে গনআন্দোলন চলাকালে পাকিস্তানের সামরিক সরকার খসড়া শিক্ষানীতি ঘোষণা করে। উক্ত শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনা সমালোচনা শুরু হয়। ১৯৬৯ সালের ২ আগস্ট ঢাকার নিপায় অডিটরিয়ামে শিক্ষানীতির উপর আলোচনা করার জন্য ছাত্রদের আহ্বান করা হয়। সেদিন ইসলামী মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে আদর্শিক শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে শহীদ আব্দুল মালেকের ক্ষুরধার যুক্তি ও বলিষ্ঠ ভাষণে মিলনায়তনের সবাইকে মুগ্ধ করে।

এরপর ১৯৬৯ সালের ১২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে ছাত্র সংসদের উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবক্তা কয়েকজন ছাত্র আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে চায়, কিন্তু তাদেরকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হয়নি। সভার এক পর্যায়ে শ্রোতাদের পক্ষ থেকে আপত্তিকর বক্তব্যের প্রতিবাদ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাদের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে ইসলামী আন্দোলনের তরুণ কর্মীদের উপর। স্বাভাবিকভাবে তাদের আক্রোশের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন শহীদ আব্দুল মালেক। ফলে আব্দুল মালেক ২/৩ জন সঙ্গীসহ রেসকোর্স ময়দান দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে লাঠি, লোহার রড প্রভৃতি দিয়ে আক্রমণ করে গুরুতর আহত করা হয়। তিনি ঘটনাস্থলেই সংজ্ঞাহীন হন। তিন দিন হাসপাতালে সংজ্ঞাহীন থাকার পর ১৫ আগস্ট হাজার হাজার সঙ্গী সাথীদের শোকসাগরে ভাসিয়ে শাহাদাতের পবিত্র সুধা পান করেন।

শহীদ আব্দুল মালেক তরুণ বয়সেই এমন এক উজ্জ্বল নজীর স্থাপন করে গেছেন, যা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে চিরদিন অনুপ্রেরণা যোগাবে। আব্দুল মালেক আর্থিকভাবে স্বচ্ছল না হয়েও তাঁর স্কলারশীপের টাকা থেকে অন্যান্য সহপাঠীদের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি মানবতার সেবায়ও তিনি ছিলেন অগ্রণী। ঘূর্ণিবিধ্বস্ত এলাকায় রিলিফ ওয়ার্ক, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা সমাধানে লেস্টিং লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠাসহ সব ক্ষেত্রেই শহীদ আব্দুল মালেকের ভূমিকা ছিল অনন্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুলুম, যালিমের পরিণতি ও মাযলুমের ফরিয়াদ

যালিম ও যুলুমের ধরন

যুলুম আরবি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে অত্যাচার; কোন বস্তুকে যথাস্থানে না রাখা। কোন ব্যক্তির জান, মাল, ইজ্জত, আব্রু ও মান-সম্মানের উপর আঘাত হানাকে যুলুম বলা হয়। একজন বা একাধিক ব্যক্তি বা সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে যুলুম হতে পারে। তাই কুরআন ও হাদীসের কোথাও কোথাও যুলুম শব্দটির বহুবচন 'যুলুমাত' ব্যবহার করা হয়েছে। শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন কিংবা আর্থিক ক্ষতি বা সম্মান হানিসহ নানাভাবে নানা উপায়ে যুলুম হতে পারে। তবে আল্লাহর সাথে শিরক করা হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুলুম।

এ প্রসঙ্গে আব্দুলাহ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা যখন এই আয়াত নাযিল করলেন যে, যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে যুলুমমিশ্রিত করেনি' তখন আসহাবে রাসূলের কাছে এটা খুব কঠিন মনে হলো। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স), আমাদের মধ্যে কি এমন লোক আছে, যে নিজের প্রতি যুলুম করে নি? তখন রাসূলে কারীম (স) ইরশাদ করেন, এখানে যুলুম দ্বারা অত্যাচারের কথা বুঝানো হয় নি বরং শিরকের কথা বুঝানো হয়েছে। তোমরা কি লোকমানের সেই নসীহতের কথা শোন নি, যা তিনি স্বীয় পুত্রকে করেছেন। তিনি বলেছেন, হে আমার পুত্র! আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করো না। কেননা শিরক বিরাট যুলুম। (বুখারী ও মুসলিম)

কুরআন ও হাদীসের অনেক জায়গায় যুলুম ও যালিমের পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা এসেছে।

উক্ত আলোচনার সার সংক্ষেপ হচ্ছে :

১. যুলুম হচ্ছে অন্ধকার। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ্ ইবন ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন যুলুম হবে অন্ধকারের কারণ (বুখারী ও মুসলিম)। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হাদীসবেত্তাগণ বলেন, 'ঈমান হচ্ছে নূর।' অর্থাৎ ঈমানদার মানুষের নেক আমলসমূহ কিয়ামতের দিন আলোকবর্তিকাস্বরূপ তার সামনে পথ প্রদর্শন করে বেহেশতের দিকে নিয়ে যাবে। আর যালেমের যুলুমসমূহ অন্ধকারময় হয়ে চারিদিক হতে যালিমকে ঘিরে ধরবে এবং যুলুমের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

২. আল্লাহ তাআলা সাধারণত যুলুম বা অপরাধের শাস্তি সাথে সাথে প্রদান করেন না। তিনি যালিমকে অবকাশ দেন। কুরআনে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে :

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى
اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○

'আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের যুলুমের কারণে সাথে সাথেই পাকড়াও করতেন তাহলে দুনিয়ার কোন একটি প্রাণীকেও ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি সবাইকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। যখন ঐ সময় এসে যায় তখন এক মুহূর্তও আগে বা পরে হতে পারে না।' (সূরা নাহল : ৬১)

উক্ত আয়াতের সমর্থনে আবূ মূসা (রা) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (স) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা যালিমকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। পরিশেষে তাকে এমন শক্তভাবে পাকড়াও করেন যে তাকে আর ছাড়েন না।' (বুখারী ও মুসলিম)

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে যালিমকে সাথে সাথে শাস্তি না দিয়ে আরও অবকাশ দেন। অবকাশের সুযোগ পেয়ে পাপীরা আরও বেশি পাপাচারে লিপ্ত হয়; যালিমরা আরও বেশি যুলুম করে। আর কেউ কেউ তাওবাহ করে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। যারা অবকাশের সুযোগে অধিক যুলুম বা পাপাচারে লিপ্ত হয় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আখিরাতে অধিক শাস্তি প্রদান করবেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'কাফিরদেরকে আমরা এই যে অবকাশ দিয়ে চলেছি, এটাকে তারা যেন

নিজেদের জন্য ভালো মনে না করে। আমরা তো তাদেরকে এ জন্য অবকাশ দিয়ে থাকি, যাতে তারা বেশি করে গুনাহ করে নেয়। তারপর তাদের জন্য কঠিন অপমানজনক শাস্তি রয়েছে।'

৩. যালিম আখিরাতে আল্লাহর পাকড়াও হতে নিজেকে রক্ষা করতে চাইলে তাকে মাযলুমের নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। যালিম শুধু আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ্ মাফ করবেন না। মাযলুম ক্ষমা করলেই আল্লাহ্ তাআলা যালিমকে ক্ষমা করেন। এ প্রসঙ্গে আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করছি। রাসূলে কারীম (স) ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি যদি তার কোন ভাইয়ের মান সম্মান বা অন্য কোন ব্যাপারে যুলুম করে থাকে তবে তাকে সেই দিন আগমনের পূর্বে ক্ষমা চাইতে হবে, যে দিন দিরহাম ও দিনার কিছুই থাকবে না। কেয়ামতের দিন যালেমের আমলনামায় নেক আমল থাকলে তা হতে যুলুমের পরিমাণ নেক নিয়ে মাযলুমকে দেওয়া হবে। আর নেক না থাকিলে মাযলুমের বদ আমল হতে সেই পরিমাণ বদ নিয়ে যালিমের উপর দেওয়া হবে। (বুখারী)

এ প্রসঙ্গে আবূ হুরাইরা (রা) থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা কি জান গরীব কে? সাহাবীগণ জবাব দিলেন, আমাদের মধ্যে যার দিরহাম ও সাজ-সরঞ্জাম কিছুই নেই সেই গরীব। প্রত্যুত্তরে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে গরীব হলো সেই ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি নিয়া হাজির হবে আর এর পাশাপাশি কাউকে গালাগালি, কাউকে মিথ্যা অপবাদ বা কারো ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে অধিকার করেছে কিংবা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করেছে বা শারীরিক নির্যাতন করেছে। অতঃপর তার নেক হতে এক এক মাযলুমকে দেওয়া হবে। অতঃপর মাযলুমগণের হক পরিশোধের আগে যখন নেক শেষ হয়ে যাবে তখন ঐসব মাযলুম হকদারদের গোনাহ তার উপর চাপানো হবে এবং পরিশেষে তাকে জাহান্নামে দেয়া হবে। (মুসলিম)

উপরিউক্ত হাদীসে দেখা যায়, মুফলিস বা গরীব ব্যক্তির সংজ্ঞা দুই দৃষ্টিকোণ থেকে দেয়া হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে আর আল্লাহর রাসূল (স) আখিরাতের দৃষ্টিকোণ থেকে দিয়েছেন। তবে উভয় ক্ষেত্রে মূল কথা হচ্ছে, যারা নিঃস্ব তারাই গরীব। আর আখিরাতে যে নিঃস্ব হবে সেই হচ্ছে সবচেয়ে বড় গরীব।

৪. দুনিয়াতে যালিম যদি মাযলুমের নিকট ক্ষমা না চায় তাহলে মনে রাখতে হবে যে, আখিরাতে প্রত্যেককে নিজের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রতিফল পেতে হবে।

এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করবেন। তিনি কারো প্রতি যুলুম করবেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۚ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ۝

'কিয়ামতের দিন আমি ঠিক ঠিক ওজন করার মতো দাঁড়ি-পালা রেখে দেব। কারো উপর সামান্য যুলুমও করা হবে না। সরিষার দানা পরিমাণ আমলও যদি কারো থাকে তাহলে তা আমি সামনে নিয়ে আসব। আর হিসাব করার জন্য আমিই যথেষ্ট।' (সূরা আম্বিয়া : ৪৭)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, আখিরাতে চুলচেরা হিসাব নিকাশ করে প্রত্যেকের কাজের বদলা দেওয়া হবে। আখিরাতে চূড়ান্ত বিচার ফায়সালার পর সকলের ভাল-মন্দের পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হবে। এমনকি একটি প্রাণী আরেকটি প্রাণীর সাথে অন্যায় আচরণ করলে তারও বিচার করবেন। এ প্রসঙ্গে আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করছি। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (স) ইরশাদ করেছেন যে, 'কিয়ামতের দিন হকদারগণের হকসমূহ পরিশোধ করা হবে। এমনকি শিংবিহীন বকরির প্রতিশোধ শিংবিশিষ্ট বকরি হতে নেয়া হবে। (মুসলিম)

এ প্রসঙ্গে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (স) বলেন, আমলনামা তিন প্রকার। এক প্রকার হলো, যা আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন না। আর তাহলো সেই আমল, যাতে আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কাউকে শরীক করা হয়। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তাআলা শিরক করার গোনাহ ক্ষমা করবেন না।' দ্বিতীয় আমলনামা হলো, যাতে মানুষের পারস্পরিক যুলুম অত্যাচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এ আমলনামাকে আল্লাহ তাআলা এমনিতেই ছেড়ে দেবেন না; বরং মাযলুমদের পক্ষে যালিম হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। তৃতীয় আমলনামা হলো যা আল্লাহ তাআলা কোন পরোয়া করেন না। সেই সব গুনাহ, যা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর বান্দার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ ধরনের আমলনামা আল্লাহ তাআলার মর্জির উপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দিতে পারেন আর ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন।

৫. যুলুম করা থেকে বিরত থাকা এবং মাযলুমের বদদোয়া হতে নিরাপদ থাকতে হবে। কেননা, মাযলুমের চোখের পানি আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছে। আল্লাহ তাআলা মাযলুমের দোয়া কবুল করেন। এ প্রসঙ্গে আলী (রা) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম (স) ইরশাদ করেছেন, নিজেকে মাযলুমের বদদোয়া হতে রক্ষা কর। কেননা সে আল্লাহ তাআলার নিকট স্বীয় হক প্রার্থনা করে থাকে। আল্লাহ তাআলা হক চাইতে বারণ করেন না। আরেক হাদীসে আছে যে, তিন ধরনের ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ কবুল করেন। মাযলুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং পিতামাতার দোয়া।

৬. আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, যালিম কর্তৃক মাযলুম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, যালিম নিজের ক্ষতিই বেশি করে এবং নিজের যুলুমের কারণেই শাস্তিভোগ করে। এ প্রসঙ্গে আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য। তিনি কোন একজন ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন যে, যালিম ব্যক্তি অন্য কারো ক্ষতি করে না, বরং সে নিজেই নিজের ক্ষতি করে থাকে। এটা শুনে আবূ হুরাইরা (রা) বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! এটাই ঠিক কথা। এমনকি বাজপাখী স্বীয় বাসায় যালিমের যুলুমের কারণে দুর্বল হয়ে মরে যায়। (বায়হাকী)

৭. অনেক সময় দেখা যায়, কেউ কেউ মাযলুমের সহযোগিতা করার চেয়ে যালিমকে আরও বেশি যুলুম করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, যালিমের সহযোগিতা বড় ধরনের অপরাধ। এ প্রসঙ্গে আওস ইবন শোরাহবিল (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলে কারীম (সা)-কে বলতে শুনেছেন, 'যে ব্যক্তি যালিমকে শক্তিশালী করার নিমিত্তে তার সাথে চলে অথচ সে জানে যে, সে যালিম। এমনি লোক ইসলাম হতে বহিষ্কৃত হয়ে যায়' (বায়হাকী)। এ হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, কোন অবস্থাতেই যালিমের সাহায্যকারী হওয়া যাবে না।

৮. সর্বাবস্থায় যালিম ও মাযলুমের সাহায্যকারী হতে হবে। রাসূলে কারীম (স) ইরশাদ করেন, তুমি তোমার ভাই যালিম হোক বা মাযলুম হোক– তাকে সাহায্য কর। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স), মাযলুমের সাহায্যের বিষয় আমরা বুঝলাম, কিন্তু যালিমকে কিভাবে সাহায্য করব? আল্লাহর রাসূল (স) জবাব দিয়েছেন, যালিমকে যুলুম থেকে বিরত রাখাই হচ্ছে তার প্রতি সহযোগিতা। এ হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, আমাদেরকে মাযলুমের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। আর যালিমকেও যুলুম থেকে বিরত রাখার চেষ্টার মাধ্যমে সহযোগিতা করতে হবে। কেননা যালিম নির্দ্বিধায়

যুলুম করতে থাকলে বড় ধরনের অপরাধী হয়ে ভীষণ শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। তাই যালিমকে যুলুম করতে না দেওয়াটাই তার প্রতি বড় ধরনের সহযোগিতা।

৯. যুগে যুগে যারাই প্রাচুর্যের মোহে অহংকারী হয়ে উঠেছে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন সময় ধ্বংস করে দিয়েছেন। অতীতে অর্থ-সম্পদশালী একদল লোক ধন ও জনবলের কারণে গর্বিত হয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী-রাসূলদের দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকৃত জানিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○
وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ○

'আমরা যে জনপদেই কোন সতর্ককারী পাঠিয়েছি, সেখানকার সম্পদশালী লোকেরা বলেছে, তোমরা যে বাণী নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা মানি না। তারা আরো বলেছে, আমরা তোমাদের চেয়ে অধিক অর্থসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী এবং আমরা কখনও শাস্তি ভোগ করব না।' (সূরা সাবা : ৩৪-৩৫)

১০. আল্লাহ তাআলা যালিমকে আখিরাতে শাস্তি প্রদান করবেন। কিন্তু তিনি দুনিয়াতেও কখনও কখনও যালিমকে শাস্তি প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা অতীতে কিছু জনপদ ধ্বংস করার চিত্র তুলে ধরে বলেন,

'তারা কি দুনিয়াতে ঘুরাফেরা করেনি এবং তাদের আগে যারা ছিল তাদের কী দশা হয়েছে, তা কি দেখছে না? আল্লাহ তাদের সব কিছু তাদের উপর উল্টিয়ে দিয়েছেন এবং এ কাফিরদের দশাও তাই হবে। এর কারণ এই যে, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহই তাদের সাহায্যকারী, আর কাফিরদের কোন সাহায্যকারী নেই। যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদেরকে আল্লাহ এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে ঝরনাধারা বয়ে চলেছে। আর যারা কুফরী করেছে তারা দুনিয়ায় কয়দিনের মজা লুটছে ও জানোয়ারদের মতো খাচ্ছে। আর দোযখই হলো তাদের ঠিকানা। হে রাসূল! আপনার যে এলাকা থেকে আপনাকে বের করে দিয়েছে, এর চাইতে শক্তিশালী কত এলাকা বিলীন হয়ে গিয়েছে। আমি তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করে দিয়েছি যে, তাদেরকে বাঁচাবার মতো কেউ ছিল না। এটা কি

কখনো হতে পারে, যে লোক তার রবের সুস্পষ্ট হেদায়াত মেনে চলে সে তার মতো হয়ে যাবে, যার নিকট তার বদ আমলকে পছন্দনীয় বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যারা তাদের নাফসের তাঁবেদারী করে চলেছে? মুত্তাকীদের জন্য এমন বেহেশতের ওয়াদা করা হয়েছে, যার মধ্যে বহমান থাকবে পরিষ্কার পানির নহর, এমন দুধের নহর, যার স্বাদ নষ্ট হয় না, এমন শরাবের নহর, যারা পান করে তাদের জন্য সুস্বাদু এবং এমন মধুর নহর, যা খাঁটি ও স্বচ্ছ। তাদের জন্য আরও থাকবে সব রকমের ফল এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত। (যে এমন বেহেশতের অংশীদার হবে সে কি) তাদের মতো হতে পারে, যারা চিরকাল দোযখে থাকবে এবং যাদেরকে এমন ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, যা তাদের নাড়ি-ভুড়ি পর্যন্ত কেটে ফেলবে?' (সূরা মুহাম্মদ : ১০-১৫)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা হূদে এভাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

'এ হচ্ছে কয়েকটি জনপদের সামান্য ইতিবৃত্ত, যা আমি আপনাকে শোনাচ্ছি। তন্মধ্যে কোনো কোনোটি এখনও বর্তমান আছে আর কোনো কোনোটির শিকড় কেটে দেওয়া হয়েছে। আমি কিন্তু তাদের প্রতি যুলুম করিনি; বরং তারা নিজেরাই নিজের উপর অবিচার করেছে। ফলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেসব মাবুদকে ডাকত আপনার পালনকর্তার হুকুম যখন এসে পড়ল, তখন কেউ কোনো কাজে আসল না; তারা বিপর্যয়ই বৃদ্ধি করল। আর তোমার পরওয়ারদেগার যখন কোনো পাপপূর্ণ জনপদকে ধরেন, তখন এমনিভাবেই ধরে থাকেন। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও বড়ই কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক হয়।' (সূরা হূদ : ১০০-১০২)

এভাবে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর বর্ণনা আছে। মাওলানা মওদূদী (র) তাঁর সীরাতে সরওয়ারে আলম গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় বলেন, 'যেসব জাতি দুনিয়াকে নিছক ভোগবিলাস ও লীলাখেলার কেন্দ্র মনে করে নবীগণের প্রচারিত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে ভ্রান্ত মতবাদের ভিত্তিতে জীবনযাপন করেছে, তারা পরপর কোন ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে তা আমরা জানতে পারি মানবজাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করে। অভিশপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি নিছক কৌতুক ও উৎসুক সহকারে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলি পর্যবেক্ষণ করেছে। কিন্তু তার থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করেনি। এর থেকে বোঝা যায়, আখিরাতে বিশ্বাসীদের দৃষ্টি অবিশ্বাসীদের দৃষ্টি থেকে কতটা আলাদা। একজন তামাশা দেখে অথবা বড়জোর ইতিহাস রচনা করে। আর আরেকজন এসব দেখে নৈতিক শিক্ষা লাভ করে।'

অতীতে যারা বাড়াবাড়ি করেছে তাদের কারো কারো ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। এর অর্থ হচ্ছে, আজকেও যারা সীমালংঘন করে, তারা কখনও পাকড়াও হবে না– এমনটি ভাবা ঠিক নয়। যুলুম-নির্যাতনকারীরা সীমা ছাড়িয়ে গেলে আল্লাহ তাআলা কখনও কখনও তাদেরকে দুনিয়াতেই ধ্বংস করে দেন; শাস্তি দেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'যে সঠিক পথে চলে তার হেদায়াত পাওয়া তার নিজের জন্যই উপকারী। আর যে গোমরাহ হয়ে যায় তার গোমরাহীর আপদ তারই উপর পড়বে। কোন বোঝাবাহক অন্যের বোঝা বইবে না। (মানুষকে হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝাবার জন্য) কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি আযাব দেই না। যখন আমি কোন এলাকাকে ধ্বংস করার জন্য ইচ্ছা করি তখন আমি তাদের ধনী লোকদেরকে হুকুম দেই এবং তারা সেখানে নাফরমানী করতে থাকে। তখন আযাবের ফায়সালা ঐ জনপদের উপর ধার্য হয়ে যায় এবং আমি তা বরবাদ করে দেই।' (সূরা বনী ইসরাইল : ১৫-১৭)

আজকের যুগেও যারা যুলুম করে, আল্লাহ তাআলা আদ-ছামূদসহ অতীত জাতির মতো তাদেরকেও ধ্বংস করতে পারেন। আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

'(হে নবী!) এখন এরা যদি মুখ ফিরিয়ে রাখে তাহলে তাদেরকে বলে দিন, 'আদ ও ছামূদ জাতির উপরে যে ধরনের আযাব হঠাৎ নাযিল হয়েছিল, তোমাদেরকে আমি তেমনি আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। যখন আল্লাহর রাসূলগণ সামনে ও পেছনে সব দিক থেকে আসলেন এবং তাদেরকে বুঝালেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না, তখন তারা বলল, আমাদের রব ইচ্ছা করলে ফেরেশতা পাঠাতে পারতেন। তাই তোমাদেরকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে তা আমরা মানি না।' (সূরা হা-মীম সাজদাহ : ১৩-১৪)

আল কুরআনে পরিষ্কারভাবে একটি কথা তুলে ধরা হয়েছে যে, কেউ যুলুম না করলে কোন জনপদ আল্লাহ ধ্বংস করেন না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ
وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِينَ ۝ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيٓ أُمِّهَا رَسُولًا
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰٓى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظٰلِمُونَ ۝

'এমন কত জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যেখানকার লোকেরা তাদের ধন-সম্পদের অহংকার করত। ঐ যে তাদের বাড়ি-ঘর পড়ে আছে, যেখানে তাদের পর কম লোকই বসবাস করেছে। শেষ পর্যন্ত আমি (ঐসবেরই) ওয়ারিস হয়েছি। (হে নবী!) আপনার রব কোন এলাকাকে সেখানকার কেন্দ্রীয় স্থানে এমন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত ধ্বংস করেন না, যে রাসূল তাদের কাছে আমার আয়াত শোনায়। আমি কোন জনপদকে সেখানকার অধিবাসীরা যালিম না হওয়া পর্যন্ত ধ্বংস করি না।' (সূরা কাসাস : ৫৮-৫৯)

আরো ইরশাদ হয়েছে,

'তাদের কাছে কি তাদের আগের লোকদের খবর পৌঁছেনি? নূহের কাওম, আদ ও ছামূদ, ইবরাহীমের কাওম, মাদায়েনের বাসিন্দা ও ঐসব বস্তি, যা উল্টিয়ে ফেলা হয়েছে? তাদের কাছে রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং তাদের উপর যুলুম করা আল্লাহর কাছে ছিল না, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছে।' (সূরা তাওবাহ : ৭০)

কুরআনে আরেকটি বিষয় পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, রাসূলদের বাণী মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণেই আল্লাহ্ তাআলা বিভিন্ন যুগে যালিমকে শাস্তি প্রদান করেছেন। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে

'নূহের কাওমেরও একই দশা হলো। তারা যখন রাসূলকে মানতে অস্বীকার করল, তখন আমি তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম এবং দুনিয়াবাসীদের জন্য তাদেরকে একটি শিক্ষামূলক নিদর্শন বানিয়ে দিলাম। আর যালিমদের জন্য এক যন্ত্রনাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি। এভাবেই আদ, ছামূদ ও রাসবাসী এবং তাদের মাঝের যুগগুলোতে বহু লোককে (ধ্বংস করা হয়েছে)। তাদের মধ্যে প্রতিটি কাওমকে আমি (ইতঃপূর্বে ধ্বংস করে দেওয়া কাওমের) উদাহরণ দিয়ে দিয়ে বুঝিয়েছি। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক কাওমকেই ধ্বংস করে দিয়েছি। আর ঐ জনবসতির উপর দিয়ে তো তারা চলাচল করেছে, যার উপর অত্যন্ত মন্দ বৃষ্টিবর্ষণ করা হয়েছিল। তারা কি তাদের অবস্থা দেখেনি? কিন্তু এরা মওতের পর আবার জীবিত হওয়ার কোন আশা রাখে না।' (সূরা ফুরকান : ৩৭-৪০)

আল্লাহ তাআলা অপরাধের কারণে কিছু যালিমকে দুনিয়াতে শাস্তি প্রদান করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

'আমি আদ ও ছামূদ জাতিকে ধ্বংস করেছি। তারা যেখানে থাকত, সেসব জায়গা তোমরা দেখেছ। শয়তান তাদের আমলকে তাদের চোখে সুন্দর দেখাল এবং তাদেরকে সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে রাখল। অথচ তারা যথেষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ছিল। আমি কারূন, ফিরাউন ও হামানকে ধ্বংস করেছি। মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তারা পৃথিবীতে অহংকার করল। অথচ তারা (মূসাকে) ছাড়িয়ে এগুতে পারল না। শেষ পর্যন্ত আমি প্রত্যেককে তার গুনাহর জন্য পাকড়াও করেছি। তারপর তাদের মধ্যে কারো উপর পাথর বর্ষণকারী তুফান পাঠিয়েছি এবং কাউকে এক বিকট শব্দ আঘাত হেনেছে। আর কাউকে মাটিতে ধসিয়ে দিয়েছি ও কাউকে ডুবিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ তাদের উপর যুলুম করেননি। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছিল।' (সূরা আনকাবুত : ৩৮-৪০)

অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণের জন্যই কুরআন মাজীদে এসবের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং এসব ধ্বংসাবশেষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজও বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

'ছামূদ ও আদ জাতি ঐ মহা বিপদকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, যা হঠাৎ ঘটবে। ছামূদকে তো এক কঠিন দুর্ঘটনা দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। আর আদকে এক ভয়ানক তুফানী বাতাস দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। (আল্লাহ্ তাআলা) তাদের উপর একটানা সাত রাত ও আট দিন (এ মহাবিপদ) চাপিয়ে রেখেছিলেন। তুমি (ওখানে থাকলে) দেখতে যে, তারা খেজুর গাছের পচা কাণ্ডের মতো লুটিয়ে পড়ে আছে। এখন তাদের কাউকে কি তুমি বেঁচে আছে দেখতে পাও? ফিরাউন, তার আগের লোকেরা এবং উলট-পালট হওয়া বস্তিগুলো এ মহা অন্যায়ই করেছিল। তারা সবাই তাদের রবের রাসূলের কথা অমান্য করেছিল। ফলে তিনি তাদেরকে খুব শক্তভাবে পাকড়াও করলেন। যখন পানির বন্যা সীমা পার হয়ে গিয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে নৌকায় চড়িয়ে দিয়েছিলাম। যাতে ঐ ঘটনাকে তোমাদের জন্য আমি উপদেশপূর্ণ বানাতে পারি এবং মনে রাখার যোগ্য কান এটাকে হেফাযত করতে পারে।' (সূরা হাক্কাহ : ৪-১২)

যালিমের পরিণতি

এ কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যালিমদেরকে মাঝে মধ্যে দুনিয়াতেও শাস্তি দান করেন। অতীতে সীমা লংঘনকারীদেরকে দুনিয়াতে কিভাবে শাস্তি দিয়েছেন তার কতিপয় উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

নূহ (আ)-এর সময়ের জলোচ্ছ্বাস ও তুফান

নূহ (আ) তাঁর জাতির অবস্থা পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘকাল ধৈর্য ও হিকমতের সাথে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি সুদীর্ঘ নয় শত বছর আল্লাহর দীনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছানোর কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু মাত্র ৪০ জন, মতান্তরে ৮০ জন তাঁর দাওয়াত কবুল করেন। অধিকাংশ মানুষই তাঁর দাওয়াতের শুধু বিরোধিতাই করেনি বরং তাঁর প্রতি মারাত্মক দুর্ব্যবহার করেছে। অবশেষে নূহ (আ) তার জাতির অবাধ্যতার কারণে আল্লাহর কাছে আযাবের জন্য দোয়া করলেন। কুরআনে তা এভাবে উল্লেখ আছে:

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ○ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ○

'নূহ (আ) বললেন, হে আমার রব! এই কাফিরদের একজনকেও দুনিয়ায় থাকার জন্য ছেড়ে দেবেন না। যদি আপনি তাদেরকে ছেড়ে দেন তাহলে তারা আপনার বান্দাদেরকে গোমরাহ করবে। আর এদের বংশে যারাই জন্ম নেবে তারা পাপী ও শক্ত কাফিরই হবে।' (সূরা নূহ : ২৬-২৭)

আল্লাহ তাআলা নূহ (আ)-এর দোয়া কবুল করলেন। তিনি তাঁকে একটি নৌকা তৈরির নির্দেশ দেন। এ বিষয়টি কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

'আমি তাঁর প্রতি ওহী পাঠালাম যে, 'আমার তদারকিতে ও আমার ওহী মোতাবেক একটি নৌকা তৈরি করুন। তারপর যখন আমার হুকুম এসে যাবে এবং চুলায় পানি উথলে উঠবে তখন প্রত্যেক প্রাণী থেকে এক এক জোড়া নিয়ে নৌকায় উঠে যান। আপনার পরিবার পরিজনকে সাথে নিন, একজন ছাড়া, যার বিরুদ্ধে আগেই ফায়সালা হয়ে গেছে। আর যালিমদের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলবেন না। তারা অবশ্যই ডুবে মরবে। তারপর যখন আপনি ও আপনার সাথীগণ নৌকায় সওয়ার হয়ে যাবেন, তখন বলবেন, 'সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে যালিম কাওম থেকে নাজাত দিয়েছেন।' আরও বলুন, 'হে আমার রব, আমাকে

বরকতময় জায়গায় নামিয়ে দিন এবং আপনিই অবতরণের জন্য ভালো জায়গা দিতে পারেন।' (সূরা মুমিনুন : ২৭-২৯)

আল কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ۖ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

'আমি নূহকে তাঁর কাওমের কাছে পাঠালাম। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তুফান তাদেরকে এমন অবস্থায় ঘেরাও করে ফেলল, যখন তারা যালিম ছিল। তারপর আমি নূহকে এবং নৌকার আরোহীদেরকে রক্ষা করলাম এবং (ঐ নৌকাটিকে) আমি দুনিয়াবাসীর জন্য একটি শিক্ষামূলক নিদর্শন বানিয়ে রাখলাম।' (সূরা আনকাবূত : ১৪-১৫)

কুরআনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, প্লাবনের সূচনা হয় একটি বিশেষ চুলা থেকে যার নিচ থেকে পানির প্রবাহ উৎক্ষিপ্ত হয়। তারপর একদিকে আকাশ থেকে মুষলধারে বর্ষণ শুরু হয় এবং অপরদিকে স্থানে স্থানে যমীনের মধ্যে ঝর্নার সৃষ্টি হয়।

সূরা কামার-এ উল্লেখ আছে, 'আমি আসমানের দরজাসমূহ খুলে দিলাম, যার থেকে অবিরাম বর্ষণ হতে থাকল। আর যমীনকেও ফাটিয়ে দিলাম, যার ফলে ভূমি থেকে শুধু পানির প্রবাহ বেরুতে থাকল। আর এ উভয় প্রকারের পানি মিলিত হলো এক পরিকল্পিত কাজে।' (সূরা কামার : ১১-১২)

প্রলয়ংকরী তুফানে সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। বন্যায় নূহ (আ)-এর স্ত্রী ও ছেলে মারা যায়, কারণ তারা উভয়েই ছিলেন নাফরমান। তারা দীনের দাওয়াত কবুল করার পরিবর্তে বিরোধিতা করে। তাই তারা অন্যান্য মানুষের সাথে আযাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আল-কুরআনে তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা কাফিরদের অবস্থা বোঝাবার জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীদ্বয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এই দুজন মেয়েলোক ছিল আমার দুই নেক বান্দার স্ত্রী। তারা দুজনই নিজ নিজ স্বামীর সাথে খেয়ানতের অপরাধ করেছে। কিন্তু নেক স্বামীদ্বয় তাদের জন্য আল্লাহর আযাবের মোকাবেলায় কোন উপকারে আসেনি। বরং তাদের দুজনকেও আদেশ করা হলো, তোমরা অন্যান্যদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর। (সূরা তাহরীম : ১০)

এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়, স্বামী নেককার হলেও স্ত্রী যদি বদকার হয় তাহলে স্ত্রীকে নিজ অপরাধের জন্য শাস্তি ভোগ করতেই হবে। আর স্বামীর দায়িত্ব হচ্ছে, তার স্ত্রীকে হেদায়াতের পথে আহ্বান জানানো। হেদায়াত কবুল না করলে স্বামীকে এজন্য জবাবদিহি করতে হবে না। নূহ (আ)-এর স্ত্রী ও ছেলের ঘটনা থেকে আমরা শিখতে পার যে, আল্লাহর হেদায়াত সবারই নসীবে নেই। কোন নেককার মানুষের স্ত্রী বা স্বামী বা ছেলেমেয়ে এ পরিচয়ে কেউ আখিরাতে নাজাত পাবে না। আখিরাতে নাজাত পাওয়ার মানদণ্ড হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি যথাযথ ঈমান ও তদানুযায়ী আমল। নূহ (আ) আল্লাহর প্রিয় নবী হবার পরও তাঁর স্ত্রী বা ছেলে হবার সুবাদে শাস্তি থেকে কেউ পরিত্রাণ পায়নি।

আদ জাতির প্রতি আযাব: প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া

আদ ছিল আরবের অতি প্রাচীন জাতি। তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল দৃষ্টান্তমূলক। আবার দুনিয়া থেকে তাদের নাম নিশানা মুছে যাওয়াও ছিল দৃষ্টান্তমূলক। কুরআনের বর্ণানুসারে এ জাতির প্রকৃত আবাসস্থল ছিল আহকাফ, যা হেজায, ইয়েমেন এবং ইয়ামামার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এ জাতির ধ্বংসাবশেষ তেমন নেই। তবে দক্ষিণ আরবে কিছু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়, যা আদ জাতির প্রতি আরোপ করা হয়। আল কুরআনে আদ জাতি সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে:

তোমরা কি এ কারণে অবাক হচ্ছ যে, তোমাদের কাওমেরই এক লোকের মারফতে তোমাদের কাছে তোমাদের রবের উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদের সাবধান করে দেয়? এ কথা ভুলে যেও না যে, তোমাদের রব নূহের কাওমের পর তোমাদেরকে তাদের জায়গায় বসিয়েছেন এবং তোমাদেরকে খুব শক্তিশালী করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর কুদরতের মহিমার কথা মনে রেখ। হয়ত তোমরা সফল হবে। (সূরা আ'রাফ : ৬৯)

আদ জাতি তাদের শক্তিমত্তায় গর্বিত ছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝

'(হে রাসূল!) আপনি দেখেননি, আপনার রব কী ব্যবহার করেছেন, উঁচু থামওয়ালা ইরাম বংশীয় আদ জাতির সাথে? যাদের মতো জাতি দুনিয়ায় আর সৃষ্টি করা হয়নি।' (সূরা ফাজ্র : ৬-৮)

আদ জাতি গর্ব-অহংকার করে বলত, তাদের চেয়ে শক্তিশালী দুনিয়াতে কেউ নেই।

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۝

'আদ জাতির অবস্থা এই ছিল যে, তারা পৃথিবীতে কোন অধিকার ছাড়াই নিজেদেরকে বড় মনে করে বসেছিল এবং বলল, আমাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী কে আছে? তারা কি এটুকু কথাও বুঝলা না, যে আল্লাহ তাদেরকে পয়দা করেছেন তিনি তাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী? তারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকারই করতে থাকল।' (সূরা হা মীম সাজদাহ : ১৫)

আদ জাতির উপর আযাবের কারণ হচ্ছে, নিজেদের বাড়াবাড়ি। তারা আল্লাহর কথা শোনার পরিবর্তে অহংকার করে আযাব দেখার কথা বলে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

'তারা জওয়াব দিল, তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্যই এসেছ, যাতে আমরা শুধু এক আল্লাহ্‌রই ইবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের ইবাদত করত তাদেরকে বাদ দিই? আচ্ছা, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে আমাদের উপর ঐ আযাব নিয়ে আসো দেখি, যার ধমকি আমাদেরকে তুমি দিয়ে থাক। (হূদ) বললেন, তোমাদের উপর তোমাদের রবের লা'নত ও গযব পড়ে গেছে। তোমরা কি আমার সাথে ঐ নামগুলো নিয়ে ঝগড়া করছ, যা তোমারা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছ, এসবের জন্য আল্লাহ কোন সনদ নাযিল করেননি। ঠিক আছে, তোমরাও অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম। অবশেষে আমার মেহেরবানীতে হূদ ও তার সাথীদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম এবং ঐসব লোকের শেকড় কেটে দিলাম, যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করেছিল ও যারা মুমিন ছিল না।' (সূরা আ'রাফ : ৭০-৭২)

আল্লাহ্ তাআলা আদ জাতির উপর কঠোর ঝড়ো হাওয়ার মাধ্যমে আযাব নাযিল করেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ۝ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ۝ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۝

'আদ জাতি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। (দেখ) আমার আযাব ও সাবধানবাণী কেমন ছিল। আমি এক অশুভ দিনে অবিরাম চলতে থাকা কঠিন ঝড়ো হাওয়া তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম। যা লোকগুলোকে উপরে তুলে এমনভাবে ছুড়ে ফেলছিল, যেন তারা উপড়িয়ে ফেলা খেজুর গাছের গুড়ি। (দেখে নাও) আমার আযাব ও সাবধানবাণী কেমন ছিল।' (সূরা কামার : ১৮-২১)

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِيٓ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَخْزٰى ۖ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ○

'অবশেষে আমি কিছু অশুভ দিনে তাদের উপর কঠিন ঝড়ো হাওয়া পাঠিয়ে দিলাম, যাতে তাদেরকে দুনিয়ার জীবনেই অপমানকর আযাবের মজা দেখতে পারে। আর আখিরাতের আযাব তো এর চেয়েও বেশি লাঞ্ছনাময়। সেখানে তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।' (সূরা হা মীম সাজদাহ : ১৬)

ছামূদ জাতির প্রতি আযাব : প্রচণ্ড ভূমিকম্পের মাধ্যমে ধ্বংস

আরবে আদ জাতির পর ছামূদ জাতি সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন করে। এ জাতির বসবাস ছিল আল হিজ্‌র অঞ্চলে। বর্তমানে মদীনা এবং তাবুকের মধ্যবর্তী একটি অঞ্চল 'মাদায়েনে সালেহ' নামে পরিচিত। তাবুক অভিযানকালে নবী করীম (স) সাহাবীদেরকে এসব ধ্বংসাবশেষ দেখান এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেন। তিনি একটি কূপের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এটাই সেই কূপ, যেখান থেকে সালেহ (আ)-এর উটনি পানি পান করত এবং তিনি মুসলমানদেরকে এ কূপ থেকে পানি পানের নির্দেশ দেন।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ছামূদ জাতির বিবরণ এসেছে। তারা বিরাট পাহাড় খোদাই করে দালানকোঠা নির্মাণ করত। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আদ জাতির স্থলাভিষিক্ত করেন। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○

'ঐ সময়ের কথা মনে করে দেখ, যখন আদ জাতির পর তোমাদেরকে তাদের জায়গায় বসিয়েছেন এবং দুনিয়াতে তোমাদেরকে এ মর্যাদা দান করেছেন যে,

তোমরা আজ সমতল জমিনে বিরাট দালান বানাচ্ছ এবং পাহাড় খোদাই করে বাড়ি তৈরি করছ। সুতরাং আল্লাহর কুদরতের মহিমার কথা মনে রেখ এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না।' (সূরা আ'রাফ : ৭৪)

ছামূদ জাতি স্থাপত্য শিল্পে বিরাট উৎকর্ষ লাভ করে। সূরা আল ফজরে সেদিকে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ

'আর (কী ব্যবহার করেছেন) ছামূদ জাতির সাথে, যারা পাথর খোদাই করেছিল।' (সূরা ফজর : ৯)

ছামূদ জাতির নিকট হেদায়াতের রাস্তা পেশ করার পরও তারা অন্ধকারে থাকাকে পছন্দ করে। ফলে তাদের উপর আযাব নিপতিত হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۚ وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

'এখন ছামূদদের কথা। তাদের সামনে আমি সঠিক পথ পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা রাস্তা দেখার চেয়ে অন্ধকারে থাকাই বেশি পছন্দ করল। শেষ পর্যন্ত তারা যা কিছু করছিল এরই কারণে তাদের উপর অপমানকর আযাব ভেঙে পড়ল। আমি তাদেরকে নাজাত দিলাম, যারা ঈমান এনেছিল এবং (গোমরাহী ও বদ আমল থেকে) বেঁচেছিল।' (সূরা হামীম সাজদাহ : ১৭-১৮)

সালেহ (আ)-এর কাওমকে ধ্বংস করা

সালেহ (আ)-এর কাওমের সরদাররা অহংকারী হয়ে উঠে এবং আল্লাহর নির্দেশ লংঘন করে উটনিকে যবেহ করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

তাঁর কাওমের ঐসব সরদার, যারা বড়াই করত তারা ঐ দুর্বল লোক, যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে বলল, তোমরা কি সত্যিই একথা জান যে, সালেহ তার রবেরই রাসূল? তারা জওয়াবে বলল, নিশ্চয়ই! যে বাণীসহ তাকে পাঠানো হয়েছে, এর উপর আমরা ঈমান এনেছি। দাম্ভিকরা বলল, তোমরা যে জিনিসের উপর ঈমান এনেছ, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। তারপর তারা ঐ উটনিকে মেরে ফেলল এবং গর্বের সাথে তাদের রবের হুকুম অমান্য করল। তারা সালেহকে বলল, যদি তুমি সত্য রাসূলদের কেউ হয়ে থাক তাহলে ঐ আযাব নিয়ে এসো, যার ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছ।' (সূরা আ'রাফ : ৭৫-৭৭)

আল্লাহ তাআলা অবশেষে ছামূদ জাতির প্রতি আযাব দান করেন। এ প্রসঙ্গে সূরা শু'আরার ১০৮ নং আয়াতে বর্ণিত আছে যে, 'তাদের উপর আযাব এসে পড়ল'। সূরা হূদের ৬০ নং আয়াতে এসেছে, উক্ত উটনিকে হত্যা করার পর সালেহ (আ) তাদেরকে বললেন, 'তিনদিন ঘরে বসে মজা করে নাও'। এই নোটিশের মুদ্দত শেষ হওয়ার পর শেষ রাতের দিকে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল এবং সাথে সাথে এমন ভূমিকম্পন শুরু হলো যে, মুহূর্তের মধ্যে গোটা জাতিকে লণ্ডভণ্ড করে দিল। পরদিন সকালে দেখা গেল, নিস্পেষিত মৃতদেহগুলো পড়ে আছে। তাদের প্রস্তর নির্মিত প্রাসাদগুলো আর পাহাড়ের মধ্যে খোদাই করা ঘরগুলো তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন,

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ۝

'শেষ পর্যন্ত এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল। ফলে তারা নিজেদের ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ে রইল। সালেহ (আ) এ কথা বলে তাদের বস্তি থেকে বের হয়ে গেল, হে আমার কাওম! আমি আমার রবের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের (যথেষ্ট) কল্যাণ কামনা করেছি। কিন্তু (আমি আর কী করব) তোমরা তো কল্যাণকামীদেরকেই পছন্দ করো না।' (সূরা আ'রাফ : ৭৮-৭৯)

আল্লাহ তাআলা সেই আযাব থেকে সালেহ (আ) ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল শুধু তাদেরকেই রক্ষা করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

'আর ছামূদ জাতির নিকট আমি তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম। তিনি বললেন, হে আমার কাওম! একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ নেই। তিনিই তোমাদেরকে জমিন থেকে পয়দা করেছেন এবং সেখানে তোমাদেরকে আবাদ করেছেন। তাই তোমরা তাঁর কাছে মাফ চাও। তারপর তাঁর কাছে ফিরে এসো। নিশ্চয়ই আমার রব কাছেই আছেন এবং তিনি দোয়া কবুল করেন।

তারা বলল, 'হে সালেহ! এর আগে তুমি আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলে, যার উপর আমাদের বড় আশা ছিল। আমাদের বাপ-দাদা যেসব মাবুদদের পূজা করত তুমি কি আমাদেরকে তাদের পূজা করা থেকে নিষেধ করতে চাও? তুমি আমাদেরকে যেদিকে ডাকছ সে বিষয়ে আমাদের খুব সন্দেহ রয়েছে, যা আমাদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

সালেহ বললেন, হে আমার কাওম! তোমরা ভেবে দেখ, আমি যদি আমার রবের কাছ থেকে এক স্পষ্ট সাক্ষ্যের উপর কায়েম হয়ে থাকি এবং তিনি তাঁর খাস রহমত দিয়ে যদি আমাকে ধন্য করে থাকেন, এ অবস্থায় আমি যদি তাঁর নাফরমানী করি তাহলে কে আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাবে? আমাকে আরও বেশি ক্ষতির মধ্যে ফেলা ছাড়া তোমরা আমার আর কোন কাজে আসতে পার? হে আমার কাওম! এই দেখ আল্লাহর উটনি তোমাদের জন্য এক নিদর্শন। একে আল্লাহর জমিনে স্বাধীনভাবে চড়ে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দাও। একে তোমরা বাধা দিও না। তা না হলে খুব শিগগিরই তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়বে। কিন্তু তারা উটনিটিকে মেরে ফেলল। তখন সালেহ তাদেরকে সাবধান করে দিলেন যে, আর মাত্র তিন দিন তোমাদের বাড়িতে মজা করে নাও। এটা এমন এক মেয়াদ, যা মিথ্যা হবে না। শেষ পর্যন্ত যখন আমার হুকুম এসে গেল, তখন আমার রহমত দিয়ে সালেহকে ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমি বাঁচিয়ে দিলাম এবং ঐ দিনের অপমান থেকে তাদেরকে রক্ষা করলাম। নিশ্চয়ই আপনার রবই আসলে ক্ষমতাশালী ও মহাশক্তিমান। আর যারা যুলুম করেছিল, তাদেরকে এক বিকট আওয়াজ ধরে ফেলল এবং তারা নিজেদের বাড়িঘরে এমন উপুড় হয়ে পড়ে রইল, যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করেনি। শুনে রাখ, ছামূদ তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে। জেনে রাখ, ছামূদ জাতিকে দূরে ফেলে দেওয়া হয়েছে।' (সূরা হুদ : ৬১-৬৮)

লুত (আ)-এর জাতির অধঃপতন

ইবরাহীম (আ)-এর দুই ভাই ছিলেন। নাহুর এবং হারান। লূত ছিলেন হারানের পুত্র এবং ইবরাহীমের ভাইপো। তিনি ইবরাহীম (আ)-এর সাথে ইরাক থেকে বের হয়ে শাম, ফিলিস্তিন ও মিসরে আগমন করে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দেন। তিনি বর্তমান জর্দান অঞ্চলে বাস করতেন। বর্তমানে অঞ্চল 'ডেড সী' হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে অনেক পর্যটক উক্ত ধ্বংসাবশেষ দেখতে যান। লূতের জাতির অধঃপতনের কারণ কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

আমি লূতকে নবী বানিয়ে পাঠালাম। যখন তিনি তাঁর কাওমকে বললেন, তোমরা কি এমন বেহায়া হয়ে গেছ যে, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা দুনিয়াতে তোমাদের আগে কেউ করেনি? তোমরা নারীদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষ থেকে তোমাদের যৌনক্ষুধা মিটাও। আসলে তোমরা একেবারেই সীমালজ্ঘনকারী লোক। কিন্তু তার কাওমের জওয়াব এ ছাড়া আর কিছু ছিল না যে, তোমাদের এলাকা থেকে এদেরকে বের করে দাও। এরা বড় পবিত্রতা (বাহাদুরী) দেখাচ্ছে।

অবশেষে আমি লূত ও তার পরিবারকে বাঁচিয়ে দিলাম। তার স্ত্রীকে ছাড়া, যে তাদের মধ্যে শামিল ছিল, যারা পেছনে পড়ে রইল। ঐ কাওমের উপর আমি এক বৃষ্টিবর্ষণ করলাম। তারপর দেখ যে, ঐ অপরাধীদের কেমন দশা হলো।' (সূরা আ'রাফ : ৮১-৮৪)

'সৃষ্টিজগতে শুধু তোমরাই কি (যৌন উদ্দেশ্যে) পুরুষদের কাছে যাও? আর তোমাদের রব তোমাদের নারীদের মধ্যে যা সৃষ্টি করেছেন, তা কি বাদ দিয়ে থাক? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী কাওম। তারা বলল, হে লূত! যদি তুমি এসব কথা বলা বন্ধ না কর, তাহলে আমাদের এলাকা থেকে যাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে, তোমাকেও তাদের মধ্যে শামিল হতে হবে। লূত (আ) বললেন, তোমাদের কাজের জন্য যারা অসন্তুষ্ট আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে শামিল আছি। হে আমার রব! এরা যা কিছু করছে তা থেকে আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে নাজাত দাও। অবশেষে তাঁকে ও তাঁর পরিবারের সবাইকে রক্ষা করলাম। শুধু এক বুড়ি (তাঁর স্ত্রী) ছাড়া, যে তাদের মধ্যে গণ্য ছিল, যারা পেছনে থেকে যায়। তারপর আমি বাকি লোকদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। তাদের উপর আমি এক বৃষ্টিধারা বর্ষণ করলাম। যাদেরকে এর ভয় দেখানো হয়েছিল। তাদের উপর বর্ষিত এ বৃষ্টি খুবই মন্দ ছিল। নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা নিদর্শন রয়েছে। আর তাদের বেশির ভাগ লোকই মুমিন ছিল না। নিশ্চয়ই আপনার রব অত্যন্ত শক্তিশালী ও মেহেরবান।' (সূরা শু'আরা : ১৬৫-১৭৫)

'যখন আমার ফেরেশতারা লুতের কাছে পৌঁছল, তখন তিনি তাদের আগমনে খুব ঘাবড়ে গেলেন। তাঁর মন ছোট হয়ে গেল। তিনি (মনে মনে) বললেন, আজ বড়ই বিপদের দিন। ঐ (মেহমানদেরকে দেখে) ঐ কাওমের লোকেরা দৌড়ে আসতে লাগল। এর আগেও এরা এরকম মন্দ কাজে লিপ্ত ছিল। লূত (আ) তাদেরকে বলল, হে আমার কাওম! এই যে আমার মেয়েরা রয়েছে। তোমাদের জন্য এরা বেশি পবিত্র। আল্লাহকে ভয় করো। আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপদস্থ করো না। তোমাদের মধ্যে কি একজনও ভালো মানুষ নেই? তারা জওয়াব দিল, তুমি তো জান যে, তোমার মেয়েদের উপর আমাদের কোন অধিকার নেই। আমরা কী চাই তুমি তা অবশ্যই জান। লূত (আ) বলল, হায় তোমাদেরকে সোজা করে দেবার শক্তি যদি আমার থাকত! অথবা আশ্রয় নেবার মতো কোন মযবুত শক্তি যদি পেতাম। তখন ফেরেশেতারা বলল, হে লূত! আমরা আপনার রবের পক্ষ থেকে পাঠানো ফেরেশতা। এরা আপনার কিছুই করতে পারবে না। আপনি কিছু রাত বাকি থাকতেই আপনার পরিবার নিয়ে বের হয়ে

যান। আর লক্ষ রাখুন, আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পেছনে না তাকায়। কিন্তু আপনার স্ত্রী আপনার সাথে যাবে না। কারণ, তাদের উপর যা ঘটবে তার উপরও তা-ই ঘটবে। তাদের ধ্বংসের জন্য সকালের সময়টা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সকাল হতে আর কতইবা দেরি? যখন আমার ফায়সালার সময় এসে গেল, তখন আমি ঐ এলাকার উপরিভাগকে নিচে উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর পাকা মাটির পাথর বৃষ্টির মতো বর্ষণ করলাম, যার প্রতিটি পাথর আপনার রবের নিকট চিহ্নিত ছিল। আর যালিমদের থেকে এ সাজা মোটেই দূরে নয়।' (সূরা হূদ : ৭৭-৮৩)

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাগণ সুদর্শন যুবকের বেশে লূত (আ)-এর বাড়িতে পৌছার পর তাঁর জানা ছিল না যে, তাঁরা ফেরেশতা ছিলেন। তাই খুব বেশি চিন্তিত হয়ে বললেন, আমার মেহমানকে নিয়ে আমাকে লাঞ্ছিত করো না। লূত (আ)-এর এই উক্তি থেকে তাঁর জাতির লাম্পট্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। লূত (আ) তাঁর কাওমকে লাম্পট্য ছেড়ে দেওয়ার কথা বলায় তারা তাঁকে জানিয়ে দেয় যে, হে লূত! এসব কথা থেকে যদি বিরত না হও অথবা আমাদের কাজের প্রতিবাদ করো তাহলে আমাদের বস্তি থেকে তোমাকে বের করে দেওয়া হবে।

কুরআনে এ বিষয়টি এভাবে উল্লেখ আছে:

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ○

'কিন্তু তাঁর কাওমের এছাড়া আর কোন জওয়াব ছিল না যে, তারা বলল, 'লূতের পরিবারকে তোমাদের এলাকা থেকে বের করে দাও। এরা বড় পাক-পবিত্র সেজে আছে।' (সূরা নামল : ৫৬)

সূরা আনকাবূতে এ ঘটনা এভাবে বর্ণিত আছে:

'আমি লূতকে পাঠালাম। যখন তিনি তাঁর কাওমকে বললেন, তোমরা তো এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের আগে দুনিয়াবাসীর মধ্যে কেউ করেনি। তোমাদের অবস্থা কি এই নয় যে, (যৌন উদ্দেশ্যে) তোমরা পুরুষদের কাছে যাচ্ছ, রাহাজানি করছ এবং তোমাদের মজলিসে তোমরা মন্দ কাজ করছ? তারপর তাঁর কাওমের পক্ষ থেকে এ কথা ছাড়া আর কোন জওয়াবই ছিল না যে, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে আল্লাহর আযাব নিয়ে আসো দেখি। লূত (আ) বললেন, হে আমার রব! এ ফাসাদীদের কাওমের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো।

আমার পাঠানো (ফেরেশতারা) যখন সু-খবর নিয়ে ইবরাহীমের কাছে পৌঁছল, তারা তাঁকে বলল, আমরা এ এলাকার লোকদেরকে ধ্বংস করে দেব। নিশ্চয়ই এর অধিবাসীরা বড়ই যালিম হয়ে গেছে। ইবরাহীম (আ) বললেন, সেখানে তো লূত আছে। তারা বলল, আমরা জানি, তবে তার নারীকে নয়। সে তাদের মধ্যে গণ্য, যারা পেছনে পড়ে থাকে। তারপর যখন আমার পাঠানো ফেরেশতারা লূতের কাছে পৌঁছল, তখন লূত খুব পেরেশান হলেন এবং তাঁর মন খুব দমে গেল। তারা বলল, আপনি ভয় পাবেন না এবং দুঃখিতও হবেন না। আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারকে রক্ষা করব। আপনার স্ত্রীকে ছাড়া। সে পেছনে পড়ে থাকা লোকদের মধ্যে গণ্য। আমরা এ জনপদের অধিবাসীদের উপর আসমান থেকে আযাব নাযিল করতে যাচ্ছি, ঐসব ফাসেকী কাজের জন্য, যা তারা করে আসছে। আমি ঐ এলাকাটিকে একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন বানিয়ে রেখেছি। তাদের জন্য, যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে।' (সূরা আনকাবূত : ২৮-৩৫)

সূরা হিজরে এ ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

'শেষ পর্যন্ত পূর্বদিক আলোকিত হতেই এক বিকট শব্দ তাদেরকে ধরে ফেলল। তারপর তাদের ঐ জনপদটিকে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে ফেললাম এবং তাদের উপর পাকা মাটির পাথরের বৃষ্টিবর্ষণ করলাম। এ ঘটনায় চিন্তাশীল লোকদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। আর ঐ এলাকাটি মানুষের চলাচলের পথের পাশেই রয়েছে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে মুমিনদের জন্য শিক্ষার খোরাক রয়েছে। আইকার অধিবাসীরাও যালিম ছিল। দেখে নাও যে, আমরা তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছি। ঐ দুটো কাওমের পতিত এলাকা খোলা রাস্তার উপরেই আছে। হিজরের অধিবাসীরাও রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে। আমি তাদের কাছে আমার আয়াত পাঠিয়েছি, আমার নিদর্শন দেখিয়েছি। কিন্তু তারা এসব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা পাহাড় খোদাই করে বাড়ি বানাতো এবং এতে তারা নিশ্চিত ছিল। অবশেষে এক বিকট শব্দ তাদেরকে সকাল হতে হতেই এসে ধরল। তারা যা কামাই করেছিল তা তাদের কোন কাজেই আসল না। আমি আসমান ও জমিনকে এবং দু'দুটোর মধ্যে যা কিছু আছে সবকেই হক (সত্য) ছাড়া আর কোন ভিত্তিতে পয়দা করিনি। ফায়সালার সময় অবশ্যই আসবে। তাই হে নবী! আপনি তাদেরকে ভদ্রভাবে মাফ করে দিন। নিশ্চয়ই আপনার রব সব কিছুরই স্রষ্টা এবং সব কিছুই জানেন।' (সূরা হিজর : ৭৩-৮৪)

তাফসীরে উল্লেখ আছে, সম্ভবত লূত (আ)-এর কাওমের উপর আযাব এসেছিল– ভয়ানক ভূমিকম্প এবং অগ্নি উদগীরণকারী বিস্ফোরণের আকারে। ভূমিকম্প সে

জনপদকে ওলট-পালট করে দেয় এবং অগ্নি উদগীরণকারী পদার্থ বিস্ফোরিত হয়ে তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করেছিল। সে সময় লূত (আ)-এর একটি ঘর ছাড়া আর কোন ঘরে ঈমানের আলো ছিল না। আর লূত (আ)-এর ঘরেও তাঁর স্ত্রী নাফরমান ছিল। তাই সেও ধ্বংস হয়ে যায়। বর্তমানেও সেই ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তাআলা এটাকে সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে রেখেছেন। এখনও উক্ত স্থানসমূহ পরিদর্শন করার সময় লূত (আ)-এর বাড়ি একটি পাহাড়ের উপর আর উক্ত পাহাড়ের কাছেই 'ডেড সী'- মৃত সাগর ও ধ্বংসলীলার ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

আহলে মাদইয়ান-এর প্রতি আযাব

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক-এর বর্ণনা অনুসারে শু'আইব (আ) ছিলেন ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র মাদইয়ানের বংশধর। লূত (আ)-এর সাথেও তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তাঁর বংশধরও মাদইয়ান নামে খ্যাত হয়েছে। শু'আইব (আ) যে সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন, কুরআনের কোথাও তাদেরকে আসহাবে মাদইয়ান আর কোথাও আসহাবে আইকাহ বলা হয়েছে। অবশ্য কারো কারো মতে, এ দু'টি আলাদা জাতি। শু'আইব এ দুই জাতির প্রতিই নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। শু'আইব (আ) তাঁর কাওমকে আল্লাহর আনুগত্য করার আহ্বান জানান। কিন্তু তার কাওম উক্ত আহ্বানে সাড়া দেওয়ার পরিবর্তে তাঁকে এলাকা থেকে বিতাড়িত করার ঘোষণা দেয়।

এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

'আমি মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শু'আইবকে পাঠালাম। তিনি বললেন, হে আমার কাওম! আল্লাহর দাসত্ব করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর স্পষ্ট দলীল এসে গেছে। তাই ওজন ও দাঁড়িপালা পুরা করো। মানুষকে তাদের জিনিস কম দিও না এবং সংশোধনের পর তোমরা দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না। তোমরা যদি সত্যি মুমিন হও তাহলে এর মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ রয়েছে। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ভয় দেখাবার জন্য, তাদেরকে আল্লাহর রাস্তা থেকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে এবং সরল পথকে বাঁকা করার নিয়তে (জীবনের) প্রতিটি পথে ডাকাত সেজে বসো না। ঐ সময়ের কথা মনে করে দেখ, যখন তোমরা (সংখ্যায়) কম ছিলে, তারপর আল্লাহ তোমাদের (সংখ্যা) বেশি করে দিলেন। চোখ খুলে দেখ যে, দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে। আমাকে যে

শিক্ষাসহ পাঠানো হয়েছে, এর প্রতি যদি তোমাদের একদল ঈমান আনে এবং আর একদল ঈমান না আনে তাহলে সবরের সাথে দেখতে থাক, যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেন। আর তিনিই সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী। (শু'আইবের) কাওমের সরদারদের যারা বড়াই করত, তারা বলল, হে শু'আইব! আমরা তোমাকে এবং যারা তোমার সাথে ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের এলাকা থেকে বের করে দেব। অথবা তোমাদেরকে আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসতে হবে। শু'আইব এর জওয়াবে বললেন, আমরা রাজি না হলেও (আমাদেরকে কি জোর করে ফিরিয়ে নেওয়া হবে)? (শু'আইব আরো বললেন,) আল্লাহ আমাদেরকে (তোমাদের মিল্লাত থেকে) নাজাত দেবার পরও যদি আমরা তোমাদের মিল্লাতে ফিরে যাই তাহলে আমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারী হয়ে যাব। আমাদের রব আল্লাহ যদি (তা-ই) চান তাহলে আলাদা কথা। তা না হলে আমাদের পক্ষে ঐদিকে ফিরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারেই আমাদের রবের ইলম আছে। আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করে আছি। হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের কাওমের মাঝে ঠিক ঠিক ফায়সালা করে দিন। আর আপনিই তো সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী।' (সূরা আ'রাফ : ৮৫-১০২)

উক্ত আয়াতসমূহ থেকে জানা যায় যে, মাদইয়ানবাসী যখন হযরত শু'আইব (আ)-এর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে দেয় তখন তাদের উপর ভয়ানক ভূমিকম্প বিস্ফোরণের আকারে শাস্তি নেমে আসে। তাদের ধ্বংসলীলা দীর্ঘকাল ধরে পার্শ্ববর্তী জাতিসমূহের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল। আল্লাহ তাআলা মাদইয়ানবাসীর মতো আইকাহবাসীকেও আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেন। সূরা শু'আরার ১৮৯ নং আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 'তারা তাকে মিথ্যা মনে করেছিল। অবশেষে ছাতাবিশিষ্ট দিনের আযাব তাদের উপর এসে পড়ল। আর সে ছিল এক ভয়ঙ্কর দিনের আযাব।'

ফেরাউনের সলিল সমাধি

ফেরাউনের সীমালঙ্ঘনের কথা সকলেরই জানা রয়েছে। ফেরাউন যখন মূসা (আ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে পাকড়াও করার জন্য পেছন থেকে চেষ্টা করে তখন আল্লাহ তাআলা মূসা (আ) ও তাঁর অনুসারীদের জন্য নদীতে বারটি রাস্তা করে দেন। সেই রাস্তা দিয়ে মূসা ও তাঁর অনুসারীরা নদী পার হয়ে যায়। কিন্তু একই রাস্তা দিয়ে ফেরাউন যখন নদীর মাঝপথে যায়, আল্লাহর নির্দেশে দুই দিক থেকে পানি

একাকার হয়ে যায়। ফলে ফেরাউন পানিতে ডুবে মারা যায়। ফেরাউন ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে শাস্তি দেয়ার কথা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত আছে।

এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে: 'আর কিলকধারী ফেরাউনের সাথে (কী ব্যবহার করেছেন)? এরা ঐসব লোক, যারা দেশে দেশে বিদ্রোহ ও সীমালংঘন করেছিল। এবং সেখানে ব্যাপক ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল। শেষে আপনার রব তাদের উপর আযাবের চাবুক মেরেছিলেন। আসলে আপনার রব ঘাঁটিতে ওঁত পেতে আছেন। কিন্তু মানুষের অবস্থা এই যে, যখন তার রব তাকে পরীক্ষা করে এবং তাকে ইজ্জত ও নিয়ামত দেয়, তখন সে বলে আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন তাকে পরীক্ষা করে ও তার রিযক কমিয়ে দেয়, তখন সে বলে, আমার রব আমাকে অপমানিত করেছেন।' (সূরা আল ফজর : ১০-১৬)

আল্লাহ তাআলা কিভাবে ফেরাউনকে নীলনদে ডুবিয়ে মারেন এবং মূসা ও তাঁর অনুসারীদেরকে রাস্তা বানিয়ে নদী পার করিয়ে রক্ষা করেন তা কুরআনে চমৎকারভাবে বর্ণিত আছে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

হে বনী ইসরাঈল! আমার ঐ নিয়ামতের কথা মনে করো, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম এবং এ কথাও মনে করো যে, আমি তোমাদেরকে সকল জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। ঐ দিনটিকে ভয় করো, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, কারো পক্ষ থেকে কোন সুপারিশ কবুল হবে না, কাউকে ফিদইয়া নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে না এবং কোন অপরাধী কোথাও থেকে সাহায্য পাবে না। ঐ সময়ের কথা মনে করো, যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউনি শক্তির গোলামি থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম। তারা তোমাদেরকে কঠিন আযাব দিচ্ছিল–তোমাদের ছেলেদেরকে যবেহ করত এবং তোমাদের মেয়েদেরকে বেঁচে থাকতে দিত। এ অবস্থাটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য বিরাট পরীক্ষা ছিল। ঐ সময়ের কথা মনে করো, যখন আমি সাগর চিরে তোমাদের জন্য পথ করে দিয়েছিলাম এবং তার মধ্য দিয়ে তোমাদেরকে পার করে দিয়ে ফেরাউনের গোষ্ঠীকে তোমাদের চোখের সামনে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। আরও মনে করে দেখ, যখন আমি মূসাকে চল্লিশ রাতের সময় ঠিক করে ডেকেছিলাম, আর তাঁর চলে যাবার পর তোমরা বাছুরকে মাবুদ বানিয়ে বসলে, তখন তোমরা বড়ই বাড়াবাড়ি করছিলে। এরপরও আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছিলাম, যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর। মনে করে দেখ, (তোমরা যখন এমন বাড়াবাড়ি করছিলে

ঠিক ঐ সময়) আমি মূসাকে কিতাব ও ফোরকান দিলাম, যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পার। আরও মনে করে দেখ, যখন মূসা (এ নিয়ামত নিয়ে জাতির কাছে ফিরে এলেন তখন তিনি) তার কাওমকে বললেন, 'হে আমার জাতি! বাছুরকে মাবুদ বানিয়ে তোমরা নিশ্চয়ই নিজেদের উপর কঠিন যুলুম করেছ। সুতরাং তোমাদের স্রষ্টার নিকট তাওবা করো, নিজেরাই নিজেদের জীবন বিনাশ কর। এর মধ্যেই তোমাদের স্রষ্টার নিকট তোমাদের মঙ্গল রয়েছে। তখন তোমাদের স্রষ্টা তোমাদের তাওবা কবুল করে নিলেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল এবং খুবই মেহেরবান। মনে করে দেখ, যখন তোমরা মূসাকে বলেছিলে, আল্লাহকে প্রকাশ্যে (তোমার সাথে কথা বলতে) না দেখা পর্যন্ত তোমার কথা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করব না, তখন তোমরা দেখতে পেলে, এক ভয়ানক আযাব তোমাদের ঘিরে ফেলল। তোমরা মরে পড়েছিলে, তারপর আমি আবার তোমাদেরকে বাঁচিয়ে তুললাম, যাতে (এ অনুগ্রহের পর) তোমরা কৃতজ্ঞ হও। আমি তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দিয়েছি, মান্না ও সালওয়া খাদ্য হিসেবে দান করেছি, তোমাদেরকে বলেছি, যত পবিত্র জিনিস তোমাদেরকে দান করেছি তা থেকে তোমরা খাও। কিন্তু (তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা যা কিছু করেছে) তাতে আমার উপর যুলুম হয়নি; বরং তারা নিজেদের উপরই যুলুম করেছে। তারপর মনে করে দেখ, যখন আমি তোমাদেরকে বললাম, তোমাদের সামনে যে জনপদ রয়েছে তাতে ঢুকে পড়, এতে যা সৃষ্টি হয় তা যেভাবে চাও মজা করে খাও; কিন্তু জনপদে ঢুকবার সময় এর দরজায় নত হয়ে ঢুকবে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে থাকবে। তাহলে তোমাদের ভুলত্রুটি মাফ করে দেব এবং নেক লোকদের উপর আরও বেশি দয়া করব। কিন্তু যে কথা বলা হয়েছিল, যালিমরা তা বদলিয়ে ফেলল। শেষ পর্যন্ত আমি যালিমদের উপর আসমান থেকে আযাব নাযিল করলাম। তারা যে অবাধ্যতা করছিল এটা তারই শাস্তি ছিল। ঐ কথা মনে করো, যখন মূসা তার কাওমের জন্য পানি চেয়ে দোয়া করল, তখন আমি বললাম যে, অমুক পাথরের উপর তোমার লাঠি মারো। ফলে তা থেকে বারোটি ঝরনা বের হলো এবং প্রত্যেক গোত্র জেনে নিল যে, তার পানি নেবার জায়গা কোন্‌টি। (তখন তাদেরকে হেদায়াত করা হয়েছিল যে,) আল্লাহর দেওয়া রিযক খাও ও পান কর এবং দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াবে না। মনে করে দেখ, যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা একই ধরনের খাবার পেয়ে সবর করতে পারি না। আপনার রবের কাছে দোয়া করুন, যেন আমাদের জন্য জমিন থেকে শাক-সবজি, তরি-তরকারি, গম, রসুন, পেঁয়াজ, ডাল ইত্যাদি পয়দা করেন। তখন মূসা (আ) বললেন, তোমরা কি একটা ভালো

জিনিসের বদলে নিকৃষ্ট জিনিস নিতে চাও? তাহলে তোমরা কোন শহরে যেয়ে থাক, তোমরা যা চাচ্ছ তা সেখানে পাবে। অবশেষে অবস্থা এই হলো যে, তাদের উপর অপমান ও লাঞ্ছনা এবং অবনতি ও দূরবস্থা নেমে এল এবং তারা আল্লাহর গযবে পতিত হলো। এ অবস্থা এ জন্য হলো যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতে লাগল এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে কতল করতে থাকল। অবাধ্য হবার কারণে এবং শরীআতের সীমা থেকে বের হয়ে যাবার দরুনই তাদের এ দশা হয়েছে।' (সূরা বাকারা : ৪৭-৬১)

কুরআন থেকে জানা যায়, মূসার সঙ্গী-সাথিদের কেউ কেউ মূসার অনুপস্থিতিতে গো-বাছুর পূজা শুরু করে দেয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

'তোমাদের কাছে মূসা স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন। তা সত্ত্বেও তোমরা এমন যালিম ছিলে যে, তিনি অনুপস্থিত হওয়ার সাথে সাথেই তোমরা বাছুরকে মাবুদ বানিয়ে বসলে। তুর পাহাড়কে তোমাদের উপর তুলে ধরে তোমাদের কাছ থেকে আমি যে ওয়াদা নিয়েছিলাম, সে কথা মনে করে দেখ। আমি তাকীদ দিয়ে বলেছিলাম, আমি যে হেদায়াত দিচ্ছি তা খুব মযবুতভাবে পালন করো এবং তা কান লাগিয়ে শুন। তোমাদের বাপ-দাদারা বলল, আমরা শুনলাম, কিন্তু আমরা মানব না। তাদের কুফরীর অবস্থা এমনই ছিল যে, তাদের দিলে বাছুরই কায়েম হয়েছিল। তাদেরকে বলুন, তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক তাহলে তোমাদের ঈমান বড়ই অদ্ভুত, যা এ ধরনের খারাপ কাজের হুকুম দেয়।' (সূরা বাকারা : ৯২-৯৩)

কারূন সম্পর্কে কুরআন থেকে এটুকু জানা যায় যে, সে মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের রেওয়ায়েত থেকে বলা হয়েছে যে, কারূন তাওরাতের হাফেয ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কপট বিশ্বাসী প্রমাণিত হলো। আর তার কপট বিশ্বাসের কারণ ছিল পার্থিব সম্মান ও অর্থলোভ। সাঈদ ইবন মুসাইয়্যিব বলেন, কারূন ছিল খুবই অর্থশালী। ফেরাউন তাকে বনী ইসরাইলের দেখাশোনার দায়িত্ব প্রদান করে। তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ আছে যে, এ পদে থাকা অবস্থায় সে ধন-দৌলতের নেশায় বিভোর হয়ে বনী ইসরাঈলের উপর নির্যাতন চালায় এবং সম্পদ কুক্ষিগত করে। আতা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সে ইউসুফ (আ)-এর একটি বিরাট ভূগর্ভস্থ ধন-ভাণ্ডার প্রাপ্ত হয়েছিল। এভাবে সে প্রচুর সম্পদের মালিক হয়ে যায়। আল্লামা আলুসী বলেন, কারূনের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে গুদাম ছিল তার চাবির পরিমাণ ও ওজন এত অধিক ছিল যে, বিরাট সংখ্যক লোকের পক্ষেও তা সহজে বহন করা কষ্টকর ছিল। কুরআন থেকে জানা যায়, ধন-সম্পদ অর্জিত

হওয়ার পর সে আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয় এবং ধন সম্পদে ফকীর-মিসকীনের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতেও অস্বীকৃতি জানায়। ফলে তাকে ধন-ভাণ্ডারসহ ভূগর্ভে বিলীন করে দেওয়া হয়।

এ প্রসঙ্গটি আল্লাহ তাআলা কুরআনে এভাবে তুলে ধরেছেন:

'কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। অতঃপর সে তাদের প্রতি দুষ্টামি করতে আরম্ভ করল। আমি তাকে এত ধন-ভাণ্ডার দান করেছিলাম, যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলল দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে ভালবাসেন না। আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তা দ্বারা আখিরাতের ঘর তৈরির চিন্তা কর। আর দুনিয়া থেকেও নিজের হিস্যার কথা ভুলে যেও না। আল্লাহ তোমার উপর যেমন দয়া করেছেন, তুমিও (মানুষের প্রতি) দয়া কর। পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদকারীদের পছন্দ করেন না।' (সূরা কাসাস : ৭৬-৭৭)

আবরাহার হস্তিবাহিনী ও পাথর বৃষ্টি বর্ষণ

আবরাহা ছিল ইয়েমেনের বাদশাহ। সে ৫৭০ বা ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে ৬০ হাজার পদাতিক ও ১৩টি হাতি নিয়ে মক্কা আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। তার বাহিনী আ'রাফাত ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে পৌছলে আব্দুল মোত্তালিব তার কাছে গিয়ে বলেন, 'আপনার এখানে আসা কী প্রয়োজন ছিল। আপনার কোন জিনিসের প্রয়োজন হলে আমাদের কাছে সংবাদ দিলে আমরা নিজেরাই সে জিনিস নিয়ে আপনার কাছে যেতাম। জবাবে সে বলল, শুনেছি মক্কায় অবস্থিত কাবা শান্তি ও নিরাপত্তার ঘর আমি এর শান্তি শেষ করতে এসেছি। আব্দুল মোত্তালিব বললেন, এটি আল্লাহর ঘর। আজ পর্যন্ত কাউকে এর উপর চেপে বসতে দেননি। আবরাহা জবাব দেয়, আমি একে বিধ্বস্ত না করে এখান থেকে যাব না। আব্দুল মোত্তালিব অনুরোধ করে বলেন যে, আপনি যা কিছু চান আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যান।' কিন্তু আবরাহা তা অস্বীকার করে নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে কাবা অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। আবরাহার কাছ থেকে ফিরে এসে আব্দুল মোত্তালিব কুরাইশদেরকে পরিবার-পরিজন নিয়ে পাহাড়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে বলেন। কারণ, তারা আবরাহার এত বড় বাহিনীর মোকাবেলা করার শক্তি রাখত না।

আব্দুল মোত্তালিব সকলকে পাহাড়ে আত্মরক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে কয়েকজন সরদারসহ কাবা শরীফে এসে কাবার দরজার কড়া ধরে আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করেন যে, হে আমার রব! তাদের মোকাবেলায় তুমি ছাড়া কারো প্রতি

আমার আশা নেই। হে আমার রব! তাদের হাত থেকে তোমার হারামকে রক্ষা কর। এই ঘরের শত্রু, তোমার শত্রু। তোমার জনপদ ধ্বংস করা থেকে তাদেরকে বিরত রাখ। হে আল্লাহ! বান্দাহ নিজের ঘর রক্ষা করে। তুমিও তোমার ঘর রক্ষা কর। আগামীকাল তাদের ক্রুশ ও তাদের কৌশল যেন তোমার কৌশলের ওপর বিজয় লাভ না করে।

এ দোয়া করে আব্দুল মোত্তালিব ও তার সাথীরা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। পরের দিন আবরাহা মক্কা আক্রমণের জন্য সামনে অগ্রসর হতেই তার হাতী বসে পড়ে। তাকে কুড়ালের বাট দিয়ে অনেক আঘাত করার পরও একটুও নড়েনি। মক্কা ছাড়া অন্যদিকে তাকে ছুটতে বললে দ্রুত চলে; কিন্তু মক্কার দিকে মুখ ফিরিয়ে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ে। এ সময় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা ঠোঁট ও পাখায় ছোট ছোট পাথরকণা নিয়ে উড়ে এসে সেনাসদস্যদের উপর পাথর বর্ষণ করতে শুরু করে। যার গায়ে পাথর পড়ত তার দেহ সঙ্গে সঙ্গে গলে যেত। অনেকের বসন্তরোগ হয়। কারো শরীরে ভীষণ চুলকানি শুরু হয়। চুলকাতে চুলকাতে চামড়া ছিঁড়ে গোশত ঝরে পড়তে থাকে। আবরাহা নিজেও এ অবস্থার সম্মুখীন হয়। তার গোশত ও রক্ত পানির মতো ঝরত এবং হাড় বের হয়ে যেত। যেখান থেকে এক টুকরা গোশত খসে পড়ত সেখানে রক্ত ও পুঁজ ঝরে পড়ত। এ অবস্থায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা ইয়েমেনের দিকে পালাতে শুরু করে। এভাবে পালাবার সময় পথে পথে তারা মারা যায়। যার ফলে সারা পথে শুধু লাশ আর লাশ পড়ে থাকে। আবরাহাও খাশআম এলাকায় মারা যায়।

কুরআনের সূরা ফীলে আবরাহার হস্তিবাহিনীর উপর কী ধরনের পাথর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে এবং তাদের কী পরিণতি হয়েছিল, তা চমৎকারভাবে তুলে ধরে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝

'তুমি কি দেখনি, তোমার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কী (ব্যবহার) করেছেন? তিনি কি তাদের চালাকি বানচাল করে দেননি? আর তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠালেন, যারা তাদের উপর পাকা মাটির তৈরি পাথর ফেলছিল। ফলে তাদেরকে (পশুর) চিবানো ভুসির মতো করে দিলেন।' (সূরা ফীল : ১-৫)

এ আয়াতের তাফসীরে মাওলানা মওদূদী (রা) বলেন, আবাবিল মানে হচ্ছে, বহু ও বিভিন্ন দল, যারা একের পর এক বিভিন্ন দিক থেকে আসে। তারা মানুষও হতে পারে আবার পশুও হতে পারে। সাঈদ ইবন যুবাইর বলেন, যেসব পাখি আবরাহার বাহিনীকে ধ্বংস করে দেয়, এ ধরনের পাখি এর আগে কখনও দেখা যায়নি এবং এর পরেও কখনও দেখা যায়নি।

ইহুদিদের পৃথিবীতে বিভক্ত করে দেয়া

আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভক্ত করে দিয়েছেন। এ থেকে বুঝা গেল যে, কোন জাতি একসাথে বসবাস করাও বিরাট নিয়ামত। তাদের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়া এক ঐশী আযাব। জোর-জবরদস্তি করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের চেষ্টা দেখে বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ নেই। কেননা, সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে তা ঘটবে। এ বিষয়টি কুরআনে এভাবে উল্লেখ আছে:

وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

'আর আমি তাদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছি, দেশময় বিভিন্ন শ্রেণীতে। তাদের মধ্যে কিছু রয়েছে ভালো আর কিছু অন্য রকম। তাছাড়া আমি তাদের পরীক্ষা করেছি ভালো ও মন্দের মাধ্যমে, যাতে তারা ফিরে আসে।' (সূরা আ'রাফ : ১৬৮)

মাযলুমের ফরিয়াদ

যুলুম-যালিম-মাযলুম– এ শব্দ তিনটি আরবি হলেও আমরা সবাই এর অর্থ বুঝি। আমাদের সমাজে কেউ কারো প্রতি অন্যায় আচরণ করলে তাকে যালিম বলা হয়। আর যার প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয় তিনি মাযলুম হিসেবে পরিচিত। আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অনেক জায়গায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যালিমকে পছন্দ করেন না। তিনি যালিমকে আখিরাতে কঠিন শাস্তি দেবেন। আর দুনিয়াতেও ফেরাউন-শাদ্দাদ, নমরুদসহ কিছু যালিমের করুণ পরিণতি এবং আদ-ছামূদসহ বিভিন্ন জাতি ধ্বংস হওয়ার ঘটনা দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

আজকের যুগেও যারা সত্য ও ন্যায়ের পথে চলছেন তারা যালিমদের যুলুমের শিকার হচ্ছেন। যালেমের এ ধরনের যুলুমের শিকার শুধু অমুসলিমদের দ্বারা হচ্ছে

না বরং পৃথিবীর অনেক মুসলিম দেশে কিছু মুসলিম নামধারী শাসকের হাতেও চরম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে অনেক সত্যপন্থী মানুষ। ফিলিস্তিন, কাশ্মির, ইরাক, বসনিয়াসহ পৃথিবীর নানা দেশে যখন অমুসলিমরা সরাসরি আক্রমণ করে তখন আমরা তা সহজেই দেখি এবং প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠি। কিন্তু মিসর, বাংলাদেশ, আলজেরিয়া, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে মুসলিম শাসকদের হাতে যখন মুসলমানেরা নির্যাতিত হয় তখন সে খবর খুব কম লোকই রাখে। পৃথিবীর মানুষগুলো না জানলেও আল্লাহ তাআলা জানেন, কারা কিভাবে কাদের উপর নির্যাতন করছে এবং মাযলুমের ফরিয়াদ আল্লাহ শোনেন।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ○

'আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছ না, দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।' (সূরা নিসা : ৭৫)

আমাদেরকে হাওয়ারির দায়িত্ব পালন করতে হবে

মাযলুমের সাহায্যে কিভাবে অতীতে অনেকেই ভূমিকা পালন করেছেন আল কুরআনে তার উল্লেখ আছে। ঈসা (আ) তৎকালীন শত্রুদের আক্রমণে অতিষ্ট হয়ে যখন আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছিলেন, 'মান আনসারী ইলাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর দীন প্রচারে কে আমার সাহায্যকারী হবে? প্রত্যুত্তরে বারজন লোক আনুগত্যের শপথ করে এবং ঈসাকে (আ) সাহায্য করার ঘোষণা দেয়। তাঁরা ঈসার আন্তরিক বন্ধু হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। আল কুরআনের সূরা সফে তাঁদেরকেই 'হাওয়ারি' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। (তাফসীর মাআরেফুল কুরআন)

এ সংক্রান্ত আলোচনায় আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

'হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আমি কি তোমাদেরকে ঐ ব্যবসার কথা বলব, যা তোমাদেরকে কষ্টদায়ক আযাব থেকে বাঁচাবে। আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আন এবং তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। যদি তোমরা জান তাহলে এটাই তোমাদের জন্য ভালো। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন

এবং তোমাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে ঝরনাধারা বইছে, আর তোমাদেরকে চিরস্থায়ী বেহেশতে খুব ভালো ঘর দেবেন। এটা অতি বড় সাফল্য। আর অন্যান্য জিনিস যা তোমরা পছন্দ করো (তা-ও তোমাদেরকে তিনি দেবেন) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য দেবেন এবং খুব শিগগিরই একটি বিজয় দেবেন। (হে রাসূল! এ বিষয়ে) মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন। হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহর সাহায্যকারী হও। যেমন, ঈসা ইবনে মারইয়াম তার সাথীদেরকে ডেকে বলেছিলেন, 'আল্লাহর দিকে (ডাকবার) কাজে আমার সাহায্যকারী কে আছ? হাওয়ারিগণ জওয়াব দিয়েছিল, 'আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী।' তখন, বনী ইসরাঈলের একটি দল ঈমান আনল, আর একটি দল কুফরী করল। তারপর যারা ঈমান আনল আমি তাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে তাদেরকে শক্তিশালী করলাম এবং তারাই বিজয়ী হয়ে রইল।' (সূরা সফ : ১০-১৪)

একই ধরনের কথা কুরআনের অন্য জায়গায় এভাবে এসেছে:

'যখন ঈসা অনুভব করলেন, বনী ইসরাঈল তাঁকে অস্বীকার করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে, তখন তিনি বললেন, আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারিগণ জওয়াব দিল, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি, আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম (আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী)। হে আমাদের রব! তুমি যে ফরমান নাযিল করেছ আমরা তা মেনে নিয়েছি এবং রাসূলের আনুগত্য করেছি। তুমি আমাদের নাম সাক্ষ্যদাতাদের সাথে লিখে নাও। তারপর বনী ইসরাঈল (ঈসার বিরুদ্ধে) গোপন ষড়যন্ত্র করতে লাগল। এর জবাবে আল্লাহও তার গোপন তদবীর করলেন। আর এ জাতীয় তদবীরে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি অগ্রসর।' (সূরা আলে ইমরান : ৫২-৫৪)

প্রত্যেক যুগে যেমনি যালিম থাকে তেমনি হাওয়ারিও থাকে। যালিমরা যুলুম করে আর হাওয়ারিরা মাযলুমের পক্ষে ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বর্তমানে যালিমের যুলুমের তুলনায় হাওয়ারিরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন না বা করতে পারছেন না। কিন্তু অতীতে অনেকেই কঠিন মুহূর্তগুলোতে আল্লাহর প্রিয় নবী-রাসূলদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন।

আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

'(ঐ সময়ের কথা চিন্তা করে দেখুন) আল্লাহ যখন বলবেন, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আমার ঐ নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা তোমাকে ও তোমার মাকে দিয়েছিলাম। আমি পবিত্র রূহ দ্বারা তোমাকে সাহায্য করেছিলাম। তুমি দোলনায়

থেকেও মানুষের সাথে কথা বলতে এবং বড় হয়েও কথা বলতে। আমি তোমাকে কিতাব ও হিকমত এবং তাওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়েছিলাম। তুমি আমার হুকুমে মাটি দিয়ে পাখির আকারে পুতুল তৈয়ার করতে এবং তাতে তুমি ফুঁ দিতে, আর আমার হুকুমে তা পাখি হয়ে যেত। আমার হুকুমে তুমি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভালো করে দিতে। তুমি মৃত মানুষকেও আমার হুকুমে জীবিত করতে। তারপর যখন তুমি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে বনী ইসরাঈলের নিকট পৌঁছলে তখন তাদের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকারকারী ছিল তারা বলল, এটা তো স্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়, (ঐ অবস্থায়) আমি বনী ইসরাঈলকে তোমার কাছ থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলাম (বা তোমাকে রক্ষা করেছিলাম)। আর আমি যখন হাওয়ারিদেরকে ইশারা করেছিলাম যে, আমার ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তখন তারা বলল, আমরা ঈমান আনলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম। (হাওয়ারিদের ব্যাপারে এ ঘটনাও মনে থাকা দরকার যে,) যখন হাওয়ারিরা বলল, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আপনার রব কি আসমান থেকে আমাদের জন্য খানাভর্তি খাঞ্চা নাযিল করতে পারেন? তখন ঈসা বললেন, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক তাহলে আল্লাহকে ভয় কর। তারা বলল, আমরা শুধু এটাই চাই যে, আমরা খাঞ্চা থেকে খানা খাব ও আমাদের দিল নিশ্চিন্ত হবে। আর আমরা জানতে পারব যে, আপনি যা কিছু বলেছেন তা সত্য এবং আমরা এর সাক্ষী হয়ে থাকব। তখন ঈসা ইবনে মারইয়াম দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, হে আমাদের রব! আমাদের জন্য খানা ভর্তি খাঞ্চা নাযিল করুন, যা আমাদের ও আমাদের পরবর্তীদের জন্য খুশির উপলক্ষ হয় এবং তোমার পক্ষ থেকে একটি নিশানা হয়ে থাকে। আমাদেরকে রিযক দান করো। আর তুমিই তো সবচেয়ে উত্তম রিযকদাতা। আল্লাহ বললেন, আমি তা তোমাদের উপর নাযিল করব। কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্যে যে কুফরী করবে তাকে আমি এমন শাস্তি দেব, যা দুনিয়ায় আর কাউকে দেইনি। (এসব নিয়ামতের কথা মনে করবার পরে) আল্লাহ যখন বললেন, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে ইলাহ বানাও? এর জওয়াবে ঈসা বলবে, সুবহানাল্লাহ! যে কথা বলার কোন অধিকার আমার নেই, সে কথা বলা আমার কাজ ছিল না। যদি এমন কথা আমি বলতাম তাহলে আপনি অবশ্যই তা জানতেন। আমার দিলে যা আছে তা তো আপনি জানেন। কিন্তু আপনার দিলে যা কিছু আছে তা তো আমি জানি না। নিশ্চয়ই আপনি সব গায়েবী ইলম রাখেন। আপনি আমাকে যা কিছু আদেশ করেছেন তা ছাড়া তাদেরকে আমি

আর কিছুই বলিনি। (আর তা হলো) ঐ আল্লাহর দাসত্ব করো, যিনি আমারও রব, তোমাদেরও রব। আমি যতক্ষণ তাদের মধ্যে ছিলাম তত সময়ের জন্য তাদের উপর আমি সাক্ষী ছিলাম। যখন আমাকে আপনি তুলে নিলেন তারপর তো আপনিই তাদের তদারককারী ছিলেন। আপনি তো সব জিনিসের উপরই সাক্ষী।' (সূরা মায়িদাহ : ১১০-১১৭)

আল্লাহ তাআলাই মাযলুমের সাহায্যকারী

আল্লাহ তাআলা মাযলুমের কথা সরাসরি শোনেন; মাযলুমের ফরিয়াদ সাথে সাথেই কবুল করেন। তাই মাযলুমকে অসহায় মনে করার কোন কারণ নেই। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং মাযলুমের সাহায্য করেন। তিনি কখনও ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করেন। আবার কখনও আবাবিল পাখি বা ক্ষুদ্র একটি মশা দিয়েও যালিমকে শায়েস্তা করার মাধ্যমে মাযলুমের সহযোগিতা করেন। মাযলুমের হৃদয়ে দৃঢ়মনোবল সৃষ্টি করে হকের উপর অটল ও অবিচল রাখার মাধ্যমেও তিনি মাযলুমকে সাহায্য করে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ۚ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

'(হে নবী!) আপনার আগে আমি রাসূলগণকে তাদের কাওমের নিকট পাঠিয়েছি এবং তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছেন। তারপর যারা অপরাধ করেছে তাদের থেকে আমি প্রতিশোধ নিয়েছি। আর আমার উপর মুমিনদের এ অধিকার ছিল যে, আমি তাদেরকে সাহায্য করি।' (সূরা রূম: ৪৭)

মাযলুমের সাহায্য করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব

আল্লাহ তাআলা মাযলুমের সাহায্য করেন; তাই বলে কি আমাদের কোন করণীয় নেই? আমাদের অবশ্যই করণীয় রয়েছে। রাসূলে কারীম (স) মাযলুমের সাহায্য করার জন্য সরাসরি নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'উনসুর আখাকা যালিমান আও মাযলুমান'–এ হাদীসের আলোকে যালিম ও মাযলুম উভয়কে সাহায্য করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা মাযলুমকে সাহায্য করতে পারি কিন্তু যালিমকে কিভাবে সাহায্য করব? আল্লাহর রাসূল (স) জবাবে বলেছেন, যুলুম থেকে বিরত রাখার চেষ্টার মাধ্যমেই যালিমকে সাহায্য করা যায়। যালিম যদি যুলুম করার সময় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় তাহলে সে কম যুলুম করবে আর এর ফলে তার কম পাপ হবে। আমাদের

সমাজে অনেকেই যালিমকে এত বেশি ভয় পায় যে, তারা যুলুমের প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। আর কেউ কেউ যালিমকে ঘৃণা করেন সত্য কিন্তু প্রকাশ্যে মাযলুমের সাহায্য করতেও ভয় পায়। আর কেউ আছেন তারা নীরব থাকেন এরফলে যালিম যুলুম করতে আরও বেশি উৎসাহিত হয়। আর কেউ আছেন, যালিমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর থাকেন এবং মাযলুমকে সব ধরনের সহযোগিতা করেন। আর কিছু মানুষ আছে, তারা মাযলুমের পরিবর্তে যালিমকেই আরও বেশি যুলুম করতে সাহায্য করে।

বিস্ময়ের ব্যাপার, আমরা কিভাবে মাযলুমের উপর যালিমের যুলুম দেখে নীরব ভূমিকা পালন করি? মাযলুমের কান্নার আওয়াজ শোনেও না শোনার ভান করি? অথচ আমরা হাওয়ারির ভূমিকা পালন করার কথা ছিল। আমরা যদি মাযলুমের কান্না শোনার পরও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করি তাহলে একদিন আমাদেরকে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে এবং নিজেদের বিবেকের কাছেও অপরাধী হয়ে থাকতে হবে আমরণ। হয়তবা এমন সময় আসবে তখন বর্তমানের নীরব ভূমিকার জন্য শুধু অনুশোচনা-কান্নাই করব। তাই সময়মত আমাদের করণীয় পালন করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

আজকের প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয়

১. আল্লাহর ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা

আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যে ফায়সালা করেন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এভাবে যারা প্রশান্তচিত্তে আল্লাহর সব ফায়সালা গ্রহণ করেন, তাঁরা কালবে সালীমের অধিকারী হন। আর যারা কালবে সালীমের অধিকারী তাঁরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, ভাল-মন্দ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

‘হে রাসূল! ওদেরকে বলুন, ‘আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা ছাড়া কখনো কোন (ভালো বা মন্দ) কিছুই আমাদের কাছে পৌঁছে না। তিনিই আমাদের মনিব। মুমিনদেরকে আল্লাহরই উপর ভরসা করা উচিত।’ (সূরা তাওবাহ : ৫১)

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ۚ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

‘এমন কোন বিপদ নেই, যা দুনিয়াতে বা তোমাদের নাফসের উপর নাযিল হয়, আর আমি একে পয়দা করার আগেই তা এক কিতাব (তাকদীরে) লিখে রাখিনি। এমনটা করা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ কাজ।’ (সূরা হাদীদ : ২২)

আমরা এ কথা বিশ্বাস করি যে, কোন বিপদাপদ আল্লাহর ফায়সালা ব্যতিরেকে আসে না। তাই বিপদ-মুসীবতকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○ .

'কোন মুসীবত কখনো আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আসে না। যে আল্লাহর উপর ঈমান রাখে আল্লাহ তার দিলকে হেদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ সব বিষয়ে জানেন।' (সূরা তাগাবুন : ১১)

আল্লাহর প্রিয় বান্দাহরা বিপদ-মুসীবতে পতিত হলে হা-হুতাশ করেন না। তাঁরা বিপদে পতিত হলে বা বিপদের কথা শুনলে বলেন, 'ইন্না লিলাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।' আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

الَّذِيْنَ إِذَآ أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝

'যারা বিপদে পড়লে বলে, 'আমরা আল্লাহর-ই এবং আল্লাহর কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।' (সূরা বাকারা : ১৫৬)

২. আল্লাহর দরবারে ধরনা দেয়া

আল্লাহর বান্দাহরা বিপদ-মুসীবতে পতিত হলে অন্য কারো কাছে আল্লাহর কাছেই ধরনা দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُوْنَ ۝

'যে নিয়ামতই তোমরা পেয়েছ, তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। তারপর যখন তোমাদের উপর কোন কঠিন সময় আসে তখন তোমরা ফরিয়াদ নিয়ে তাঁরই দিকে দৌড়াও।' (সূরা নাহল : ৫৩)

দোয়ার ফল কখনও দুনিয়াতে চোখে পড়ে আর কখনও চোখে পড়ে না। তবে আখিরাতে তা দেখতে পাওয়া যাবে। তাই দোয়া করাকে গুরুত্বহীন ভাবা যেমনি ঠিক নয় অনুরূপভাবে দোয়ার ফল পেতে বিচলিত হয়ে যাওয়াও উচিত নয়। আল্লাহ সকল মু'মিনের দোয়া শোনেন। কার দোয়ার উত্তর কখন দেবেন তা তিনিই ভাল জানেন। তিনি তাঁর বান্দার জন্য যা কল্যাণকর তাই করেন–এ বিশ্বাস সকল মুমিনকে রাখতে হবে।

যারা দোয়া করেন, আল্লাহ তাদের উপর খুশি হন। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য 'আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন (তিরমিযী)। এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর কাছে দোয়া না করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। এর কারণ সম্ভবত এই যে, এর মাধ্যমে অহংকার ফুটে উঠে। কেননা, আল্লাহর কাছে দোয়া করার অর্থ হচ্ছে ব্যক্তি নিজেকে ছোট ভেবে

আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। আর দোয়া না করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কাছে ব্যক্তির কোন প্রয়োজন নেই। জীবনে যত সমস্যা আসে তা সমাধানে ব্যক্তি নিজেই যথেষ্ট। আর যদি মনে করা হয় অন্য কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্র তাকে সাহায্য করার জন্য যথেষ্ট তাহলে আল্লাহর সাথে শিরক করা হয়। কেননা, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কারো সাহায্য করতে পারে না। হ্যাঁ, আমরা অনেক সময় সমাজের একে অন্যের মাধ্যমে পরস্পরের প্রয়োজন পূরণ করতে দেখি। এ কারণে কোন ব্যক্তির কাছে কোন কিছু চাওয়া অবৈধ নয়। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ কাঙ্ক্ষিত জিনিস ঐ ব্যক্তির মাধ্যমে দেওয়ার ফায়সালা করলেই কেবল তা পাওয়া যেতে পারে; এছাড়া নয়। তাই সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে। আল্লাহর রাসূল (স) বদর যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে সিজদাবনত হয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছেন, হে আল্লাহ আজ যদি মুসলমানেরা পরাজিত হয় তাহলে তোমার যমীনে তোমার ইবাদত করবে কে?

আজকের যুগেও আমাদেরকে কঠিন মুহূর্তে সদা সর্বদা তাঁর কাছেই ফরিয়াদ জানাতে হবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ○

'তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে'। (সূরা গাফির : ৬০)। আমরা কিভাবে দোয়া করব আল্লাহ তাআলা তাও শিখিয়ে দিয়েছেন,

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ○

'বল, আল্লাহ বলে আহ্বান কর, কিংবা রহমান বলে– যে নামেই আহ্বান করো না কেন সব সুন্দর নাম তাঁরই।' (সূরা ইসরা : ১১০)

আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে সাহায্য চেয়ে লাভ নেই। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে কিয়ামত পর্যন্ত দোয়া করলেও কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। বস্তুত আল্লাহর ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না।' (সূরা ফাতির : ১৪)

আল্লাহর কাছে দোয়া করার উত্তম সময় হচ্ছে, গভীর রাতে কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে কান্নাকাটি করা। আল্লাহর রাসূল (স) গভীর রাতে সবসময় জেগে নামায আদায় করতেন। আর তা করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিল। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

'হে চাদর মুড়ি দিয়ে শায়িত ব্যক্তি! কিছু সময় বাদ দিয়ে রাতের বেলা নামাযে দাঁড়িয়ে থাকুন। আধা রাত বা তার চেয়ে কিছু কম করুন। অথবা, তার চেয়ে কিছু বেশি বাড়িয়ে নিন আর কুরআন খুব থেমে থেমে পড়ুন। নিশ্চয়ই আমি আপনার উপর এক ভারী কথা নাযিল করব। আসলে রাত জাগা নাফসকে দমন করার জন্য খুব বেশি (ফলদায়ক) এবং (কুরআন) ঠিক মতো পড়ার জন্য বেশি উপযোগী। দিনের বেলা তো আপনার জন্য অনেক ব্যস্ততা আছে। আপনার রবের যিকর করুন এবং সবকিছু থেকে আলাদা হয়ে তাঁরই হয়ে থাকুন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। অতএব তাঁকেই নিজের (উকিল) অভিভাবক বানিয়ে নিন। আর লোকেরা যা বলে বেড়াচ্ছে, সে বিষয়ে সবর করুন এবং ভদ্রভাবে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যান।' (সূরা মুযাম্মিল : ১-১০)

আল্লাহর কাছে (কোন ভাষায়) দোয়া করতে হবে এবং কী চাইতে হবে তাও আল্লাহ তাআলা শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদেরকে মাসনুন দোয়া শিখতে হবে এবং তা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে।

মূলতঃ একজন মুমিন সংকটজনক সময়ে আল্লাহর সাহায্য চায়। যখন দুনিয়ার সকল শক্তি ইসলামী আদর্শের অনুসারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয় তখন তারা ভড়কে না গিয়ে আল্লাহর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করে। জাগতিক উপায় উপকরণের উপর নির্ভরশীল থাকে না। তাঁরা নির্ভরশীল থাকে আল্লাহর রহমতের উপর। জাগতিক সহায়-সম্পদ তাদের কম থাকলেও সবচেয়ে বড় অস্ত্র তাদের কাছে রয়েছে। আর তা হচ্ছে দোয়ার অস্ত্র। আল্লাহর রাসূল (স)-এর ভাষায় المومن سلاح الدعاء। অর্থাৎ দোয়া হচ্ছে মু'মিনের অস্ত্র। দুনিয়ার কোন শক্তি যত বড় অস্ত্র নিয়ে আসুক না কেন, দোয়ার অস্ত্রের কাছে সবকিছু তুচ্ছ। আল্লাহ যদি ইচ্ছে করেন, সকল অস্ত্রকে অকার্যকর করে দিতে পারেন। যা অতীতে অনেক সময় করে তাঁর কুদরত দেখিয়েছেন। তবে এর অর্থ এ নয় যে, মুমিনরা জাগতিক কোন উপায় উপকরণ ব্যবহার করবে না; বরং মুমিনদেরকে সামর্থ্য অনুসারে জাগতিক উপায় উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

৩. সবর ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে

সংকটজনক সময়ে অনেকে অস্থির হয়ে উঠেন। অস্থির হয়ে কোন কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। তাই শান্তভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথেই বিপদসংকুল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার চেষ্টা করতে হবে। আর নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○ وَلَا تَقُوْلُوْا
لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ○ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ
مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۭ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۙ
الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۭ اُولٰۗىِٕكَ عَلَيْهِمْ
صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۣ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ○

'হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! সবর ও নামায থেকে সাহায্য লও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, যারা সবর করে। যারা আল্লাহর পথে মারা যায়, তাদেরকে মৃত বল না। এরা তো আসলে জীবিত; কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের ধারনা হয় না। আমি অবশ্যই ভয়-বিপদ, ক্ষুধা, জান ও মালের ক্ষতি এবং আয় কমিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলব। এসব অবস্থায় যারা সবর করে, তাদেরকে সুখবর দাও, যারা বিপদে পড়লে বলে যে, আমরা আল্লাহর-ই এবং আল্লাহর কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তাদের উপর তাদের রবের পক্ষ থেকে বড়ই মেহেরবানী হবে এবং তাঁর রহমত তাদের উপর ছায়া দেবে। আর এরকম লোকেরাই সঠিক পথে চলছে।' (সূরা বাকারা : ১৫৩-১৫৭)

তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে মুফতী শফী (র) উল্লেখ করেন, মানব জাতির যে কোন সংকট বা সমস্যার নিশ্চিত প্রতিকারই ধৈর্য ও নামায। নামায ও সবরের মাধ্যমে যাবতীয় সংকট প্রতিকার হওয়ার কারণ এই যে, এ দুই পন্থায়ই আল্লাহ তাআলার প্রকৃত সান্নিধ্য লাভ হয়। নামাযী ও সবরকারীগণের সাথে আল্লাহর সান্নিধ্য তথা খোদায়ী শক্তির সমাবেশ ঘটে। যেখানে বা যে অবস্থায় বান্দার সাথে আল্লাহর শক্তির সমাবেশ ঘটে সেখানে দুনিয়ার কোন শক্তি বা সংকটই যে টিকতে পারে না তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন পড়ে না। বান্দাহ যখন আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হয় তখন তার গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়। তার অগ্রগমন ব্যাহত করার মতো শক্তি কারও থাকে না।

রাসূলে করীম (স)-এর পবিত্র অভ্যাস এই ছিল যে, যখনই তিনি কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখনই নামায আরম্ভ করতেন। আর সে নামাযের বরকতেই আল্লাহ তাআলা তাঁর যাবতীয় বিপদাপদ দূর করে দিতেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা)-কে যখনই কোন বিষয় চিন্তিত করে তুলত তখনই তিনি নামায পড়তে শুরু করতেন। নামায এবং সবরের মাধ্যমে যাবতীয় সংকটের প্রতিকার পাওয়ার কারণ এই যে, এ দুই পন্থায়ই আল্লাহ তাআলার প্রকৃত সান্নিধ্য লাভ হয়।

মাওলানা মওদূদী (র) তাঁর 'ইসলামী আন্দোলন : সাফল্যের শর্তাবলি' গ্রন্থে ধৈর্য সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ধৈর্যের বহু অর্থ হয় এবং আল্লাহর পথে যারা কাজ করে তাদের এর প্রত্যেকটি অর্থের প্রেক্ষিতেই ধৈর্যশীল হতে হয়। ধৈর্যের এক অর্থ হচ্ছে, তাড়াহুড়া না করা, নিজের প্রচেষ্টার তড়িৎ ফল লাভের জন্য অস্থির না হওয়া এবং বিলম্ব দেখে হিম্মত হারিয়ে না বসা। ধৈযের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তিক্ত স্বভাব, দুর্বল মত ও সংকল্পহীনতার রোগে আক্রান্ত না হওয়া। ধৈর্যের আরেক অর্থ হচ্ছে, বাধা-বিপত্তির বীরোচিত মোকাবেলা করা এবং শান্তচিত্তে লক্ষ্য অর্জনের পথে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করা। ধৈর্যের আরেক অর্থ হচ্ছে, দুঃখ-বেদনা-ভারাক্রান্ত ও ক্রোধান্বিত না হওয়া, সকল প্রকার ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসার মোকাবেলায় সঠিক পথে অবিচল থাকা, শয়তানের উৎসাহ প্রদান ও নফসের খাহেশের বিপক্ষে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করা। হারাম থেকে দূরে থাকা ও খোদার নির্দেশিত সীমার মধ্যে অবস্থান করা, গোনাহের যাবতীয় আরাম-আয়েশ লাভ প্রত্যাখ্যান করা এবং নেকী ও সততার পথে সকল প্রকার ক্ষতি ও বঞ্চনা সাদরে গ্রহণ করা।

মুফতী শফী (র) বলেন, সবর শব্দের অর্থ হচ্ছে, সংযম অবলম্বন ও নফসের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় সবরের তিনটি শাখা রয়েছে:

১. নফসকে হারাম এবং নাজায়েয বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা।
২. নিজেকে ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা।
৩. যে কোন বিপদে ও সংকটে ধৈর্য ধারণ করা। অর্থাৎ যেসব বিপদাপদ এসে উপস্থিত হয় সেগুলোকে আল্লাহর বিধান বলে মেনে নেওয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর তরফ থেকে প্রতিদানের আশা রাখা।

যারা এ তিন প্রকারেই সবর করে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন, তাদেরকে প্রথমে বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেন, সবরকারী বান্দাগণকে তাদের পুরস্কার বিনা হিসেবে দেওয়া হবে–এ আয়াতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সবরের ফযীলত সম্পর্কে কুরআনে অনেক আয়াত আছে। নিম্নে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি:

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ○

'যারা সবর করে এবং নেক আমল করে তারাই এমন, যাদের জন্য ক্ষমা ও বড় পুরস্কার রয়েছে।' (সূরা হূদ : ১১)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ○ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○

'যারা যুলুম সহ্য করার পর আল্লাহর খাতিরে হিজরত করে গেছেন তাদেরকে আমি দুনিয়াতেই ভালো ঠিকানার ব্যবস্থা করব, আর আখিরাতের প্রতিফল তো অনেক বড়। যে মযলুমরা সবর করেছে এবং তাদের রবের উপর ভরসা করেছে, তারা যদি জানত যে, কেমন ভালো শেষফল তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।' (সূরা নাহল : ৪১-৪২)

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

'যা তোমাদের কাছে আছে তা শেষ হয়ে যাবে, আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা-ই বাকি থাকবে। যারা সবর অবলম্বন করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের সবচেয়ে ভালো আমলের হিসাব অনুপাতে প্রতিফল দান করব।' (সূরা নাহল : ৯৬)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ○ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○

'যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে আমি বেহেশতের উঁচু দালানে রাখব, যার নিচে ঝরনাধারা বহমান থাকবে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। কতোই না ভালো বদলা ঐসব আমলকারীদের জন্য, যারা সবর করেছে এবং যারা তাদের রবের উপর ভরসা রাখে।' (সূরা আনকাবূত : ৫৮-৫৯)

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ○ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ

مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاهُ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى ۝ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، لَانَسْئَلُكَ رِزْقًا، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ۝

'(কাজেই হে নবী!) এ লোকেরা যা কিছু বলছে এ বিষয়ে সবর করুন, সূর্য উঠার আগে ও ডুবার পরে আপনার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ্ করুন, রাতের বেলায়ও তাসবীহ্ করুন এবং দিনের কিনারায়ও। হয়ত এতে আপনি খুশি হবেন। দুনিয়ার জীবনের ঐ জাঁকজমক যা আমি তাদের মধ্যে বিভিন্ন লোককে দিয়েছি সেদিকে আপনি চোখ তুলেও দেখবেন না। এসব তো আমি তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবার জন্য দিয়েছি। আর আপনার রবের দেওয়া হালাল রিযিকই বেশি ভালো ও বেশি স্থায়ী। আপনার পরিবার-পরিজনকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও তা মযবুতভাবে পালন করুন। আমি আপনার কাছে রিযিক চাই না; বরং আমিই আপনাকে রিযিক দিচ্ছি। আর ভালো পরিণাম আল্লাহভীরুতার জন্যই রয়েছে।' (সূরা ত্বা-হা : ১৩০-১৩২)

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أٰبَآئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝

'তাদের অবস্থা এই যে, তারা তাদের রবের সন্তুষ্টির জন্য সবর করে, নামায কায়েম করে, গোপনে ও প্রকাশ্যে আমার দেওয়া রিযক থেকে খরচ করে এবং মন্দকে ভালো দ্বারা দূর করে। আখিরাতের ঘর এ লোকদের জন্যই রয়েছে। অর্থাৎ তা এমন বাগান, যা তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান হবে। তারা নিজেরাও তাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদা, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেককার তারাও সেখানে তাদের সাথে যাবে। আর ফেরেশতারা সবদিক থেকে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে আসবে এবং বলবে, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা দুনিয়ায় সবর করার বদলায় আজ এর ভাগী হয়েছ। তাই আখিরাতের ঘর কতই না ভালো।' (সূরা রা'দ : ২২-২৪)

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

'নেক কাজ মানে এটা নয় যে, তোমরা পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে মুখ করে নিলে; বরং আসল নেক কাজ হলো এই যে, মানুষ আল্লাহ, আখিরাতের দিন, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণকে অন্তর দিয়ে মানে; আল্লাহর মহব্বতে নিজের পছন্দের মাল আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, ভিক্ষুক ও গোলাম আযাদ করার জন্য খরচ করে; নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। তাছাড়া ঐসব লোকই নেককার, যারা যখন ওয়াদা করে তখন তা পালন করে আর যারা গরিব অবস্থায়, বিপদ-আপদে এবং হক ও বাতিলের লড়াইয়ের সময় সবর করে। আসলে এরাই সত্যপন্থী এবং এরাই মুত্তাকী।' (সূরা বাকারা : ১৭৭)

আল্লাহ তাআলা কুরআনে নামাযের যেমনি নির্দেশ দিয়েছেন অনুরূপভাবে সবর করারও আদেশ দিয়েছেন।

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۚ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۚ وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

'আর দেখ, দিনের দু'কিনারায় ও রাতের কিছু অংশ পার হবার পর নামায কায়েম করো। নিশ্চয়ই সৎ কাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয়। যারা আল্লাহকে মনে রাখে তাদের জন্য এটা একটা উপদেশ। সবর করো। যারা নেক কাজ করে, আল্লাহ কখনো তাদের কর্মফল নষ্ট করেন না।' (সূরা হূদ : ১১৪-১১৫)

বিপদ-মুসীবতের সময় সবর করা এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

'আমরা কেন আল্লাহর উপর ভরসা করব না, অথচ তিনিই আমাদের জীবনে চলার পথ দেখিয়েছেন? তোমরা আমাদেরকে যে কষ্ট দিচ্ছ এতে আমরা সবর করব। আর ভরসাকারীদের শুধু আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।' (সূরা ইবরাহীম : ১২)

সবর করার মধ্যে অনেক সওয়াব রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ○ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ○ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ○

'যদি তোমরা কারো বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নাও, তাহলে তোমাদের উপর যে পরিমাণ অন্যায় করেছে সে পরিমাণ নিতে পার। আর যদি তোমরা সবর করো তাহলে তা তার জন্যই ভালো যে সবর করেছে। ধৈর্যের সাথে কাজ করতে থাক। তোমার এ সবর আল্লাহরই তাওফীকের ফল। তাদের কার্যকলাপে দুঃখবোধ করো না এবং তারা যত চালবাজি করছে তাতে মন ছোট করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরই সাথে আছেন, যারা তাকওয়ার জীবন-যাপন করে এবং যারা ইহসানের সাথে আমল করে।' (সূরা নাহল : ১২৬-১২৮)

আল্লাহর বান্দারা যখন সবর করে এবং ময়দানে অটল থাকে তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

بَلَىٰ ۚ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ○

নিশ্চয়ই যদি তোমরা সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে চল, তাহলে যখনই দুশমন তোমাদের উপর চড়াও হয়ে আসবে তখন তখনই তোমাদের রব (তিন হাজার নয়) পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন' (সূরা আলে ইমরান : ১২৫)।

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন,

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ○

'তোমাদের কিছু কল্যাণ হলে তাদের কাছে খারাপ লাগে। আর তোমাদের উপর কোন বিপদ এলে তারা খুশি হয়। যদি তোমরা সবর করো এবং আল্লাহকে ভয়

করে চল তাহলে তাদের কোন ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এরা যা কিছু করছে আল্লাহ তা ঘিরে রেখেছেন।' (সূরা আলে ইমরান : ১২০)

৪. ঈমানের পথে অটল ও অবিচল থাকা

ঈমানের ঘোষণা দেয়ার পর শত বাধা সত্ত্বেও ঈমানের দাবিতে অটল ও অবিচল থাকতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۝

'যারা ঘোষণা করেছে, আল্লাহ আমাদের রব, তারপর এ কথার উপর মযবুত ও অটল হয়ে রয়েছে, নিশ্চয়ই তাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল হয় এবং তাদেরকে বলে, ভয় পেয়ো না, চিন্তাও করো না। ঐ বেহেশতের সুসংবাদ শুনে খুশি হও, যার ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছে।' (সূরা হা মীম সিজদাহ: ৩০)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহর রাসূল (স)-এর একটি হাদীস।

'সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ সাকাফী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আপনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি (চূড়ান্ত) কথা বলে দিন, যা সম্পর্কে আপনার পরে আর কারও নিকট জিজ্ঞাসা করব না। অন্য আরেক রেওয়ায়েতে আছে, আপনি ব্যতীত আর কাউকে জিজ্ঞাসা করব না। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, তুমি বল! আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতঃপর এ কথা ও বিশ্বাসের উপর অটল অবিচল থাক।' (মুসলিম)

এ হাদীসে বর্ণিত ইস্তেকামাত অর্থ হলো স্থিতিশীল থাকা, প্রতিষ্ঠিত থাকা। আর শরী'আতের পরিভাষায় সর্বাবস্থায়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শের উপর অবিচল প্রতিষ্ঠিত থাকাকে ইস্তেকামাত বলে। মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে যে, এ হাদীসে বর্ণিত امنت بالله-এর মধ্যে তাওহীদ রয়েছে আর ثم استقم-এর মধ্যে যাবতীয় প্রকারের ইবাদত অন্তর্ভুক্ত। কেননা, ইস্তেকামাত হলো যাবতীয় আদেশ পালন করা এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকা। উক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, যারা ঈমান আনে এবং বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করে দীনের উপর অটল ও অবিচল থাকে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্যই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

আসহাবে রাসূলগণ ঈমানের দাবি পূরণে বাপ-দাদার রুসম রেওয়াজ ত্যাগ করেছেন। নিজ জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে হিজরত করেছেন। অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে দীনের উপর অটল ও অবিচল ছিলেন। আসহাবে রাসূলদের মাঝে প্রথম

পর্যায়ে যারা ইসলাম কবুল করেন তাদেরকে গোপনে নামায আদায় করতে হতো। তারা কোন পাহাড়ে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে নামায আদায় করতেন। কখনও কখনও কাফেররা দেখে ফেলত এবং তাঁদের উপর অত্যাচার চালাত। তারপরও তাঁরা দীনের পথ থেকে অন্য পথে যেতেন না। এ আলোচনা থেকে এ বিষয়টিই ফুটে উঠেছে যে, আল্লাহর রাসূল (স) ও তাঁর সঙ্গী-সাথিগণ নানাবিধ বাধা মোকাবেলা করেই আল্লাহর দীন পালনের উপর অটল ও অবিচল ছিলেন। বর্তমান সময়েও যাঁরা ঈমানদার, তাঁদেরকে বাধা-বিপত্তির মুখে সত্যের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হবে। তাহলেই আল্লাহর রাসূল ও তাঁর আসহাবদের জন্য যে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, আমরাও সে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারব।

বর্তমান সময়েও ঈমানের দাবি পেশ করার অপরাধে অনেককে চাকরিচ্যুত হতে হয়; জন্মগত অধিকার সত্ত্বেও নাগরিকত্ব পায় না বা বাতিল করার চক্রান্ত করা হয়। ইসলামের নির্দেশ মেনে চলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হয়। বিভিন্ন বন্দী শিবিরে নিপীড়ন ও নির্যাতন চালানো হয়। এসব কিছু প্রত্যক্ষ করার পরও একজন সত্যিকার মুসলিম ঈমানের পথে অটল ও অবিচল থাকে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

'হে ঈমানদারগণ! সবরের পথ অবলম্বন করো, বাতিলপন্থীদের মোকাবেলায় দৃঢ়তা দেখাও। হকের খেদমত করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যাও এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।' (সূরা আলে ইমরান : ২০০)

মাওলানা মওদূদী (র) বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত 'সাবিরু' শব্দের দুইটি অর্থ হয়–

ক. কাফেরেরা কুফরীর ব্যাপারে যে দৃঢ়তা, অবিচলতা দেখাচ্ছে এবং কুফরীর ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখার জন্য যে ধরনের চেষ্টা করছে, তোমরা তাদের মোকাবেলায় তাদের চাইতেও বেশি দৃঢ়তা, অবিচলতা ও মজবুতি দেখাও।

খ. তাদের মোকাবেলায় দৃঢ়তা, অবিচলতা ও মজবুতি দেখানোর ব্যাপারে তোমরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করো।

কোন অবস্থাতেই সন্দেহ সংশয় যেন পরিচ্ছন্ন চিন্তা-ভাবনার উপর জয়ী হতে না পারে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। কেননা বিপদ-মুসীবতের সময় সন্দেহ ও সংশয় বেশি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর এ সময় নানামুখী মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে ঈমানদারদের হৃদয়ে সন্দেহের বীজ বপনের চেষ্টা করা হয়। আল্লাহ

তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ○

'মুমিন তো আসলে তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে আর তারপর সংশয়ে লিপ্ত হয় না।' (সূরা হুজুরাত: ১৫)

ঈমান নিয়ে সন্দেহ ও সংশয়ের নানা কারণ থাকতে পারে। বর্তমান সময়েও ইসলাম সম্পর্কে নানা ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচারণার মাধ্যমে ঈমানিয়াতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদিতে সন্দেহের বীজ বপন করা হচ্ছে। যেমন, কুরআন আল্লাহর বাণী কিনা, এ সম্পর্কে সন্দেহের বীজ বপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সত্যিকার ঈমানদারেরা কোন অবস্থাতেই ঈমানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে সন্দেহ-সংশয়ে পতিত হয় না।

৫. উগ্রতা প্রদর্শন কিংবা বাড়াবাড়ি না করা

ঈমানের দাবি হচ্ছে,। কঠিন পরিস্থিতিতে ময়দানে দৃঢ় থাকতে হবে। শত উস্কানির মুখেও সীমালঙ্ঘন করা যাবে না। অনেক সময় বিরোধীপক্ষ উস্কানি দেয়, যেন সত্যপন্থীরা মেজাজের ভারসাম্য হারিয়ে উগ্রতা প্রদর্শন করে। সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলতে হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

'হারাম মাসের বদলা হারাম মাসই হতে পারে এবং সব পবিত্র জিনিসকেই সমান মর্যদা দিতে হবে। কাজেই যে কেউ তোমাদের উপর আক্রমণ করে তোমরাও তেমনিভাবে তাদের উপর হামলা করো। অবশ্য আল্লাহকে ভয় করতে থাকবে এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাদেরই সাথে আছেন, যারা সীমালঙ্ঘন করা থেকে বিরত থাকে।' (সূরা বাকারা : ১৯৪)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 'যদি তোমরা কারো বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নাও, তাহলে তোমাদের উপর যে পরিমাণ অন্যায় করেছে সে পরিমাণ নিতে পার। আর যদি তোমরা সবর করো তাহলে তা তার জন্যই ভালো, যে সবর করেছে। ধৈর্যের সাথে কাজ করতে থাক। তোমার এ সবর আল্লাহরই তাওফীকের ফল। তাদের কার্যকলাপে দুঃখবোধ করো না এবং তারা যত চালবাজি করছে তাতে মন ছোট করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরই সাথে আছেন, যারা তাকওয়ার জীবন-যাপন করে এবং যারা ইহসানের সাথে আমল করে।' (সূরা নাহল : ১২৬-১২৮)

৬. মন্দের জবাব উত্তমভাবে দেওয়া

আদর্শিক আন্দোলনের কর্মীরা মন্দের জবাব মন্দভাবে দেওয়ার কথা চিন্তাই করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ○ وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ○ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

'(হে নবী!) সৎ কাজ ও অসৎ কাজ সমান নয়। আপনি অসৎ কাজকে ঐ নেক কাজ দ্বারা দমন করুন, যা সবচেয়ে ভালো। তাহলে দেখতে পাবেন, যার সাথে আপনার দুশমনি ছিল, সে আপনার প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে। সবরকারী ছাড়া এ গুণ আর কারো ভাগ্যে জোটে না। অতি ভাগ্যবান ছাড়া আর কেউ এ মর্যাদা লাভ করতে পারে না। যদি কখনো টের পান যে, শয়তান আপনাকে ওয়াসওয়াসা দিচ্ছে, তখনই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন ও সব কিছু জানেন।' (সূরা ফুসসিলাত: ৩৪-৩৬)

৭. আত্মপর্যালোচনা ও আত্মসংশোধন করা

মুমিনরা বিপদ-মুসীবতের সময় আল্লাহকে ভয় করে চলেন এবং আত্মপর্যালোচনা করে আত্মসংশোধনের চেষ্টা করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ۚ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ○ كَمَاۤ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۪ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ○ يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ○

'আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে, যুদ্ধলব্ধ গনীমত সম্পর্কে। বলে দিন, গনীমতের মাল হলো আল্লাহর এবং রাসূলের। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যকার অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য কর, যদি ঈমানদার হয়ে থাক। যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম

নেওয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে। সে সমস্ত লোক, যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তারাই হলো সত্যিকার ঈমানদার! তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা। যেমন করে তোমাকে তোমার পরওয়ারদেগার ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের জন্য, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না। তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে, তা প্রকাশিত হবার পর; তারা যেন দেখতে দেখতে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে।' (সূরা আনফাল : ১-৬)

আত্মপর্যালোচনার পর ভুলত্রুটির জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে এবং অতীতের ভুলক্রটির জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ۚ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ
وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَ
اغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

'হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহর কাছে তাওবা করো, খাঁটি তাওবা। হয়তো আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে ঝরনাধারা বহমান রয়েছে। ঐ দিন আল্লাহ তাঁর নবী ও যারা তার সাথে ঈমান এনেছে তাদেরকে অপমানিত করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডান পাশে দৌড়াতে থাকবে এবং তারা বলতে থাকবে, হে আমাদের রব! আমাদের নূর আমাদের জন্য পুরা করে দাও এবং আমাদেরকে মাফ করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখ।' (সূরা তাহরীম : ৮)

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ
الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ اِنَّهٗ بِهِمْ
رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ۚ حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ
بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ۚ ثُمَّ
تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

'আল্লাহ নবীকে এবং মুহাজির ও আনসারদেরকে মাফ করে দিয়েছেন, যারা বড় কঠিন সময়ে নবীর অনুগত রয়েছে, যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোকের দিল বাঁকা পথের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। (কিন্তু তারা যখন বাঁকা পথে না চলে নবীর সাথেই রয়ে গেল তখন) তাদেরকে মাফ করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের উপর স্নেহশীল ও মেহেরবান। আর ঐ তিনজনকেও তিনি মাফ করে দিয়েছেন, যাদের ব্যাপারটা মুলতবি রাখা হয়েছিল। যখন জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তাদের জীবনও তাদের উপর বোঝা হয়ে গেল এবং তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহর (গযব) থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহরই রহমতের ছায়া ছাড়া আশ্রয় নেওয়ার আর কোন জায়গা নেই, তখন আল্লাহ মেহেরবানী করে তাদের দিকে ফিরলেন, যাতে তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।' (সূরা তাওবাহ : ১১৭-১১৮)

৮. আর্থিক কুরবানী পেশ করা

সংকটজনক মুহূর্তে অনেক সময় আর্থিক সংকট দেখা দেয়। যারা আহত হয় তাদের চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। যারা কারাবন্দী হন তাদের পরিবারের খোঁজখবর রাখতে হয়। আবার যারা শহীদ হন তাদের পরিবার-পরিজনের প্রতিও দায়িত্ব থাকে। মিথ্যা মামলার কারণে আইনি লড়াইয়ে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এছাড়া আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গও নানাভাবে আর্থিক সংকটে পতিত হন। এমতাবস্থায়ও আল্লাহর পথে মালের কুরবানী দেয়ার নজরানা পেশ করতে হয়। আল্লাহ তাআলা মুমিনের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন,

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

'যারা সব অবস্থায়ই নিজেদের সম্পদ খরচ করে– সচ্ছল অবস্থাই থাকুক আর মন্দ অবস্থায় থাকুক; যারা রাগকে দমন করে এবং অপরের দোষ মাফ করে দেয়; এমন নেক লোক আল্লাহ খুব পছন্দ করেন। আর যাদের অবস্থা এমন যে, যদি কখনো কোন অশ্লীল কাজ তাদের দ্বারা হয়ে যায় অথবা কোন গুনাহ করে নিজেদের উপর যুলুম করে বসে, তাহলে সাথে সাথেই আল্লাহর কথা তাদের মনে হয় এবং তাঁর কাছে তারা নিজেদের গুনাহের জন্য মাফ চায়। কেননা আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে, যে গুনাহ মাফ করতে পারে? এসব লোক যেটুকু (গুনাহের) কাজ করে ফেলেছে তা জেনে বুঝে আর করতে থাকে না।' (সূরা আলে ইমরান : ১৩৪-১৩৫)

তাবুক যুদ্ধে আবূ বকর (রা) তাঁর সকল সহায়-সম্পদ আল্লাহর রাসূলের সামনে হাজির করেন। উমর (রা) তাঁর সম্পদের অর্ধেক দান করেন। আর উসমান (রা) বিপুল পরিমাণ সাদকা করেন। এভাবে ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, সংকটকালে মুমিনরা দান-খয়রাত বেশি বেশি করত। কেননা সংকটকালে দান করা বা ভূমিকা পালন করার সাওয়াব আর সংকট উত্তরণ হওয়ার পরে দান করা বা ভূমিকা পালনের সাওয়াব এক নয়।

৯. আমর বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার অব্যাহত রাখা

আল্লাহ তাআলা কুরআনে আমর বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকারের কাজকে ঈমানের সাথে উল্লেখ করেছেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ○

'এখন তোমরাই দুনিয়ার ঐ সেরা উম্মত, যাদেরকে মানবজাতির হেদায়াত ও সংশোধনের জন্য ময়দানে আনা হয়েছে। তোমরা নেক কাজের আদেশ করো ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনত তাহলে তাদের জন্যই তা ভালো ছিল। যদি তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমানদারও পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের বেশির ভাগই নাফরমান' (সূরা আলে ইমরান : ১১০)। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ○

'হে বৎস! নামায কায়েম করো, ভালো কাজের হুকুম দাও, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করো এবং যে বিপদই আসুক তাতে সবর করো। এ কথাগুলোর জন্য বড়ই তাগিদ করা হয়েছে।' (সূরা লোকমান : ১৭)

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, আমর বিল মারূফ ও নেহী আনিল মুনকারের কাজ করা ফরয। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূলের অনেক হাদীস আছে:

'আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ মুনকার (শরীয়ত পরিপন্থী) কিছু হতে দেখলে হাত (শক্তি) দ্বারা তা প্রতিহত করা উচিত। সে শক্তি না থাকলে তবে মুখ দ্বারা উহা হতে বিরত রাখবে। আর তা সম্ভব না হলে মনে মনে উক্ত কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা উচিত। এটা হলো দুর্বলতম ঈমান।' (মুসলিম)

অধিকাংশ আলেম উপরোক্ত 'ঘৃণা পোষণে'র ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, অন্যায়কারীর অন্যায় কাজকে মনে মনে ঘৃণা করার সাথে সাথে একে প্রতিহত করার জন্য হস্তক্ষেপ করার শক্তি সামর্থ্য অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

সুতরাং এ হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, ইসলামী সমাজের অবক্ষয় রোধ ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ করা প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। তবে মনে রাখতে হবে অন্যায়ের বাধা দেওয়ার জন্য শক্তি প্রয়োগ, মৌখিকভাবে নিষেধ ও মনে মনে ঘৃণা পোষণের হাদীসে বর্ণিত এ তিনটি পর্যায় থেকে কখন কোনভাবে আমল করতে হবে তা পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকেই ঠিক করতে হবে। এক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরিবেশ পরিস্থিতির যথাযথ বিশ্লেষণ জরুরি। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভাবে মুসলিম উম্মাহকে অতীতে অনেক খেসারত দিতে হয়েছে।

অন্যায়ের বাধা না দিলে অন্যায় কাজের বিস্তার ঘটে। যেমনি শরীরে কোন রোগ দেখা দিলে তার চিকিৎসা করা না হলে সংক্রামক ব্যাধি হয়ে শুধু ব্যক্তিরই ক্ষতি করে না তার আশপাশে যারা থাকে তারাও উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস–

'নোমান বিন বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত সীমারেখা পালনে অলসতাকারী বা উহাতে পতিত ব্যক্তি ঐ সকল লোকের ন্যায়, যারা লটারির সাহায্যে স্থান নির্ধারণ করে নৌকায় আরোহণ করেছে। সুতরাং কিছু লোক নৌকার উপরের তলায় আর কিছু লোক নিচ তলায় স্থান নিয়েছে। অতঃপর যারা নৌকার নিচতলায় স্থান নিয়েছিল তাদের পানির প্রয়োজন পূরণের জন্য উপর তলার লোকদের নিকট যেতে হতো। এতে তারা কষ্টবোধ করত। সুতরাং নিচতলার এক ব্যক্তি কুড়াল হাতে নিয়া নৌকার নিচের অংশ কেটে ছিদ্র করতে আরম্ভ করল। তখন উপরের তলার লোকেরা এসে বলল, তোমার কী হয়েছে, তুমি কী করছ? তখন সে বলল, তোমরা আমার যাতায়াতের কারণে কষ্ট অনুভব কর। আর আমি পানির তীব্র অভাব অনুভব করছি। সুতরাং পানি লাভের জন্য আমার পথ খুঁজতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় লোকেরা যদি তাকে নৌকার তলা কাটা হতে বিরত রাখে তবে ঐ ব্যক্তি এবং সবাই বাঁচবে। আর যদি তারা ঐ ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয় অর্থাৎ বিরত না রাখে তবে ঐ লোক এবং তারা সকলেই ধ্বংস হবে'। (বুখারী)

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, কোন একটি ঘরে ময়লা-আবর্জনা পড়া শুরু হলে আর তা পরিষ্কার করা না হলে এক পর্যায়ে সেই ঘরে বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে কোন একটি সমাজে অন্যায় অপকর্ম শুরু হলে তা প্রতিহত করা না

হলে অন্যায়-অপকর্মের বিস্তার ঘটলে সেই সমাজে বসবাসই কঠিন হয়ে যায়। আর একজন মানুষ খারাপ কাজ করলে তা দূর করার চেষ্টা করা না হলে এক পর্যায়ে সে খারাপ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এমন এক সময় আসে যে, সে খারাপ কাজকে আর খারাপই মনে হয় না। অতএব আমাদেরকে আমর বিল মারূফ ও নেহী আনিল মুনকারের কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় দিক এই যে:

ক. আমর বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার এর কাজ করতে হলে শরী'আতের দৃষ্টিতে ভাল ও মন্দ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

খ. কোমল ভাষায় আমর বিল মারূফ ও নেহী আনিল মুনকারের কাজ করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখ করছি:

'আবূ সাঈদ হাসান আল বসরী (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েজ ইবন আমর (রা) একদা উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের কাছে গেলেন। তিনি বললেন, হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি যে, নিকৃষ্ট রাখাল হলো সেই ব্যক্তি, যে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে নম্রতা ও সহনশীলতা অবলম্বন করে না। তুমি সতর্ক থাক, যেন এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে না যাও। সে তাকে বলল, থাম। কেননা তুমি তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের মধ্যে অপদার্থদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি (আয়েজ) বলেন, তাদের (সাহাবীদের) মধ্যে কি এরূপ অপদার্থ লোক ছিল। নীচ ও অপদার্থ লোক তো তাদের পরের স্তরে অথবা তারা ছাড়া অন্য লোক।' (মুসলিম)

গ. আমর বিল মারূফ ও নেহী আনিল মুনকারের কাজ করার সময় কষ্টদায়ক কোন কিছু শুনলে বা দেখলে রাগান্বিত হওয়া যাবে না; বরং ধৈর্যের সাথে সংশোধনের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে গেলে নানা ধরনের বাধা আসবে। বাধা আসাটাই স্বাভাবিক। এসব বাধা মোকাবেলা করে মারূফ কাজ করা ও মুনকার বর্জনের আহ্বান জানানো এক ধরনের জিহাদ। এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, দীনের দাওয়াত দিতে গেলে অনেক কথা শুনতে হয়। অনেকে উপহাস করে। এমনকি আল্লাহর প্রিয় রাসূল (স)-কে পর্যন্ত বলা হয়েছে, আল্লাহ বুঝি নবী করার জন্য তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পাননি। নূহ (আ) সাড়ে নয় শত বছর দাওয়াতী কাজ করে মাত্র ৪০ জন কিংবা ৮০ জন অনুসারী করতে পেরেছেন। তিনি যখনই দীনের দাওয়াত দিতে যেতেন। তখনই তারা কানে কাপড় ঢুকিয়ে রাখত, যেন তাঁর দাওয়াত শুনতে না পায়। এভাবে দাওয়াতী কাজ করতে গেলে বিরাট ধৈর্য প্রয়োজন।

ঘ. সৎ কাজের আদেশ দেওয়ার সাথে সাথে সৎকাজ করতে হবে এবং অসৎকাজের নিষেধ করার সাথে সাথে অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। মূলত বাস্তব জীবনের মাধ্যমে দীনের দাওয়াত দেওয়া খুবই কঠিন। মুখে দীনের অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু বাস্তব জীবনে সেসব অনুসরণ করা কঠিন। আল্লাহ্ তাই বলেছেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○

'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যা কর না তা অপরকে কেন করতে বলছ?' (সূরা সফ : ২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

'তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও আর নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না?' (সূরা বাকারা : ৪৪)

ইহুদি পণ্ডিতদের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তারা মানুষকে যেসব বিষয়ে নসীহত করত তারা তা পালন করত না। তারা মানুষকে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করতে নিষেধ করত কিন্তু নিজেরা অন্যের সম্পদ গ্রাস করত। আল্লাহ তাআলা কুরআনের অন্যত্র এ ধরনের কাজ তাঁর নিকট খুব অপছন্দনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখ করছি :

'উসামা ইবন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলে কারীম সাল্ল-াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তার নাড়িভুড়ি বেরিয়ে আসবে। সে এ নিয়ে এমন ভাবে চক্কর দিতে থাকবে, যেভাবে গাধা চক্রের মধ্যে ঘুরে থাকে। দোযখীরা তার চারপাশে সমবেত হয়ে জিজ্ঞাসা করবে, হে অমুক, তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি কি সৎকাজের নির্দেশ দিতে না এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে না? সে বলবে, হ্যাঁ, আমি সৎকাজের আদেশ দিতাম কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না। আমি অন্যদের খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতাম কিন্তু আমি নিজেই আবার তা করতাম।' (বুখারী ও মুসলিম)

১০. পরস্পর বিবাদ ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা নষ্ট না করা

কঠিন মুহূর্তে পর্যালোচনা বেশি হয়। এ সময় বিপদের কারণ নিয়ে অনেক সময় পরস্পরের প্রতি দোষ দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ভবিষ্যতের কর্মপন্থা

নির্ধারণে মতপার্থক্য দেখা দেয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কোন অবস্থাতেই পরস্পরের বিবাদে লিপ্ত হওয়া যাবে না এবং অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা নষ্ট করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚo وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۚo وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ o

‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর, যাতে তোমাদের উদ্দেশ্য হাসিলে কৃতকার্য হতে পার। আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রাসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। আর তাদের মতো হয়ে যেও না, যারা বেরিয়েছে নিজেদের অবস্থান থেকে গর্বিতভাবে এবং লোকদেরকে দেখাবার উদ্দেশ্যে। আর আল্লাহর পথে তারা বাধা দান করত। বস্তুত আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে সেসব বিষয়, যা তারা করে।’ (সূরা আনফাল: ৪৫-৪৭)

আল্লাহ তাআলা সূরা সফের শুরুতে কাতারবন্দী হয়ে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে বলেছেন। এর মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠার পথে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আমাদেরকে সবসময় আদর্শের প্রতি অনুগত থাকতে হবে। অনেক সময় মুসলমানদেরকে নেতৃত্বশূন্য করার চেষ্টা করা হয়। সে সময় একদিকে নেতৃত্বের প্রতি অনুগত থাকতে হবে অপরদিকে কখনও কোন কারণে ব্যক্তির পরিবর্তন হলেও আদর্শের প্রতি কমিটমেন্ট রক্ষার ক্ষেত্রে কোন ধরনের দুর্বলতা প্রকাশ করা যাবে না। কেননা, ইসলাম ব্যক্তি নয় বরং আদর্শের প্রতি অনুগত থাকতে নির্দেশ দেয়।

১১. বিজয়ের ব্যাপারে আত্মপ্রত্যয়ী হতে হবে

আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে যারা চলে তারাই বিজয়ী হবে। আদর্শের বিজয়ের ব্যাপারে আত্মপ্রত্যয় থাকতে হবে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ ○ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

'আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে, আমি ও আমার রাসূলই বিজয়ী হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও জবরদস্ত। তোমরা কখনো এমন দেখতে পাবে না যে, যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে তারা ঐসব লোককে মহব্বত করে, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছে, তারা তাদের পিতা হোক বা পুত্র হোক বা ভাই হোক বা আত্মীয় হোক। তাঁরাই ঐসব লোক, যাদের দিলে আল্লাহ্ ঈমান কায়েম করে দিয়েছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে একটি রূহ দান করে তাদেরকে শক্তি যুগিয়েছেন। তিনি তাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে ঝরনাধারা বহমান। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়েছে। তারা আল্লাহর দলের লোক। জেনে রাখ যে, আল্লাহর দলই কামিয়াব হবে।' (সূরা মুজাদালাহ : ২১-২২)

وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِىَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ؕ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

'আর যে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা না মানে তার দুনিয়ায় এমন শক্তি নেই, যে আল্লাহকে সে হারিয়ে দিতে পারে। আর তার এমন কোন সহায় নেই, যে তাকে আল্লাহ থেকে বাঁচাতে পারে। এসব লোক স্পষ্ট গোমরাহীতে পড়ে আছে।' (সূরা আহকাফ : ৩২)

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۙ○ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ○ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ

اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ○ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ
مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۭ اَفَا۟ئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ۭ
وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ۭ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ○
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ۭ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا
نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۭ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ○ وَكَاَيِّنْ مِّنْ
نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَ
مَا اسْتَكَانُوْا ۭ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ○

'তোমরা মন ভাঙা হয়ো না, চিন্তা করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তাহলে তোমরাই বিজয়ী থাকবে। এ সময় যদি তোমাদের উপর আঘাত লেগে থাকে, তাহলে এর আগে তোমাদের বিরোধী দলের উপরও এ ধরনের আঘাত লেগেছে। এটা তো সময়ের উত্থান ও পতন মাত্র, যা আমি মানুষের মধ্যে একের পর এক দিয়ে থাকি। তোমাদের উপর এ সময়টা এজন্য আনা হয়েছে যে, আল্লাহ দেখে নিতে চেয়েছিলেন যে, তোমাদের মধ্যে সাচ্চা মুমিন কারা এবং তিনি তোমাদের মধ্য থেকে ঐ লোকদেরকে বাছাই করে নিতে চেয়েছিলেন, যারা আসলেই (সত্যের) সাক্ষী। কেননা যালিমদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। আর তিনি এ পরীক্ষার মাধ্যমে মুমিনদেরকে আলাদা করে নিয়ে কাফিরদেরকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা এমনিই বেহেশতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখনো দেখে নেননি যে, তোমাদের মধ্যে এমন কারা আছে, যারা তাঁর পথে জীবন দিতে পারে এবং তাঁরই খাতিরে সবর করতে পারে। তোমরা তো মৃত্যু কামনা করেছিলে; কিন্তু তা ঐ সময়ের কথা, যখন মৃত্যু সামনে আসেনি। নাও, এখন তা সামনে এসেছে এবং তোমরা তা নিজের চোখেই দেখেছ। মুহাম্মদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর আগে আরো বহু রাসূল গত হয়ে গেছেন। তিনি যদি মারা যান বা নিহত হন তাহলে কি তোমরা উল্টা দিকে ফিরে যাবে? মনে রেখো, যারা উল্টা দিকে ফিরে যাবে, তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অবশ্য যারা আল্লাহর শোকর-গুজার বান্দাহ হয়ে

থাকবে তাদেরকে তিনি এর বদলা দেবেন। কোন প্রাণী আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মওতের সময় তো লিখিতই আছে। যে দুনিয়ার ফলের আশায় কাজ করবে তাকে আমি দুনিয়া থেকেই দেব এবং যে আখিরাতের ফলের আশায় কাজ করবে সে আখিরাতে সুফল পাবে। আর শোকর আদায়কারীরদেকে আমি তাদের প্রতিফল অবশ্যই দান করব। এর আগে কত নবীই গত হয়ে গেছেন, যাদের সাথে মিলে বহু আল্লাহওয়ালা লোক যুদ্ধ করেছে। আল্লাহর পথে যত মুসীবতই তাদের উপর পড়েছিল, সে জন্য তারা হতাশ হয়নি, তারা কোন দুর্বলতা দেখায়নি এবং তারা (বাতিলের সামনে) মাথানত করেনি। এ ধরনের ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন। (সূরা আলে ইমরান : ১৩৯-১৪৬)

১২. সর্বাবস্থায় 'সিরাতাল মুস্তাকীম'-এর পথে চলতে হবে

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ
ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○ ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِىْٓ اَحْسَنَ وَ
تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ○

'তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চল না। তাহলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও। অত:পর আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছি, সৎকর্মীদের প্রতি নিয়ামত পূর্ণ করার জন্য, প্রত্যেক বস্তুর বিশদ বিবরণের জন্যে, হেদায়াতের জন্য এবং করুণার জন্যে, যাতে তারা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাসী হয়।' (সূরা আন'আম : ১৫৩-১৫৪)

কিন্তু দুর্বলচেতা মানুষ সংকটকালে সিরাতাল মুস্তাকীমের পথ ছেড়ে দিতেও কার্পণ্য করে না, কিন্তু বিজয় দেখলে আবার ঈমানদারদের সাথেই থাকতে চায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ۚ
وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِىْ صُدُوْرِ
الْعٰلَمِيْنَ ○ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ○

'মানুষের মধ্যে কেউ এমনও আছে, যে বলে, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। কিন্তু যখনই আল্লাহর (প্রতি ঈমান আনার) কারণে তাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, তখন লোকদের চাপিয়ে দেওয়া পরীক্ষাকে সে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করে নিয়েছে। এখন যদি আপনার রবের পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্য এসে যায় তাহলে এ লোকটিই বলবে, আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম। দুনিয়াবাসীর মনের অবস্থা কি আল্লাহ ভালোভাবে জানেন না? আল্লাহ তো অবশ্যই অবশ্য যাচাই করে দেখবেন যে, কারা ঈমান এনেছে, আর কারা মুনাফিক। (সূরা আনকাবূত : ১০-১১)

১৩. কোন অবস্থাতেই হতাশ কিংবা মনোবল হারানো যাবে না

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে হতাশ হতে নিষেধ করেছেন। আমাদেরকে আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে এবং আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল রাখতে হবে। জনসংখ্যা বা বস্তুগত কোন ধরনের সহায় সম্পদের উপর নির্ভরশীল হয়ে গর্ব অহংকার প্রকাশ পায় এমন কোন কথা বা কাজ করা যাবে না। হুনাইন যুদ্ধের সাময়িক পরাজয়ে এ শিক্ষাই নিহীত রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ○

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাৎপসরণ করবে না।' (সূরা আনফাল : ১৫)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ○ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۚ○ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَاۗءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর, যাতে তোমরা উদ্দেশ্য হাসিলে কৃতকার্য হতে পার। আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রাসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা

ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে। আর তাদের মতো হয়ে যেয়ো না, যারা বেরিয়েছে নিজেদের অবস্থান থেকে গর্বিতভাবে এবং লোকদেরকে দেখাবার উদ্দেশ্যে। আর আল্লাহর পথে তারা বাধা দান করত। বস্তুত আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে সেসব বিষয়, যা তারা করে।' (সূরা আনফাল : ৪৫-৪৭)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

'হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! সবর করো, বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে মযবুতী দেখাও, হকের খিদমতের জন্য তৈয়ার থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে অবশ্যই তোমরা সফলকাম হবে।' (সূরা আলে ইমরান : ২০০)

কুরআনের অনেক জায়গায় অতীতের নবী-রাসূলদের কাহিনী বিধৃত আছে যে, তাঁরা মানুষকে আল্লাহর উপর ঈমান আনার দাওয়াত দিতে গিয়ে কত নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করেছেন। তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা হয়েছে। তাই আমাদেরকেও মনে করতে হবে– আল্লাহর সাহায্য নিশ্চয়ই আসবে।

১৪. আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক চেষ্টা করা

আমাদের নিজেদের বুদ্ধি, শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক শক্তিসহ সকল ধরনের উপায় উপকরণের সর্বোত্তম ব্যবহার করে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ۭ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۭ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ۭ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ڏ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاۗءَ عَلَي النَّاسِ ښ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ۭ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

'আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যে এভাবে করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে (নিজের কাজের জন্য) বাছাই করে নিয়েছেন। দীনের মধ্যে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। (দীন অনুযায়ী তোমাদের চলার পথে তিনি কোন বাধা থাকতে দেননি।) তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর কায়েম হয়ে যাও। আল্লাহ আগেও তোমাদের নাম 'মুসলিম' রেখেছিলেন, এ কুরআনেও (তোমাদের নাম এটাই), যাতে রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হন এবং তোমরাও মানবজাতির

উপর সাক্ষী হও। সুতরাং নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মযবুতভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। কতই না ভালো এ অভিভাবক। আর কতই না ভালো এ সাহায্যকারী।' (সূরা হাজ্জ : ৭৮)

সত্যিকার ঈমানদারদের জন্য জাগতিক কোন মোহ আল্লাহর পথে চলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○

(হে রাসূল! আপনি তাদেরকে) বলুন, তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের ঐ মাল যা তোমরা কামাই করেছ, তোমাদের ঐ কারবার তোমরা যার মন্দার ভয় করো এবং তোমাদের ঐ বাড়ি, যা তোমরা পছন্দ করো (এসব) যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে বেশি প্রিয় হয় তাহলে আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আল্লাহ ফাসিক লোকদেরকে হেদায়াত করেন না।' (সূরা তাওবাহ : ২৪)

কখনও কখনও আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু বান্ধব বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে বলে যে, সে অমুক স্থানে না গেলে বা অমুকের সাথে না চললে এই বিপদটা হতো না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

'তোমাদের এ কী অবস্থা হলো যে, যখন তোমাদের উপর মুসীবত এসে পড়ল তখন তোমরা বলতে লাগলে, এ কোথা থেকে এল? অথচ (বদরের যুদ্ধে) তোমাদেরই হাতে (বিরোধীদের উপর) এর দ্বিগুণ মুসীবত এসে পড়েছিল। হে নবী! আপনি তাদেরকে বলে দিন, এ মুসীবত তোমাদের নিজেদের কারণেই এসেছে। আল্লাহ এসব বিষয়ের উপর ক্ষমতা রাখেন।' (সূরা আলে ইমরান: ৬৫)

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ۗ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ
الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۚ بَلْ
اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ○ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ
لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ
مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

'এরা ঐসব লোক, যারা নিজেরা তো বসেই রইল, আর তাদের যেসব ভাই-বন্ধু যুদ্ধ করতে গেল এবং নিহত হলো তাদের সম্বন্ধে এরা বলে দিল যে, যদি তারা আমাদের কথা মেনে নিত তাহলে তারা মারা যেত না। হে নবী! ওদেরকে বলে দিন, যদি তোমরা এ কথায় সত্যবাদী হও তাহলে যখন তোমাদের মৃত্যু আসবে তখন তোমাদের নিজেদের থেকে তা ফিরিয়ে দিও। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। তারা তো আসলে জীবিত। তারা তাদের রবের কাছ থেকে রিযক পাচ্ছে। আল্লাহ তাদেরকে নিজ মেহেরবানী থেকে যা কিছু দিয়েছেন, তাতে তারা খুশি ও তৃপ্ত। আর তারা এ বিষয়েও নিশ্চিত যে, যেসব ঈমানদার লোক তাদের পেছনে দুনিয়াতে রয়ে গেছে এবং এখনো সেখানে পৌঁছেনি, তাদের জন্য কোন ভয় ও দুঃখের কারণ নেই। তারা আল্লাহর নিয়ামত ও মেহেরবানী পেয়ে আনন্দিত এবং তারা জানতে পেরেছে যে, আল্লাহ ঈমানদারদের পুরস্কার নষ্ট করেন না।' (সূরা আলে ইমরান: ১৬৮-১৭১)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِإِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا
فِى الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ
اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○
وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○

'হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা এ কাফিরদের মতো কথা বল না, যাদের কোন আত্মীয়-স্বজন যদি কখনো সফরে যায় বা যুদ্ধে শরীক হয় (এবং সেখানে কোন বিপদে পড়ে) তাহলে তারা বলে, তারা যদি আমাদের কাছে থাকত তাহরে মারাও যেত না এবং নিহত হতো না। আল্লাহ এ ধরনের কথাকে তাদের মনে আফসোসের কারণ বানিয়ে দেন। অথচ আসলে আল্লাহই তো জীবন ও মৃত্যু দান করেন। আর তোমাদের

সব কাজ-কর্মই তিনি দেখছেন যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও বা মারা যাও তাহলে আল্লাহর যে রহমত ও দান তোমাদের ভাগ্যে জুটবে তা ঐসব জিনিস থেকে অনেক ভালো, যা তারা জমা করে।' (সূরা বাকারা : ১৫৬-১৫৭)

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

'(এসব লোকের জানা উচিত যে) যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে দেয়, তাদেরই আল্লাহর পথে লড়াই করা উচিত। তারপর যে আল্লাহর পথে লড়াই করবে এবং হয় নিহত হবে আর না হয় বিজয়ী হবে, তাকে আমি অবশ্যই বিরাট বদলা দান করব।' (সূরা নিসা : ৭৪)

১৫. সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও ভিশনারি পরিকল্পনার অধিকারী হতে হবে এবং কৌশলী ভূমিকা পালন করতে হবে

আল্লাহর রাসূল (স) কর্তৃক মদীনা সনদ ও হুদাইবিয়ার সন্ধি এ ক্ষেত্রে বিরাট নজীর হয়ে আছে। তিনি অনেক সময় গন্তব্যস্থলের উল্টো পথে প্রথমে রওয়ানা করতেন। এভাবে আল্লাহর রাসূল (স)-এর জীবন থেকে অনেক কৌশল জানা যায়, যা আজকের সময়েও আমাদেরকে সংকটময় মুহূর্তে নির্দেশনা দান করে। মুতার যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল (স) পরপর তিনজন সেনাপতির নাম উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু চতুর্থ সেনাপতির নাম উল্লেখ করেন নি। আল্লাহর রাসূল (স) যে তিনজন সেনাপতির নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁরা সবাই শহীদ হওয়ার পর সাহাবীগণ চতুর্থ সেনাপতি নিজেদের মধ্য থেকে নিযুক্ত করেন।

উপসংহার

ফেরাউনের ঘরেই মূসার লালন

একদা ফেরাউনকে রাজ-দরবারের গণকরা জানাল বনী ইসরাঈলের মধ্যে এমন এক পুত্র সন্তানের জন্ম হবে, যে তোমাকে সিংহাসনচ্যুত করবে। গণকদের কাছ থেকে এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী শোনার পর ফেরাউন আদেশ জারি করে যে, বনী ইসরাঈলের কারো কোন পুত্রসন্তান হলে তাকে হত্যা করতে হবে। ফেরাউনের উক্ত ফরমান জারির পরই মূসার জন্ম হয়। তাই মূসার মা মূসাকে তিন মাস গোপনে তার কাছে রাখার পর ভীত হয়ে পড়লেন যে, যদি ফেরাউন জানতে পারে তাহলে তো হত্যা করে ফেলবে। সে সময় ফেরাউনের গোয়েন্দা বাহিনী বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়ে নির্বিচারে শিশুপুত্র হত্যা করত। শিশু মূসাকে কিভাবে রক্ষা করা যায় এ চিন্তায় মূসার মা অস্থির হয়ে পড়েন। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় মূসার মায়ের মনের ভিতর একটি বুদ্ধি আসল। সে অনুযায়ী তিনি একটি সিন্দুকের ভিতর মূসাকে রেখে নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। আল্লাহর কুদরতে ফেরাউনের স্ত্রী উক্ত বক্স নদী থেকে তুলে তার ভেতর শিশুপুত্র মূসাকে দেখতে পান। ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার মনে মূসার প্রতি মমতা সৃষ্টি হয়। সে ফেরাউনকে বলে এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি, তাকে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে পরিণাম সম্পর্কে তাদের কোন খবর ছিল না। (সূরা কাসাস : ৯)

স্ত্রীর কথামতো ফেরাউন মূসাকে নিজ ঘরে রাখেন। অন্যদিকে মূসাকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার পর তার মা খুব অস্থির হয়ে পড়েন।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার মনে দৃঢ়তা দান করলেন। কারণ অস্থিরতার কারণে ঘটনা বলে ফেললে এটা মূসার জন্য ক্ষতির কারণ হতো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'সকালে মূসার মায়ের মন অস্থির হয়ে উঠল। যদি আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম তবে তিনি মূসাজনিত অস্থিরতা প্রকাশ করেই দিতেন। দৃঢ় করলাম, যাতে তিনি বিশ্বাসীগণের মধ্যে থাকেন।' (সূরা কাসাস : ১০)

মূসার মা মূসাকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার পর মূসার বোনকে বলল, 'তুমি দূর থেকে দেখতে থাক– সিন্দুকটি ভেসে কোথায় যায়? কে সিন্দুকটি নদী থেকে উপরে তুলে, বা আদৌ কেউ সিন্দুকটি তোলে কি না? না কি মূসা নদীর অতলে ভেসে.চলে যায়?' মায়ের কথা অনুযায়ী মূসার বোন মূসার প্রতি লক্ষ্য রেখে নদীর

কূল ঘেঁষে চলতে লাগল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'তিনি মূসার বোনকে বললেন, তার পেছনে যাও। সে তাদের অজ্ঞাতসারে অপরিচিতা হয়ে তাকে দেখে যেতে লাগল।' (সূরা কাসাস : ১১)

মূসার বোন যখন দেখল ফেরাউনের রাজদরবারের কাছেই সিন্দুকটি উপরে তোলা হচ্ছে। তখন তার মনে মূসার পরিণতি সম্পর্কে ভয়ঙ্কর চিত্র ভেসে উঠে। কিন্তু সে সময়ক্ষেপণ না করে অপরিচিতার মতো ফেরাউনের রাজদরবারে চলে যায়। শিশুটির সাথে ফেরাউন কী আচরণ করে তা দেখাই ছিল তার মনের ইচ্ছা। সে যখন দেখল ফেরাউন ও তার পরিবার মূসার জন্য ধাত্রী তালাশ করছে তখন তার মনে সাহস এল। সে নিশ্চিত হলো, শিশু মূসাকে ফেরাউন হত্যা করবে না বরং লালন-পালন করবে।

যে ফেরাউন কারো ছেলে জন্ম নিলে তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়, সে ফেরাউনের ঘরেই মূসার লালন-পালনের ব্যবস্থা হয়। যে শিশুর জীবন ছিল ঝুঁকিপূর্ণ সে শিশু রাজকীয় আদর-সোহাগে লালিত-পালিত হয়। আর যে মা ফেরাউনের ভয়ে শিশু পুত্রকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে পাগলিনীর মতো ছটফট করে, সে মাকেই ফেরাউনের রাজদরবারে শিশু মূসার দুধ পানের জন্য তলব করা হয়। মূলত মূসার মা যেন মানসিক অস্থিরতায় না ভুগেন সেজন্য মূসার মাকেই দুধ পান করানোর দায়িত্ব দেওয়াটা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। শিশু মূসাকে ফেরাউনের রাজদরবারে নেওয়ার পর তিনি অন্য কোন মহিলার দুধ পান করেন নি। ফেরাউন ও তার পত্নী অনেক চেষ্টা করেও কারো দুধ মূসার মুখে দিতে না পেরে খুব বেশি বিচলিত হয়ে পড়ে। সে সুযোগে মূসার বোন বলে, আমার জানামতে একজন ধাত্রী আছে, যে মূসাকে লালন-পালন করতে পারবে। এরপর ফেরাউন তাকে ধাত্রী নিয়ে আসার দায়িত্ব দেয়। ধাত্রী তালাশের দায়িত্ব পেয়ে মূসার বোন ছুটে যায় তার মায়ের কাছে। মাকে সব ঘটনা খুলে বলার পর মাকে নিয়ে ফেরাউনের রাজদরবারে আসেন। এভাবে আল্লাহর ইশারায় মূসার মা যে ফেরাউনের ভয়ে শিশুপুত্রকে নদীতে ভাসিয়ে দেন, সে মূসাকেই দুধ পান করাতে এবং লালন-পালন করতে ধাত্রী হয়ে ফেরাউনের রাজপ্রাসাদে স্থান পান– এটাই আল্লাহর কুদরত। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন, 'পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রীদেরকে মূসা থেকে বিরত রেখেছিলাম। মূসার বোন বলল, আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব কি, যারা তোমাদের জন্য একে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে তার হিতাকাঙ্ক্ষী। অতঃপর আমি তাকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং তিনি দুঃখ না করেন এবং যাতে তিনি জানেন যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য; কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না।' (সূরা কাসাস : ১২-১৩)

আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-কে নবুওয়াত দেয়ার পর এ ঘটনা এভাবে স্মরণ করিয়ে দেন, '(সে সময়কে স্মরণ কর) যখন আমি তোমার মাতাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যা অতঃপর বর্ণিত হচ্ছে যে, তুমি মূসাকে সিন্দুকে রাখ। অতঃপর তা নদী ভাসিয়ে দাও। অতঃপর নদী তাকে তীরে ঠেলে দেবে। তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু উঠিয়ে নেবে। আমি তোমার প্রতি মহব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিপালিত হও। যখন তোমার বোন এসে বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব, কে তাকে লালন-পালন করবে? অতঃপর আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম। যাতে তার চোখ শীতল হয় এবং দুঃখ না পায়।' (সূরা ত্বা-হা : ৩৮-৪০)

মূসা (আ)-কে আল্লাহ তাআলা অলৌকিকভাবে ফেরাউনের ঘরে লালন-পালন করান। এ প্রসঙ্গে মুফতী শফী (র) তাঁর তাফসীরে লেখেন, 'মূসা (আ) যদি সাধারণ শিশুদের ন্যায় কোন ধাত্রীর দুধ পান করতেন, তবুও তাঁর লালন-পালন শত্রু ফেরাউনের ঘরে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যেই হতো। কিন্তু তাঁর মা তাঁর বিরহে ব্যাকুল থাকতেন এবং মূসাও কোন কাফির মহিলার দুধ পেতেন। আল্লাহ তাআলা একদিকে তাঁর পয়গাম্বরকে কোন কাফির মহিলার দুধ পান থেকে বাঁচিয়ে দিলেন অপরদিকে তাঁর মাকেও বিরহের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেন। মুক্তিও এমনভাবে দিলেন যে, ফেরাউনের পরিবার তাঁর কাছে ঋণী হয়ে রইল এবং উপঢৌকন ও উপহারের বৃষ্টিও বর্ষিত হলো। নিজেরই প্রাণপ্রতিম সন্তানকে দুধ পান করানোর বিনিময়ে মূসার জননী ফেরাউনের রাজদরবার থেকে ভাতাও পেলেন এবং ফেরাউনের গৃহে সাধারণ কর্মচারীর ন্যায় থাকতে হলো না।

মূসার (আ) ইতিহাস এ কথারই প্রমাণ যে, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে বৈরী পরিবেশ শত্রুর ঘরেই আল্লাহর প্রিয় বান্দাহরা লালিত-পালিত হতে পারেন। তাই ফেরাউনী শাসনে ভয় পাওয়ার কারণ নেই। সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর নির্ভরশীল থেকে বৈরী পরিবেশেও দীনের উপর অটল ও অবিচল থাকার চেষ্টা করা মুমিনের দায়িত্ব।

রাতের আঁধার যত গভীর হয় ভোরের সূর্য উঠার সময় তত কাছে আসে

আমরা দেখি রাতের পর দিন আসে এবং দিনের পর রাত আসে। মানুষের জীবনে কখনও সুখ আসে আর কখনও দুঃখ আসে। নদীতে কখনও জোয়ার আসে আবার কখনও ভাঁটা আসে। আকাশে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় দেখা দিলেও তা এক সময় থেমে যায়। সব সময় ঘূর্ণিঝড় থাকে না। সব সময় বাতাস একদিকে প্রবাহিত হয় না। বাতাসের গতি সব সময় সমান থাকে না।

আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাহদের সব সময় বিপদে রেখেই খুশি হন বিষয়টা এমনটি নয়। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাহদের আরও বেশি প্রিয়পাত্র বানাবার জন্য পরীক্ষা করেন। এ ক্ষেত্রে কাউকে একটু বেশি পরীক্ষা করেন আর কাউকে কম করেন। কাউকে বেশি সময় পরীক্ষায় রাখেন আর কাউকে কম সময়ের জন্য পরীক্ষা করেন। কাউকে পরীক্ষার সময় গায়েবী সাহায্য পাঠিয়ে দুনিয়াতেই বিপদ থেকে রক্ষা করেন। আর কাউকে পরীক্ষার সময় তাঁর দরবারে উঠিয়ে নিয়ে যান। তবে কাকে কখন কিভাবে পরীক্ষা করা হবে এবং উক্ত পরীক্ষার শেষ পরিণতি কী হবে তা শুধুমাত্র তিনিই জানেন।

অতীতে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের উপর যারা যুলুম-নির্যাতন করেছে তারা দুনিয়াতেই ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাহদেরকে রক্ষা করেছেন। ফেরাউন কর্তৃক মূসাকে দেশত্যাগে বাধ্য করা এবং হত্যা প্রচেষ্টার সময় ফেরাউন নদীতে ডুবে মারা যায় আর মূসা ও তাঁর অনুসারীদের জন্য বারটি রাস্তা করে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উদ্ধার করেন।

আসিয়ার উপর নির্যাতন চলাকালে তিনি আল্লাহর কাছে শাহাদাতের প্রার্থনা করেন আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআ কবুল করেন। আবার ঈসাকে শূলিবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যান।

আল্লাহ তাআলা মাঝে মধ্যে তাঁর প্রিয় বান্দাহদেরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেন। শত্রুর চোখের সামনে দিয়ে তাঁরা চলে যান; কিন্তু তারা তাঁদেরকে দেখতে পায়নি। আল্লাহ তাআলা শত্রুদের চোখে পর্দা দিয়ে দেন। আল্লাহর রাসূল (স) মদীনায় হিজরতের সময় যখন সাওর গুহায় ছিলেন তখন ক্ষুদ্র মশার বাসা দিয়ে গর্তের মুখ ঢেকে দেন। ফলে শত্রুরা গর্তের মুখে মাকড়সার বাসা দেখে চিন্তাই করেনি যে, উক্ত গর্তের ভেতর কেউ থাকতে পারে।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাহরা আল্লাহর ফায়সালার প্রতি সব সময় সন্তুষ্ট থাকেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কোন বিপদাপদে পতিত করলে তাঁরা কখনও মন খারাপ করেন না কিংবা আল্লাহ অখুশি হতে পারেন এমন কোন উক্তি করেন না। এভাবে যারা আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন আল্লাহ তাআলা তাদেরকেই আখিরাতে জান্নাত দান করবেন। আর কখনও কখনও দুনিয়াতেও তাদেরকে মহাবিজয় দান করেন। ইউসুফ, দাউদ, সুলাইমান দুনিয়াতেও রাজকীয় সম্মান ভোগ করেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, কোন একটি দেশে কেউ চিরদিন একই অবস্থানে থাকেন না। কেউ কখনও শাসক হয় আবার শাসিত

হয়। কখনও যালিম হয় বা মাযলুম হয়। হিটলার তার ক্ষমতার সময় অনেক নির্মম অত্যাচার চালায়; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী হয়ে আছে যে, হিটলারের পরিণতিও কত করুণ হয়েছে। হিটলারের শাসনেরও অবসান আছে। ফেরাউন-নমরূদ-এর শাসনেরও শেষ ছিল।

বর্তমানে পৃথিবীর যেসব দেশে মুসলমানেরা নির্যাতিত হচ্ছে সেসব দেশে সব সময় একই অবস্থা থাকবে না ইনশাআল্লাহ। সময়ের আবর্তনে যেমনি রাতের গভীরতার পর সোবহি সাদেকের আলোকরশ্মি দেখা দেয়, অনুরূপভাবে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় যালিমদের পতন ঘটবে। আর মযলুম মানবতা খুঁজে পাবে ন্যায় ও ইনসাফের সৌধের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সুন্দর সমাজ। এ জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, হিকমত ও সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা। জাগতিক উপায় উপকরণের পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা করে পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় প্রচেষ্টা চালানো। সর্বদা হকের উপর অটল ও অবিচল থাকা এবং শত উস্কানি ও বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও সীমালংঘন না করা।

সমাপ্ত